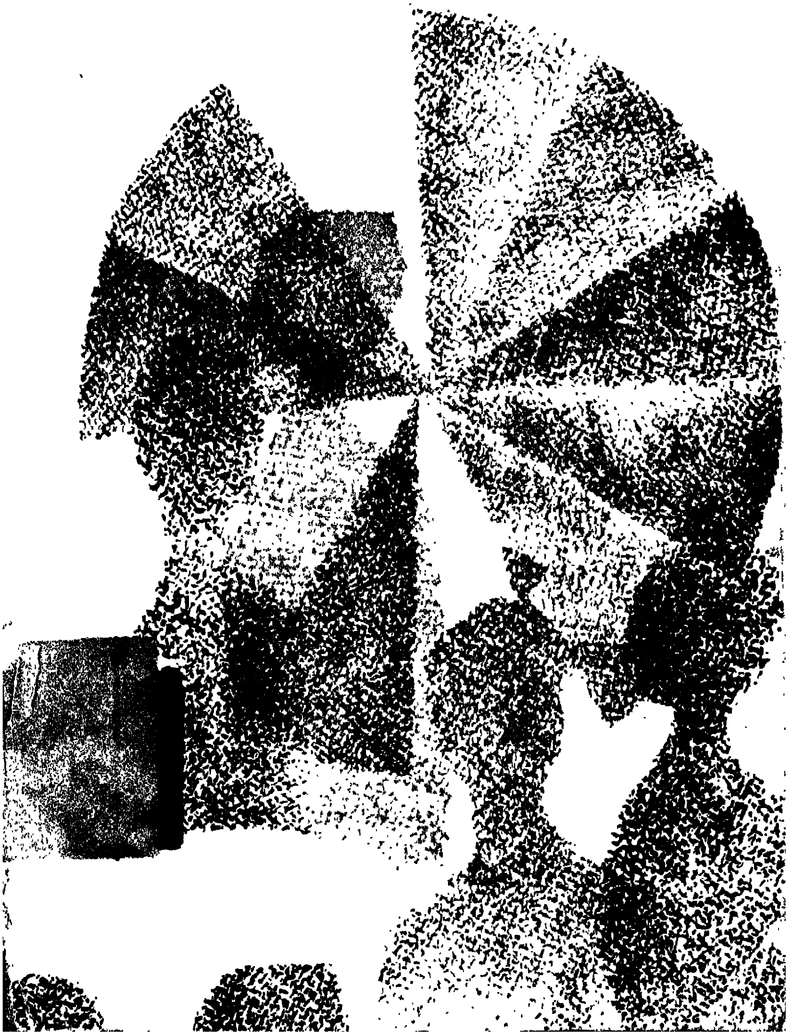
বহ্নি সাগর

কুরঅতুলয়েন হায়দার



আদান-প্রদান পুস্তকমালা

বহ্নি সাগর

কুরঅতুলয়েন হায়দার

অনুবাদ

আশীষ সিন্‌হা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

আমি দেবতাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানি না
কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে নদী
এক শক্তিশালী মাটি সদৃশ দেবতা—ক্রোধী,
নিজের ঋতু ও আক্রোশের মালিক,
বিনাশক :
সে সেই সব কিছু মনে করায়, যা
মানুষ ভুলে যেতে চায় ;
সে প্রতীক্ষারত, এবং দেখতে থাকে, এবং প্রতীক্ষারত ;
নদী আমাদের ভেতরে, সমুদ্র আমাদের ঘিরে রেখেছে—
অন্ত কোথায়—স্বরহীন ক্রন্দনের ;
পাতাঝরায় নিঃশব্দে খসে পড়া ফুলের,
যে চুপচাপ নিজের পাপড়ি ফলে—
জাহাজের ভাসন্ত টুকরোর শেষ কোথায় ?
অন্ত নেই, কোথাও নেই, কেবল বৃদ্ধি আছে ;
এবং দিন তথা ঘন্টার ঘষটে ঘষটে চলার অবিরাম গতি
আমরা যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিকে আবিষ্কার করেছি ।
প্রশ্ন এই নয় যে এই যন্ত্রণার কারণ
ভ্রম ছিল,
অথবা কোনো ভুল আকাঙ্ক্ষা অথবা অহেতুক ভয়
এই মুহূর্ত স্থায়ী, যে ভাবে সময় স্থায়ী—
আমরা এই তথ্যটিকে নিজেদের যন্ত্রণা ছাড়া
অন্যের যন্ত্রণায়
ভালভাবে বুঝতে পারি ।
কেননা আমাদের নিজের ভূতকাল কর্মের ধারায়
লুকোনো আছে ;
কিন্তু, অন্যের পীড়া এক বিশুদ্ধ অনুভূতি,
যা কখনো পুরোনো হয় না ।
লোক বদলে যায়, হাসেও, কিন্তু
যন্ত্রণা থেকে যায় ;

শব এবং খড়-কুটোর প্রবাহে
দুরন্ত নদীর মত—
(কাল সংহারক, স্থিতি-রক্ষক ও)
আমি প্রায়ই ভাবি—কৃষ্ণের তাৎপর্য
কি এই ছিল—
ভবিষ্যৎ একটি ম্লান গীত,
এবং তাদের জন্য যারা যন্ত্রণা ভোগ করতে জন্ম নেয়নি
বিমর্ষ অনুভূতি শুকনো গোলাপ,
এমন একটি বইয়ের পাতার মধ্যে রাখা
যার পাতা কখনো উল্টানো হয়নি।
এগিয়ে চল যাত্রিগণ! অতীত থেকে পালিয়ে
তুমি বিভিন্ন জীবনে অথবা কোনো প্রকারের ভবিষ্যতের দিকে
গতিবান নও—
এগিয়ে চল, তুমি ভাবছ তুমি যাত্রায় বেরিয়েছ—
তুমি সে নও যে বন্দরকে পিছু হটতে দেখেছে,
অথবা যে অন্য তীরে নামবে
এই মুহূর্তে দুই তীরের মধ্যে কাল থেকে গেছে
ভবিষ্যৎ ও অতীতের ওপর নজর রাখ
এই মুহূর্ত কর্ম অথবা অকর্মের নয়। জেনো,
মৃত্যুর সময় মানুষের চেতনা সৎ-এর
যে বিন্দুর ওপর কেন্দ্রগত হয় (এবং মৃত্যুর সময় প্রত্যেকটি মুহূর্ত)
সেটি শুধু এক কর্ম,
যা অন্যের জীবনে আত্মপ্রকাশ করবে।
কর্মফলের জন্য চিন্তা কোরো না, এগিয়ে চল।
হে যাত্রী ও মাঝিগণ!
তুমি, ঘাটের ধারে নামবে। এবং
তুমি, যার শরীর সমুদ্রের নির্ণয় সহ্য করবে,
তোমার সমস্ত যন্ত্রণাই, তোমার
গন্তব্যস্থল হবে।
কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলেছিল—
বিদায় নয়, এগিয়ে যাও—
যাত্রিগণ!...

—টি. এস. ইলিয়ট

এক

নদীর ওপর ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। নদীর ধারে লাল ফুল কুমকুমের মত দেখাচ্ছে। হীরের মত টুকরো টুকরো জলবিন্দু সবুজ ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। ঘাটে নৌকো বাঁধা। বহু দূর থেকে কোনো মাঝির গাওয়া শ্রাবণ-গীত হাওয়ায় ভেসে আসছে। কদম গাছের ঝোপে ময়ূর পাখা মেলে দাঁড়িয়ে।

ঘাটের ধারে অশোক গাছের নীচে তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তারা এবার বসল। একটির পরণে বাসন্তী রংয়ের শাড়ী, চুলে গোঁজা চাঁপা ফুল। দ্বিতীয় মেয়েটির ভুরু নীল রঙে রাঙানো। তার হাবভাব দেখে তাকে রাজকুমারী মনে হয়। তৃতীয় মেয়েটি এদের দাসী। একটি রেশমী ঝালরদার ছাতা খুলে এদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করছিল। অশোক গাছের ধারে একটি ছোট্ট ঝিল। ঝিলের বুকে পানিফলের পাতা ছড়িয়ে রয়েছে। বাসন্তী শাড়ী পরা মেয়েটির বয়স হয়ত পঁচিশ ছাব্বিশ। তার সিঁথিতে সিঁদুর নেই অথচ চুলে শোভিত চাঁপা ফুল। দূরে, ঝোপের কাছে শ্বেত বস্ত্রধারী একজন যুবক, গভীর বিস্ময়ে মেয়েটিকে দেখছিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে চোখ ফিরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বাসন্তী শাড়ী পরা মেয়েটি চুপচাপ নদীর দিকে দৃষ্টি মেলে বসে ছিল, অন্যমনস্কভাবে বলল—"বর্ষা আসছে—"

নীল ভুরু আঁকা মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। সে এখনো ব্রহ্মচারীকে দেখছিল।

শ্রাবস্তী গুরুকুলের শেষ বছরের ছাত্র গৌতম নীলাম্বর ঢাকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। সে ব্রহ্মচারী, তাই হাতে ছাতা নেই। নগ্ন পা। উদাস সুন্দর মুখ তুলে আকাশ দেখল, কালো মেঘ দেখল। অরণ্যে অদ্ভুত সৌন্দর্য। নদী, নৌকো; কদম ঝোপের ধারে পাখা মেলে দাঁড়ানো ময়ূর; ঘাটের ধারে তিনটি

সুন্দর মেয়ে। ঝির ঝির বৃষ্টি, হাল্কা কুয়াসার পটভূমিকায় যাদের মুখ চাঁদের মত ঝলমল করছে···। শ্রাবস্তী এখনো পঞ্চাশ মাইল দূরে। নদীর ধারে এসে গৌতম আর একবার চারিদিকে তাকিয়ে আকাশ দেখল, জঙ্গল দেখল, তারপর নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শীতল জলে, বর্ষার রিমঝিমে শরীর জুড়িয়ে এল। সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল।

"এই সব ছাত্রের জীবন ভীষণ কষ্টের। বেচারা নৌকো পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে না।" ঘাটের ধারে বসা দাসী বলল।

নীল ভুরু আঁকা রাজকুমারী নির্মলা নদীর দিকেই তাকিয়ে রইল—যেদিকে সেই অপরিচিত ছাত্র সাঁতার কাটতে কাটতে কোন অজানা দিশায় এগিয়ে চলেছে।

দাসীর কথার কোন উত্তর দিল না। হঠাৎ নির্মলার চোখের সামনে তার ভাইয়ের ছবি ভেসে উঠল। তার ভাই ঠিক এইভাবে অসংখ্য নদী, অনেক পাহাড়, অনেক সমতল ভূমি পার হয়ে বহুদূর—সেই তক্ষশিলায় গেছে। দশ বছর কেটে গেছে অথচ সে ফেরেনি।

ভাইয়ের কথা মনে করে নির্মলা অত্যন্ত উদাস হয়ে গেল।

উদাস রাজকুমারীকে দেখে দাসী ভাবল, যদি মহারাজকুমার তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসতেন তাহলে কি কুমারী চম্পকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হত না? কিন্তু কুমারী চম্পক আজকাল কবিতা লেখেন, বহুদূর, নাম-না-জানা দেশ থেকে আগত চীনী বিদ্বানদের সঙ্গে আলোচনা-তর্ক করেন। এ সব কথা ভেবে দাসীও উদাস হলো। রাজকুমারী নির্মলা হাত বাড়িয়ে পানিফলের একটা পাতা ছিঁড়ল। ময়ূর মাথা ঘুরিয়ে মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গৌতম এখন নদীর ঠিক মাঝখানে। একবার ফেলে-আসা তীরের দিকে তাকাল। তিনটি মেয়ে এখনো বসে। সামনের দিকে তাকাল। নদীর ধারে সবুজ ঘাস, নীল ফুল, বেত গাছের ডাল জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তীরে পৌঁছে গৌতম নিজের কাপড় নিংড়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে এখন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। এই মন্দিরে সে তার

পাথেয় চণ্ডী দেবীর কাছে গচ্ছিত রেখে অযোধ্যায় গিয়েছিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। মন্দিরের বারান্দায় ঢুকেই তার ভয় করতে লাগল। নিরাকার ব্রহ্ম যখন কোনো রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন তখন সে ভীত হয় কেন! মানুষ অন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। হৃদয়ের কোনো অজানা কোণে লুকানো এই ভীতি বিশ্লেষণ করতে করতে গৌতম অনেক রাত কাটিয়েছে। জীবনের ভয়! মৃত্যুর ভয়! বেঁচে থাকার ভয়! ঋগবেদে আছে, প্রথমে 'অহং' ছিল, যে পুরুষ-রূপে প্রকট হল। সে চারিদিকে দেখল। নিজেকে ছাড়া কাউকে দেখতে পেল না। সে বলল ইহা "আমি"। সে নিজেকে "আমি" ভাবতে লাগল। সে একা তাই তার ভয় করছিল। সে আবার ভাবল, আমি ছাড়া এখানে অন্য লোকের অস্তিত্ব নেই। তবে ভয় কিসের? সে আশঙ্কা ত্যাগ করল। কিন্তু তার মনকে সুখের অনুভূতি স্পর্শ করল না, কেননা নিঃসঙ্গতা মানুষকে সহজেই উদাস করে।

"আত্মার নিঃসঙ্গতায় আমার ভীত হওয়া উচিত নয়।" গৌতম নিজেকে বলল।

শাল ও অশোক গাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপছিল। এখানে ক্ষেত শেষ হয়ে এসেছে। এরপর গভীর অরণ্য; অসংখ্য নদী। এ সমস্ত পার হয়ে সে নিজের আশ্রমে পৌঁছবে। মন্দির ছেড়ে সে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। সরযূ নদীর ওপারে অযোধ্যার আলো জোনাকির মত ঝিলমিল করছে। বর্ষা আর কুয়াশায় দিক্‌দিগন্ত সবুজ। গ্রামে পৌঁছে গৌতম গৃহস্থের বাড়ীর কড়া নাড়ল। বাড়ীর বাইরে প্রদীপ জ্বলছিল। একজন বয়স্ক গৃহস্থ প্রদীপের আলোয় কিছু পড়ছিলেন। তিনি প্রদীপ নিয়ে বাইরে এলেন। প্রদীপের আলোয় দেখলেন, একজন শ্বেত বস্ত্রধারী ব্রহ্মচারী সামনে দাঁড়িয়ে।

"আজকাল এদিকে শাক্যমুনির কয়েকজন ভিক্ষু এসেছে। আমি ভেবেছিলাম, আপনি তাদেরই একজন," গৃহস্থ বললেন। "আজকাল শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও ঘরদোর ছেড়ে জঙ্গলে বাস করছে।"

"আমার একটু জল চাই।" সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল। কিন্তু

বাক্যবাগীশ গৃহস্থ বলে চললেন "সামনের নগরে একটি মেয়ে আছে, রাণী রেণুকার মত রূপবতী। গতকাল আমার স্ত্রী সেদিকে হাটবাজার করার জন্য গিয়েছিল। সে শুনল, ওই মেয়েটিও কোথাও বেড়াতে চলেছে। মেয়েরাও ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে। কি অন্যায়!" ইতিমধ্যে গৃহস্থের স্ত্রী অন্দর থেকে আটা-ডাল নিয়ে এসে ব্রহ্মচারীর শ্বেত চাদরে রাখলেন। গৃহস্থ বলে চললেন "দিনকাল বড়ই খারাপ। মেয়েদের মা-বাবারা আজকাল মেয়েদের বিয়ের কথা ভাবে না। আজকাল মেয়েরাও নির্বাণ লাভের আশায় ঘর ছাড়ছে।" বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এদিকে এসেছে শুনে ব্রহ্মচারী খুশী হল। তাদের দেখা পেলে বেশ আলাপ-আলোচনার মধ্যে রাত কাটানো যাবে।

"ঈশ্বর তোমায় গোধন, সুপুত্র এবং অর্থ সম্পত্তি দিয়ে যেন সুখী করেন!" গৃহস্থকে আশীর্বাদ করল এবং খাবার বেঁধে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল। গৃহস্থ প্রদীপ উঠিয়ে ঘরের ভেতরে গেলেন। গৌতম কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল। ফিরে দেখল, গৃহস্থের ঘরের ভেতরে বাচ্চা ছেলেরা খেলা করছে। গৃহিণী উনুনের সামনে বসে আছেন। চৌথাটে একটা খাঁচার মধ্যে পাহাড়ী টিয়া পাখি। এই শান্ত পরিবেশ গৌতমকে ভীত করে তুলল। উনুনের নরম আঁচে যুবতীর উদ্‌ভাসিত মুখমণ্ডল। বারান্দায় কলাগাছের সবুজ কলাপাতা, খাঁচায় বন্দী টিয়া পাখি—এ সমস্ত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, জ্বলেপুড়ে ছারখার হবে। আবার সেই আগুন থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বলবে, আর একটি গৃহস্থ বাড়ী জন্ম নেবে। সন্ন্যাসী যখন গৃহত্যাগী হয়, এই আগুন সঙ্গে নিয়েই বেরোয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এই মুহূর্ত আসে। তার জীবনে কী আসবে?

গৌতম নিজের শিক্ষাজীবনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। শিক্ষা শেষ করার পর সারা পৃথিবী তার সামনে। হাতে প্রচুর সময়। এখন থেকেই সে জীবনদর্শন নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে কিন্তু সে কেন ভয় পায়? ঘাটের ধারে সবুজ ঘাসের ওপর তিনটি মেয়ে, হাল্কা কুয়াশা, অরণ্য, গেরুয়া বস্ত্রধারী ভিক্ষুরা—বাক্যবাগীশ গহস্থ এবং তার যুবতী পত্নী; এ সবই ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন

প্রতিবিম্ব—পূর্ণ ব্রহ্মার প্রতিবিম্ব।

গৌতম মন্দিরে ফিরে এল। মাটি খুঁড়ে উনুন তৈরি করল এবং একটা ভাঁড়ে চাল চড়িয়ে দিল। সামনে নদীর ওপর অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। মেঘাবৃত চাঁদ। বাতাসে নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। চারিদিক নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেল সে। কেউ অন্ধকারে হেসে উঠল। মনে হল মন্দিরের নীচে কেউ এসেছে। গৌতম তাকে দেখবার চেষ্টা করল কিন্তু অন্ধকারে মুখ দেখতে পেল না।

"তুমি কে ভাই?" নীচ থেকে কেউ ডেকে উঠল—"অন্ধকারে একলা বসে আছ?"

"আমি।" গৌতম উত্তর দিল।

"চমৎকার! তোমার কোনো নাম নেই?"

"'আমি'-র কোন নাম নেই। আমি'র জন্ম আত্মা থেকে। আত্মার কি কোন নাম থাকে?"

ও দিক থেকে কোনো উত্তর এলনা। কিছুক্ষণ পর গৌতম নিজেই বলে উঠল—

"এবার আমি যখন জন্ম নিলাম, শ্রাবস্তীর পণ্ডিতগণ আমার জন্মকুণ্ডলী তৈরি করে স্থির করলেন, আমাকে তাঁরা গৌতম নীলাম্বর বলে ডাকবেন।"

নীল আকাশের গৌতম, ভাই আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এস।"

"মাটি নরম। আপত্তি থাকতে পারে। তুমি উপরে কেন আসছ না?"

"উচু নীচুর তফাৎ মানুষ তৈরি করেছে। তুমি কি জান, তুমি যেখানে আছ, যাকে 'উপর' বলছ, তার গভীরতা পাতালের চেয়েও বেশী?"

"তুমি কি ভাগবত?" গৌতম নীচের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

"কোনো প্রশ্নেরই শেষ জবাব হয় না।" সেই ধ্বনি উত্তর দিল।

আহা, লোকটা হয়ত কোনো তার্কিক জৈন সন্ন্যাসী—গৌতম ভাবল। পাটলিপুত্রের রাজপরিবার আজকাল এদের মাথায় করে রেখেছে। সম্ভবত লোকটা কোনো বৌদ্ধ বিদ্বানও হতে পারে। শাক্যমুনি গৌতম সিদ্ধার্থের এই শিষ্যদের সঙ্গে তর্ক করে গৌতম খুব আনন্দ পায়। আজকাল বন-জঙ্গলে এরকম অনেক কুতার্কিক, সন্দেহবাতিক এবং নাস্তিক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এও তাদের একজন—গৌতম ভাবল। গত শতকে কপিলবস্তুর রাজকুমার প্রাসাদ ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বাষট্টি রকমের মত-মতান্তর, ভিন্ন-ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রচলিত হয়েছিল। মত-মতান্তরের এই সাম্রাজ্যে শাক্যমুনি সিদ্ধার্থ নিজের এক নতুন উপনিবেশ কায়েম করেছিলেন। বাষট্টিটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি!…এবং একটি মাত্র জীবন…এবং একলা মানুষ।

"তুমি কে ভাই?" সে দ্বিতীয়বার ডাক দিল। তার অজ্ঞাত ভয় ফিরে আসছিল।

"নাম কেবলমাত্র কয়েকটি ধ্বনির সমূহ, গৌতম ভাই!" সে উত্তর দিল।

"যারা মনে করে আমি তাদের পরিচিত, তারা হরিশংকর বলে ডাকে।"

"এই জায়গায় নতুন?"

লোকটা কিছুক্ষণ নীরব রইল, তারপর বলল "আমি এখন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসছি।"

"কোথায় লেখাপড়া শিখেছ?"

"তক্ষশিলায়!"

"তক্ষশিলা! আমার ওখানে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে" গৌতম বলল।

"কিন্তু যদি কখনো না যেতে পার, দুঃখ কোরোনা।"

"তুমি তোমার শিক্ষা শেষ করেছ হরিশংকর ভাই?"

"হ্যাঁ, তারপর নদীপথে পাড়ি দিলাম। অনেক দেশ দেখলাম।"

"মথুরা গেলাম। ব্রহ্মাবর্তে হস্তিনাপুরের ভগ্নস্তূপ দেখলাম।

নৌকায় বসে সুদূর পূর্বদেশ পর্যন্ত গেলাম। সব যায়গায় সময় আমাকে ধাওয়া করল। গৌতম, আমার মনে হয় সময় ভীষণ ভয়ানক বস্তু। তুমি কখনো সময়কে ভয় পাও?"

"তুমি গৌতম বুদ্ধের অনুগামী?" গৌতম খুব সহজভাবে বলল।

"হ্যাঁ, তুমিও কি সংঘ-সদস্য?" একজন সুন্দর নবযুবক দেওয়াল টপকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল। তর্কের আনন্দে মেতে উঠে সে নিজের খড়ম একধারে ফেলে বারান্দায় বসে পড়ল।

"তুমি এদিকে কোথাও কাশী-টাশীতে পড়?" গৌতমের বস্ত্র দেখে সে জিগ্যেস করল।

"শ্রাবস্তী গুরুকুলের অন্তিম বৎসরের ছাত্র আমি," সে গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল—"কাশীর পাঠশালা কেবল মহাপণ্ডিত তৈরি করে।"

"তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাই গৌতম নীলাম্বর?"

"এই প্রশ্ন করার জন্যই তুমি অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছ?" গৌতম বিরক্ত হল। হাল্কা চাঁদের আলোয় গৌতম অপরিচিতকে ভাল করে লক্ষ্য করল। তার মনে হল, আগে কোথাও এই লোকটিকে সে দেখেছে।

আমি কোথায় একে দেখেছি? গৌতম মনে করার চেষ্টা করল।

"তুমি মাথার চুল কাটিয়ে ফেলনি কেন? সব ভিক্ষুরাই তো মুণ্ডিত মস্তক!" সে উদাসভাবে প্রশ্ন করল—"তুমি কি সংঘের নিয়ম মেনে চল না?"

"আমি স্বতন্ত্র। আরও স্বাধীনতার অন্বেষণ করছি।" ভিক্ষু দূরে অযোধ্যার আলোর মধ্যে যেন হারিয়ে গেল। "তাহলে তুমি বেদ বিশ্বাস করনা? আস্থা হারিয়েছ?" গৌতম কিছুক্ষণ পর জিগ্যেস করল। সময় এসেছে—সে ভাবল—গৌতম সিদ্ধার্থের শিষ্যের সঙ্গে এইবার নিয়মমাফিক বাদ-বিবাদ শুরু করা যেতে পারে।

শাক্যমুনি এই কোশল দেশেই থাকতেন। তিনিও কপিলের দার্শনিক মতবাদ বিশ্বাস করতেন। তোমার সমস্ত কথা উপনিষদের পাতা খুললেই পাওয়া যাবে। তুমি নিজেকে প্রকাশ করবার সময় শব্দের সাহায্য নাও কেন? শব্দই দুটি পৃথক অস্তিত্বকে কাছে

আনে, একটি সম্বন্ধ স্থাপন করে।" হঠাৎ তার সেই গৃহস্থের কথা মনে পড়ল। সে বলেছিল, অযোধ্যার রাণীও ঘর-সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করতে চায়। "আর আজকাল মেয়েরাও এই মতবাদে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।" একটু রেগে সে নিজের কথা শেষ করল।

হরিশংকর হাসল।

"হাসছ কেন?" মনে নেই তোমাদের আনন্দকে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?" গৌতমের স্বরে ক্রোধের আভাস।

"তুমি নিজেই জানতে পারবে।" ভিক্ষু খুব আস্তে উত্তর দিল আর মাটিতে শুয়ে পড়ল।

"তুমি পালাচ্ছ কেন?" গৌতমের প্রশ্ন।

"তুমি কি খুঁজতে বেরিয়েছ?" হরিশংকরের উত্তর।

"তোমার এত অহংকার ভাল নয় ভাই শংকর। অহংকারী ব্যক্তিরা সব সময়ই নিজের অহমিকার গোলক ধাঁধায় ঘুরতে থাকে।"

"বাজে কথা!" হরিশংকর বলল।

"তুমি পাণিনি পড়েছ?" গৌতম খুব জোর দিয়ে বলল—"কথা এবং শব্দের সীমা না ভেঙে তুমি কখনো কোনো রহস্যের কুলকিনারা করতে পারবে না।"

"শব্দের সীমা ভাঙতে ভাঙতে শব্দের অর্থ বদলে যায়। অর্থ খুঁজতে খুঁজতে আজ আমি কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছি, দেখ!"

"শব্দ শাশ্বত", গৌতম উত্তর দিল—"শব্দ ঈশ্বর। 'ওম্' শব্দের তিনটি অক্ষর এবং সা-প-সা, এই তিনটি সুরের মধ্যে সৃষ্টির সম্পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অর্থ লুকিয়ে আছে। ধ্বনি আকাশের একটি গুণ বা ধর্ম।"

"ঋষি গৌতম কি বলেছিলেন জান? তিনি বলেছিলেন, ধ্বনি যদি শাশ্বত হয় তাহলে মুখ থেকে বেরোবার আগেই শব্দ শুনতে পাওয়া উচিত কেননা আকাশ এবং আমাদের কানের মধ্যে মহাশূন্য ছাড়া আর কিছুই নেই, কোনো বাধা নেই।"

"তুমি কি রকম দার্শনিক যার শব্দের ওপর কোনো আস্থা নেই? শব্দ সেতু। এই সেতুর সাহায্য না নিয়ে তুমি কি করে এগিয়ে যাবে? ধ্বনি শব্দের প্রাকৃতিক গুণ। বস্তু-পদার্থ শাশ্বত, তাই সে ব্রহ্ম।"

"কাল বা সময়কে চিরন্তন মনে করে তোমরা সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছ।" হরিশংকর সহজভাবে বলল।

"আশ্চর্য! তুমি বেদান্ত নিয়েই মশগুল। আর এগোতে পার নি।"

"যা সব কিছুর শেষ তার আগে কে যেতে পারে?"

"এই প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা উচিত।" হরিশংকর বলল।

শব্দ আর অ-শব্দ দুটি পৃথক-পৃথক ব্রহ্ম, শব্দকে স্বীকার করেই অ-শব্দকে প্রকাশ করা যেতে পারে।"

"আমি সেই অ-শব্দ" হরিশংকর বলল। গৌতম চুপ।

"শরীর এবং আত্মা নশ্বর। শরীর এবং আত্মা মিলেও কোন কিছু শাশ্বতর জন্ম দিতে পারে না। আত্মা শাশ্বত নয়। মানুষ প্রদীপের মত নিভে যায়। শুধু ঘটনা এবং ভাবের শৃঙ্খলা রয়ে যায়।…শুয়ে পড়লে গৌতম?

"না। বলে যাও।"

"সঙ্গীত নগরী অযোধ্যায় একটি মেয়ে ছিল। সেও আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে, শাশ্বত সত্ত্বা বলে সত্যিই কিছু আছে। "সুরের মাধুর্যে সে যেন সারা পৃথিবীকে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বেঁধে ফেলতে পারত।" "তুমি গীত এবং স্বরকে অস্বীকার করেছ। কিন্তু দেখো, শেষ পর্যন্ত স্বর থাকবেই। স্বর অটল।" গৌতম বলল।

"আমি যখন উত্তর কোশলের সীমায় পৌঁছলাম তখন কিছু সংখ্যক সৈনিক গর্জে উঠল—"তুমি কোথা থেকে আসছ?" আমি এখান থেকেই গিয়েছিলাম এবং এখানেই ফিরে এসেছি।"—আমি উত্তর দিলাম।

"অর্থ বুঝলে?" সৈনিক নিজের সঙ্গীকে বলল—"মনে হয় কোনো দার্শনিক।" সৈনিকরা নিজের কাজে মন দিল।

"বড় বিচিত্র এই জীবন ভাই গৌতম" শংকর বলে চলল—"জীবন কত বিস্তৃত। দেশ, শহর, গ্রাম, নগর কত ভাগে বিভক্ত এই জীবন! নানা লোক—নানা ভাষা! কত বিচিত্র ধ্বনি! আমি শুনেছি। সমস্ত ধ্বনি আমাকে ধাওয়া করেছিল; আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি—তারা আমার পিছু নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তক্ষশিলায় গিয়ে আমি এদের ভুলতে পেরেছি। এখানে এসে আবার সেই ধ্বনি, সেই স্বর আমার কানে বাজছে। তুমি শব্দ এবং ধ্বনির কথা বলছ! আমাকে জিজ্ঞাসা কর।…আমি জানি। আসলে এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জায়গার প্রভাব। জায়গা বলতে ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত এক-একটি গোষ্ঠী বা লোকালয় যাকে গ্রাম, নগর বা শহর বলা হয়—আমি তাই বোঝাচ্ছি। তাছাড়া অন্য কিছু নয়। সর্ব দুঃখং দুঃখং।"

গৌতম অবাক্ হয়ে শুনছে।

"পবিত্র সরযূ!—মা আমার! আজ রাত্রে অবাক্ হয়ে তোমাকে দেখছি। অযোধ্যা! তোমার আলোর প্রদীপ আর কতক্ষণ জ্বলবে? অযোধ্যা, 'অজ'র, ব্রহ্মার নগর। কেউ এই নগর জয় করতে পারবে না। হে অযোধ্যা! তোমার ঐশ্বর্যও কি অস্থায়ী? কোনো কিছুই কি স্থায়ী নয়? তার নাম চম্পক, সে চাঁপা ফুলের মত সুন্দরী। এই অযোধ্যায় আমার মাতা-পিতা আমার আশায় বসে আছেন—আমার মা-বাবা-বোন, আমার আদরের বোন! কিন্তু আমি বোনের ভালবাসা, ভালবাসার সমস্ত রূপ ও প্রকার—দূরে সরিয়ে দিয়েছি। রাম চোদ্দ বছর বনবাসের পর, কথা দিয়েছিলেন ফিরে আসবেন, আমিও ফিরে এসেছি। কিন্তু আমি কাউকে কথা দিইনি। গৌতম সিদ্ধার্থ কথা দেবার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন।" শংকর উদাস হয়ে গেল।

বাইরে আবার বৃষ্টি পড়ছে।

হাওয়ায় প্রদীপ নিভল। শংকর মাথার নীচে একটা ইঁট রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। গৌতম সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকার—ঠাণ্ডা হাওয়া। গৌতমেরও চোখ আপনা-আপনি বুজে এল।

রাত্রে গৌতম একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। মন্দিরের ঘরের ভেতর থেকে চণ্ডী দেবী বারান্দায় এলেন। হঠাৎ তিনি ঘাটের ধারে বসে থাকা বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরা সেই মেয়েটিতে বদলাতে লাগলেন। তারপর আবার তিনি রূপ বদলালেন। প্রথমে বিবাহিতা স্ত্রী এবং সতী, পরক্ষণেই এক ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করলেন—এক বৃদ্ধা, ভয়াবহ তাঁর চেহারা, কালীর চেয়েও ভয়াবহ! তিনি এগিয়ে গৌতমের মাথার কাছে বসলেন। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। "মাগো··· মা···আমার মা" গৌতম ডাক দিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধা কটমট করে গৌতমের দিকে তাকালেন এবং বললেন—"আমি তোর মা নই। আমি বৈশালীর···।" তাঁর কথা শেষ হবার আগেই টুপ করে একটা ফল গাছ থেকে বারান্দায় খসে পড়ল। গৌতমের ঘুম ভাঙ্গল। সে চটপট উঠে বসল। পাশে শংকর নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। নদীর ধারে চণ্ডাল কোনো শবদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি মন্ত্র পড়তে শুরু করল। অনেকক্ষণ পরে তার আবার ঘুম এল।

খুব ভোরে শংকরের ঘুম ভাঙ্গল। গৌতম তখন চণ্ডীপাঠে মগ্ন। সামনে ঘাটে ব্রাহ্মণরা স্নান করছে। আমের বাগানে নানা পাখির কলরব। পূব দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর রেখা। গৌতম পাঠ শেষ করে বাইরে আসতেই শংকর তাকে দেখে হাসল! হঠাৎ গৌতম জিগ্যেস করল—"বৈশালীতে কে থাকে?"

শংকর নিরুত্তর। তার মুখে হাসি লেগেই আছে। অকারণ হাসির জন্য গৌতম চটে উঠল। দুজনেই মন্দির পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় পা বাড়াল।

"তুমি শ্রাবস্তী ফিরে যাচ্ছ?" শংকরের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ! তুমিও আমার সঙ্গে চল। শ্রাবণ মাসে তুমি আমাদের আশ্রমে থাকতে পার।"

"আমার পথ কণ্টকাকীর্ণ। আমার পথে তুমি পা বাড়িয়ো না, গৌতম ভাই। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা, পথ যদি খুবই সংকীর্ণ হয় আর দুই পথচারী সেই পথে

বিপরীত দিশায় এগোয় তা হলে দুজনেই গর্তে পড়বে। বাঁচতে হলে একজনকে পথ ছেড়ে দাঁড়াতেই হবে।”

“হ্যাঁ।” শংকর উত্তর দিল।

তারা দু'জনেই শ্রাবস্তীর দিকে এগিয়ে চলল। আকাশ মেঘ-মুক্ত। বাতাসে কাঁচা মুকুলের সুবাস। সন্ধ্যেবেলা তারা একটি গ্রামে পৌছে, একটি কুয়ার ধারে বসে পড়ল। সারা গ্রামে রটে গেল, দু'জন ছাত্র গ্রামে এসেছে।

শংকর চোখ বন্ধ করে বসে রইল। একটি সুন্দরী যুবতী দুটি ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে গৌতমের সামনে দাঁড়াল। সে উপহার দিতে চায়। গৌতম যুবতীর হাত থেকে একটি পালক নিল। উল্টে দেখতে লাগল। এই পালক কত দূর-দূরান্তর দেশে যাবে? কারা কিনবে? আমার হাতের পালকটি অযোধ্যার বাজারে চলে যেতে পারে··· আর ঘাটের ধারে বসে থাকা সেই মেয়েটি হয়ত এই পালকটাই কিনে নিতে পারে।

“আমরা বিলাস সামগ্রী নিতে পারি না। নেওয়া নিষেধ। বনে-জঙ্গলে আমরা অনেক ময়ূর দেখতে পাই। তাদের শরীরেই এ পালক মানায়।” মেয়েটি পালক ফেরৎ নিয়ে মাথা নত করে প্রণাম করল।

“তোমার নাম সুজাতা?” গৌতম মধুর হেসে শংকরের দিকে তাকাল। শংকর এখনো চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

“না। আমি নন্দবালা। সুজাতা আমার বড় দিদি।” প্রণাম করে মেয়েটি গ্রামের দিকে চলে গেল।

“ভাই গৌতম! যুগে যুগে পথের প্রত্যেক বাঁকে তোমার সঙ্গে নন্দবালা বা সুজাতার দেখা হতে পারে। সে তোমার সান্নিধ্য প্রার্থনা করবে। এখনো সময় আছে। দৃষ্টি প্রসারিত কর।” হরিশংকর বলল।

ভোরবেলা তারা আবার যাত্রা শুরু করল। শ্রাবস্তী আর বেশী দূর নয়। জঙ্গল শেষ হতে চলেছে। হঠাৎ হরিশংকর দাঁড়িয়ে গৌতমকে বলল—“ভাই গৌতম, বৈশালীতে এক অম্বপালী ছিল। সে, চম্পক, সুজাতা এবং নন্দবালা সব এক। নিজের মনকে বিকার-

মুক্ত কর।" তারপর হঠাৎ হরিশংকর আবার জঙ্গলের দিকে ফিরে যেতে লাগল। গৌতম অনেকবার তাকে ডাকল কিন্তু সে জঙ্গলের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই

রাপ্তী নদী তীরে বিস্তৃত শ্রাবস্তী নগর। নগরের উত্তর দিকে হিমালয়। হিমালয়ের পাদদেশে সমতল এলাকায় সবুজ শস্য বাতাসে দুলছে। ছবির মত সুন্দর শ্রাবস্তী নগর।

দূর দেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে বসবাস করত। রথ নির্মাতা, কুম্ভ নির্মাতা, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি যারা তৈরি করত তারা নগরের এক প্রান্তে থাকত। নগরের বাইরে চণ্ডালদের বাস। তাদের সমাজে সবচেয়ে হীন গোষ্ঠী মনে করা হত। তাদের ভাগ্যে দাহ সংস্কার করা ছাড়া আর কোনো কাজ জুটত না। নগরপতির আদেশ ছিল—তারা ভাঙ্গা বাসনে ভোজন করবে এবং ছিন্ন বস্ত্র পরবে। কাঁসার আভূষণ ছাড়া আর কিছু ধারণ করতে পারবে না।

কিন্তু আজ থেকে সত্তর-আশী বছর পূর্বে কপিলাবস্তু থেকে শাক্য-মুনি শ্রাবস্তী এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মানুষের জীবনে কর্মই প্রধান। কর্মই .মানুষকে ম্লেচ্ছ বা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করে—জন্ম নয়।···সব মানুষই সমান। তাই আজকাল গেরুয়া বস্ত্রধারী ভিক্ষুরা চণ্ডাল ও শূদ্রদের কাছে গিয়ে তাদের সৎকর্ম করার উপদেশ দিচ্ছেন।

মৌনব্রতী ব্রাহ্মণদের মত সারা বছর চুপ থাকার পর, বর্ষকালে বিভোর হয়ে, ব্যাঙ ডাকতে শুরু করেছে। সামনে পুকুর থেকে ক্রমাগত তাদের ডাক গৌতমের কানে আসছে। গৌতম বইটা

একপাশে সরিয়ে সামনের দিকে তাকাল। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক, ময়ূর এবং একসঙ্গে নানা পাখির মধুর কলরব। ঋগবেদে লেখা বর্ষকালের বর্ণনার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। গৌতম কুটীরের বাইরে বসে বসে শ্রাবণ মাসটিকে গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে। দূরে অশোক জঙ্গলের মধ্যে তার আশ্রম। নদীর ধারে ধারে নির্মিত কুটীরে ছাত্ররা থাকে। গৌতম নিজের গুরুর কাছে অনেক বছর ধরে পড়ছিল। নাটক লেখায় এবং চিত্রকলায় গৌতমের বিশেষ রুচি গুরু লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে জন্মজাত কবি তাকে পুরুত বানিয়ে লাভ কি? তাই গৌতম স্থির করেছিল, অধ্যয়ন শেষ করে সে নাটক লিখবে, চিত্রকলা বিষয়ে বই লিখবে, ছবি আঁকবে।

অখিলেশ রাজনীতির ছাত্র। সে কয়েকদিন আগে তক্ষশিলা থেকে ফিরে এসেছে। গৌতমের কুটীরে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে সে তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

"ব্যাপার খুব গোলমেলে ঠেকছে"—অখিলেশকে থামিয়ে বিজ্ঞের মত যোগেন্দ্র বলল "পাটলিপুত্রের সরকার অযথা অনেক অর্থব্যয় করছে…"

"সৈন্য-সামন্তের জন্যও অনেক অর্থব্যয় করা হচ্ছে"—গুণবর্মা বলল—"প্রজা আর বেশী দিন শান্ত থাকবে না।"

শ্রাবস্তীর ভাস্কর বিমলেশ্বর বলল—"মহারাজ ধনানন্দ আগ্নেয়-গিরি'র ওপরে বসে আছেন।" তারপর অখিলেশের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—"তুমি চাণক্যের কথা বলছিলে না?"

"তুমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?"

"কয়েক বার—তক্ষশিলায়।"

তক্ষশিলা-ফেরৎ ছাত্রদের এরা সকলেই সমীহ করত। অখিলেশের মুখে তক্ষশিলার নাম শোনামাত্র সকলের দৃষ্টি তার ওপর পড়ল। সে তাদের চাণক্যের বিষয়ে বলতে লাগল।

গৌতম এদের মধ্যে থেকেও ছিল না। এক কোণায় চুপচাপ বসে ছিল।

"মগধবাসীরা কলহপ্রিয়"—যোগেন্দ্র বলল।

"মগধের সঙ্গে আমাদের সন্ধি কখনো হতে পারে না"—বিমলেশ্বর বলল।

"ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা সারা দেশে রাজত্ব করছে"—অখিলেশ আবার বলতে শুরু করল— "সুদূর সিন্ধুদেশ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের অধিকারে কিন্তু ব্রাহ্মণরা কখনো মগধকে নিজের অধিকারে আনতে পারেনি। অজাতশত্রুর পৌত্রের মৃত্যুর পর ওখানে শূদ্রদের প্রাধান্য। ধনবংশ শূদ্র সম্প্রদায়ের একাংশ এবং মগধ নিম্ন বর্ণের যোদ্ধাদের দেশ।"

"মগধের নতুন রাজধানী গিরিব্রজ, রাজগিরির চেয়েও সুন্দর এবং বৈভবশালী"—গুণবর্মা বলল—"পাটলিপুত্র—"

"এই তো সেদিনের কথা, যখন অজাতশত্রুর পৌত্র উদয় কুসুমপুরের গোড়াপত্তন করলেন। কিন্তু আজ সেই কুসুমপুর এত শক্তিশালী হয়েছে যে, আমরা এখান থেকে তার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি।"—বিমলেশ্বর বলল।

গৌতম প্রদীপের আলোয় নিজের বন্ধুদের দেখল। সে ভাবছে গৌতম সিদ্ধার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই নগরও একদিন আগুন, জলস্রোত ও যুদ্ধের লেলিহান শিখায় ধ্বংস হবে। গ্রাম-নগর এইভাবেই গড়া হয়—এইভাবেই ভাঙ্গা হয়! হৃদয়ের গ্রাম-নগর ও মানুষের গ্রাম-নগর! (আমি অত্যন্ত একা!)

কুটীরের এক কোণায় অখিলেশ একটি ছেলেকে চাণক্যের রাজনীতি বোঝাচ্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে বিমলেশ্বরকে বলল—"তুমি মহারাজ উদয়ের কথা বলছিলে?—আরে ভাই মহারাজ উদয় ইরাণের দারা প্রথমের সমকালীন ছিলেন"—আবার সে ছেলেটির দিকে তাকাল—"আমি তোমাকে চাণক্যের রাজনৈতিক এবং তাঁর দূরদর্শিতার কথা বলছিলাম। সেই সাম্রাজ্যের বিষয়েও বলছিলাম যার সঙ্গে চাণক্য যুক্ত আছেন। দারা'র ইরাণও একটি সাম্রাজ্য।"

"তার অর্থ?" একটি অল্প বয়সী ছাত্রের প্রশ্ন।

"ইরাণীরা যখন গন্ধার আক্রমণ করেছিল তখন ওখানকার রাজা, বিম্বিসারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন যে, ইরাণী সাম্রাজ্য সপ্ত-সিন্ধু'র

উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রজাদের কাছে কর আদায় করছে।”

দারা বলেছিল—“আমি দারয়ুশ, আমি সম্রাট, রাজার রাজা, এই সব দেশের শাহংশাহ! কর আদায় করার অধিকার আমার আছে…” “শাহংশাহ—শাহংশাহ—”গৌতম বলল—“এটা পারস্যদের ভাষা?”

“হ্যাঁ”, অখিলেশ উত্তর দিল, “এবং দারয়ুশের প্রথম পুত্র অর্তথশীজ উত্তরাপথের অধিকৃত এই রাজ্যগুলির বিষয়ে গর্ব করে বলেছিল—“যে যায়গায় দেবতার পূজো করা হত, আমি অর্হমুজদ এর কাছ থেকে বাণী পেয়ে সেই সব মন্দির মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি।”

গৌতম শিউরে উঠল। মানুষ মানুষকে গ্রাস করতে চায়—অর্হমুজদের কাছ থেকে বাণী পেয়ে সব দেব-মন্দির মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

“আর্হমুজদ কে?”

“ঈশ্বরের ইরাণী নাম—” অখিলেশ ওদের আবার বলতে শুরু করল—“কিছু দিন আগে পরসীপোলিস থেকে কিছু ব্যাবসাদার এদিকে পালিয়ে এসেছে। তাদের বক্তব্য, ইরাণের দারয়ুশ তৃতীয়, অত্যন্ত পরাক্রমী সম্রাট কিন্তু যবনের সেনাপতি আলেকসান্দ্র তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। আলেকসান্দ্র সুদূর পশ্চিম থেকে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে আক্রমণ করেছিল।”

গৌতম সব শুনে আশ্চর্য হচ্ছে।

“আজকাল ইরাণ আলেকসান্দ্রের অধীনে”, অখিলেশ নিজের কথা শেষ করল।

“ভাই অখিলেশ, তুমি ক্ষত্রিয়। রাজ্য জয় করা, যুদ্ধ করা, সাম্রাজ্য ধ্বংস করা—তোমার কাজ। আমি এ সব ভাল বুঝি না।” গৌতম বলল।

“গৌতম!” অখিলেশ প্রদীপে তেল দিয়ে প্রদীপটা উঁচু করে ধরল, “তোমাকে যদি কোনো যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে হয় তাহলে তুমি কি যুদ্ধ করবে না?”

“অখিলেশ, তুমি কি মনে কর যুদ্ধ না করলে গৌতমকে প্রজারা

ক্ষমা করবে?" যোগেন্দ্র চেঁচিয়ে উঠল। গৌতম আতঙ্ক-চোখে যোগেন্দ্রকে দেখল।

মগধ রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আবার শুরু হল।

পরের দিন সন্ধ্যায় গৌতম জানালার ধারে বসে একটা ভোজপত্র পড়ছিল। হঠাৎ হরিশংকর এল। "ব্রহ্মচারী, তোমার পবিত্র গৃহে আসতে পারি?" "এস ভাই এস, খবর কি?" গৌতম ভোজপত্র সরিয়ে রাখল, "ভেবেছিলাম তুমি একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেলে, আর দেখা হবেনা।" সে তাড়াতাড়ি মাটিতে মাদুর পেতে হরিশংকরের বসবার জায়গা করে দিল।

"তোমার হৃদয়ের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তোমাকে কী ভীষণ কষ্ট দেয়?" ভোজন করার পর হরিশংকর হঠাৎ গৌতমকে জিজ্ঞেস করল।

"অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ রক্ত-মাংসের ইচ্ছা?"

"তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন" গৌতম থেমে থেমে বলল— "আমার অতীত রক্ত-মাংসের। আমার চারিদিকে রক্ত। এত রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত আমি কি ভাবে করব? আমার বন্ধুরা যুদ্ধের কথা বলছে কিন্তু আমি যুদ্ধ করতে চাইনা।" "যুদ্ধ তোমাকে করতে হবেই। চাওয়া না চাওয়ার প্রশ্ন আসে না।"—হরিশংকর পড়ায় মন দেয়।

বাইরে পলাশের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। হরিশংকর কিছু বলবে ভেবে গৌতম অপেক্ষা করল। কিন্তু বিচিত্র এই ভিক্ষু, যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। তারা দু'জনেই নিঃশব্দে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল।

"জীবন সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল!" গৌতম অনুনয় করে।

"তোমার জীবন আমার জীবন থেকে আলাদা। তোমাকে আমি কিইবা বলতে পারি।" হরিশংকর শুধাল।

"শান্তি কি আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমি যুদ্ধ চাই না—শান্তি

চাই" গৌতম কলম নিয়ে মাটিতে বাবু হয়ে বসল—"তুমি বল, আমি আমার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে শান্তি নিয়ে আলোচনা করব।" "কিন্তু তোমার পুস্তকের শেষ সংস্করণ কে লিখবে শুনি ?" "ইতিহাস গভীর সাগরের মত। আমি-তুমি সেই সাগরে খড়-কুটোর মত ভেসে চলেছি। বর্তমান এবং অতীতের কথাই আমি জানতে পারি। ভবিষ্যতের কথা কি করে বলি ভাই ?"

"কাল নির্ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। সময় স্বপ্নের মত কেটে যাচ্ছে, কেটে যাবে। হরিশংকর বলল। সময় কাটবে, না কেটে যেতে থাকবে !" গৌতম জিজ্ঞাসা করে।

"এটা তোমার নিজের সমস্যা"—ভিক্ষুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"অহিংসা কি আমাকে বুঝিয়ে দাও।" গৌতম জেদী বালকের মত প্রশ্ন করে।

"তুমি না ব্রাহ্মণ ? ব্রাহ্মণ হয়ে অহিংসার পূজারী হতে চাও নাকি" হরিশংকর মুচকি হেসে বলে।

"তোমার মনে আছে, আলার বুদ্ধকে কি বলেছিল ?"

"কি বলেছিল ?"

"বলেছিল—বন্ধুবর, তোমার মত সাধুর সঙ্গ পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশী। যে সিদ্ধান্ত ও যে বিদ্যায় আমি অধিকারী তুমিও তাই। তোমার জীবনদর্শন যা, আমারও তাই। আমি যা তুমিও তাই। তুমি যা আমিও তাই। আমার প্রার্থনা—এস আমরা দুজনে সংঘের সদস্য ও সংরক্ষক হয়ে কাজ করে যাই।" গৌতম কথা শেষ করে চুপ করে বসে রইল।

দূরে ক্ষেতের ঐ পারে আগুন জ্বালানো হচ্ছিল। তমাম গ্রামের লোকের সভা বসেছে। ভাট মহাভারতের কথা শোনাচ্ছিল। উৎসাহিত শ্রোতাদের কলরবে ভাটের কথা কখনো ডুবে যাচ্ছিল। শ্রোতারা শান্ত হলে ভাট আবার নিজের কথা বলে যাচ্ছিল।

"সব শুনছি। কত শব্দ, কত বিচিত্র ধ্বনি !" গৌতম আপন মনে বলে হরিশংকরকে দেখল।

'কৌরব কে ? পাণ্ডব কারা ? কে কাকে পরাজিত করেছিল ?

কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের নির্ণায়ক কে?

"যদি মগধের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাহলে তুমি যুদ্ধ করবে?" গৌতম হঠাৎ প্রশ্ন করল।

"মানুষ স্বাধীন নয়। মানুষ তার পরিবেশের জন্য ঘটনা বা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।"

হঠাৎ নদীর ওপর অনেক আলো ঝলমল করে উঠল।

"কোনো বর বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে চলেছে।" গৌতম একটু অন্যমনস্ক।

"চল বাইরে যাই" হরিশংকর প্রস্তাব করলো।

তারা আশ্রমের বাইরে এসে গ্রামের পথে পা বাড়াল। আলো-সজ্জিত নৌকা নদীর এধারে চলে এসেছে। দূর থেকে গৌতম অনেক লোক দেখতে পাচ্ছে।

'কাদের বরযাত্রী ভাই?" গৌতম একজন পথচারীকে প্রশ্ন করল। পথচারী ভুল সংশোধন করে—"বরযাত্রী না, মহারাজ অযোধ্যা থেকে ফিরছেন।"

গৌতম মুখ ফিরিয়ে শংকরকে ডাকল। শংকর আবার অদৃশ্য হয়েছে। হয়ত ভীড়ে মিশে গেছে। খুঁজে পাওয়া শক্ত। গৌতম কাঁধের চাদর ঠিক করে নগরের দিকে পা বাড়াল। নগরের পৌঁছেও গৌতম থামল না। এগিয়ে গেল নগরের বাইরে, আম্রকুঞ্জের ঠিক মাঝখানে—আজ থেকে একশ বছর আগে শাক্যমুনি যে ভবনে থাকতেন সেইখানে।

গৌতম ভবনের কাছাকাছি গিয়ে আবার ফিরে এল। এবার আশ্রমের দিকে চলল।

মানুষ স্বাধীন নয়। কোথাও মুক্তি নেই। আমি পরাধীন। আমার বুদ্ধি, আমার বিবেক, আমার জীবনদর্শন—কোন কিছুই স্বাধীন নয়। আমি কিছুই করতে পারিনা। একদিন হয়ত নিঃশব্দে ইতিহাস এবং কাল আমাকে গ্রাস করবে।

নদীর ধারে পৌঁছে সে ঘাসের ওপরে শুয়ে পড়ল।

উপনিষদে লেখা আছে, যে কেবল নিজের আত্মাকে ভালবাসে

তার জন্য পিতা পিতা নয়, মাতা মাতা নয়, ইহলোক ইহলোক নয়, দেবতা দেবতা নয়, চোর চোর নয়। ভাল মন্দ নিয়ে সে কখনও চিন্তা করে না কারণ সে সব দুঃখ জয় করেছে।

শাক্যমুনি বলেছেন—"ঈশ্বর আছেন কি না সেটা পরের কথা। মানুষের জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব আছে। পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই দুঃখ আছে—সর্বম্ দুঃখং। একটি প্রদীপের মত ফু দিলে মানুষের জীবন নিভে যায়। রয়ে যায় শুধু ঘটনা ও অনুভূতি।"

জলধারা তীরে এসে ফিরে যাচ্ছে। নদী শান্ত। গৌতম সামনের দিকে চেয়ে আছে।

...আমি দুঃখ চাই। আমি দুর্বল হতে চাই। আমি আমার মূঢ়তার প্রমাণ চাই, আমি দুঃখ পেতে চাই।

হৃদয় এবং মস্তিষ্কের দুঃখ। আমি মুক্তি চাই না? হয়ত না। ...আমার ওপর করুণা করছ শাক্যমুনি? সম্ভবত আমার নিজের ওপর নিজেরই করুণা হয়। কিন্তু রাজকুমার, তোমার কাছে আমার একটিমাত্র প্রশ্ন, কে কাকে করুণা করতে পারে?

তিন

তরাইয়ের যে পথটি শ্রাবস্তীর ঠিক উত্তর দিকে চলে গেছে তার চারিপাশে জঙ্গল। এই জঙ্গলের ঠিক মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। এই জঙ্গলেরই পূর্ব দিকের ঘাটে গত রাত্রে রাজকীয় নৌকো ভিড়েছিল।

মহারাজ—অযোধ্যা এবং উত্তর কোশলে শাসক। তাঁর সঙ্গীরা ভোরবেলা শিকারের জন্য উত্তর দিকে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খবর এল উত্তর দিকে অসময়ে বর্ষা নেমেছে। খবর পেয়ে যাত্রা স্থগিত রাখা হল। গুরু পুরুষোত্তমের আশ্রমের কিছু দূরে, মহুয়া গাছের ছায়ায় তাঁবু পড়ল।

সারা জঙ্গলে যেন মেলা বসে গেছে। আগে যেখানে শুধু কয়েকটা হরিণ দেখা যেত কিংবা দু'একজন ছাত্র নিরিবিলিতে বসে ধ্যান করত—সেই যায়গা এখন জমজমাট।

রাজকুলের মেয়েরা সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত আর অন্ধকার হলে নদীতে সাঁতার কাটত। দিনে কখনো তীর-ধনুক নিয়ে হরিণ শিকার করত।

দু-তিন দিনের মধ্যেই চম্পক হাঁফিয়ে উঠল। সে রাজকুমারী নির্মলাকে সঙ্গে করে বস্তীর দিকে চলল।

নির্মলা প্রস্তাব করল—

"এস, যে দিক থেকে গানের কলি ভেসে আসছে, সেই দিকে যাই।"

শুকনো পাতা মাড়িয়ে, আম গাছের পাশ দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। গাছের ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে তাদের দৃষ্টি দূরে একটি আশ্রমের দিকে পড়ল।

"আমরা কোথায় এলাম?" চম্পক কদম গাছের ডালের ওপর একটি হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। "সামনে ছেলেরা কে?" নির্মলাও হঠাৎ প্রশ্ন করল। যেখানেই কোন ব্রহ্মচারী শ্বেত বস্ত্রধারীকে দেখে তার নিজের ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

গৌতম নীলাম্বর তিন দিন ক্রমাগত অনাহারে কাটাল। রাত্রে নদীর শীতল জলে এক পায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল তার পর নদীর ধারে কাঁটার শয্যায় শুয়ে পড়ল।

চতুর্থ দিন বিরক্ত হয়ে এ সব ছেড়ে সন্ধ্যে বেলা ধীর পদক্ষেপে সে আশ্রমের পথ ধরল। তাকে কেউ ডাকছে। সে পিছু ফিরে দেখল। অখিলেশ হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

"কি ব্যাপার? তিন দিন কোথায় ছিলে ভাই গৌতম?"

"এখানেই। তুমি এখানে কি করছ অখিলেশ?"

"তুমি যা করছ।"

"আমি ঈশ্বরের লীলা দেখছি।"

"ঈশ্বরের লীলারঙ্গের একাংশ আমিও দেখেছি, গতকাল। তীর-

এবং শাক্যমুনিকে অনেক বেশী বিশ্বাস করে।"

"আমাকে একটু আটা আর ডাল এনে দাও, আমার পথ বড় দুর্গম।" গৌতম একটু রেগে গেল। এই মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার দেখবার জন্য গৌতম মাসের পর মাস পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে। আজ যখন সে তার সামনে দাঁড়িয়ে, গৌতম ঝগড়া করতে ব্যস্ত। কেন জানিনা হঠাৎ তার মনে হল মেয়েটি তার আপন মানুষ, তার অস্তিত্বের তার হৃদয়েরই অংশ। তার সামনে যে দাঁড়িয়ে গৌতম তাকে যুগ যুগান্তর ধরে চেনে। সে অপরিচিতা নয় তাই সংকোচ, লজ্জা বা ভয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয় মেয়েটি গৌতমকে একদৃষ্টে দেখছিল। গৌতমও তাকিয়ে দেখল। সে হরিশংকরের বোন।

শিবির থেকে আটা এনে চম্পক গৌতমের ভিক্ষাপাত্রে রাখল।

"যাও। আবার কখনো এস।"

সে নমস্কার করে শিবিরের বাইরে এল। গৌতম জানত না কে এই মেয়ে দুটি এবং মহারাজার এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি! শিবিরের আশেপাশে আরও অনেক মেয়ে ঘুরছে কিন্তু এই মেয়ে দুটি'র প্রকৃতি অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা।

"এই মেয়ে দুটি কে?" একজন বৃদ্ধা শিবিরের দিকে যাচ্ছিল। গৌতমের প্রশ্নে থমকে দাঁড়াল। তারপর ভ্রূকুটি হেনে বলল—"তুমি না ব্রহ্মচারী! এ সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসা তোমার পক্ষে অশোভন। একথা জেনে তোমার একটুও ভালো লাগা উচিত নয় যে একজন রাজগুরুর মেয়ে চম্পাবত এবং একজন রাজকুমারী নির্মলা এবং এরা মহারাজার সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছে।"

গৌতম দাঁড়িয়ে রইল।

বৃদ্ধা চোখ বড় বড় করে আবার বলল—"শোনো, তুমি আর কখনো এদিকে এসো না। সন্ন্যাসীর রূপ ধরে অনেক চোর আর ঠগ আজকাল ঘোরাফেরা করছে।"

"অভদ্র, ইতর," গৌতম বিড় বিড় করে বলে আশ্রমের দিকে পা বাড়াল।

পরের দিন গৌতম গায়ে একটা চাদর লেপটে নিয়ে আবার শিবিরের কাছে গিয়ে হাজির হল। চারিদিকে ঘুরেও তাকে দেখতে পেল না। রাজকূলের মেয়েরা জনসাধারণের ভীড়ের মধ্যে সহজে আসতে চায় না। সম্ভবত জরির কাজকরা সামিয়ানার নীচে বসে তোতা পাখীকে পড়াচ্ছে—গৌতম মুচকি হাসলো। গৌতম শুনেছিল, তোতা পাখিদের পড়ানো বড়ঘরের মেয়েদের একটা কাজ। সম্ভবত সে পাল্কী চড়ে কোথাও বেড়াতে বেড়িয়েছে! অথবা……
"আমি এখানে!" কদম গাছ থেকে লাফিয়ে সে নীচে নামল। গৌতম চিন্তিত হয়ে উঠল।

"তুমিও উদাস! আমারও একটুও ভাল লাগছে না। গতকাল থেকে নির্মলাও অত্যন্ত উদাস হয়ে বসে আছে।"

"নির্মলার কিসের দুঃখ?"

"তার ভাই রাজ্য ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আর ফেরেনি। তোমাকে দেখে তার ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে।"

"শুনেছি গৌতম সিদ্ধার্থের অনুরোধে আনন্দ নিজের প্রিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন।"

সে চুপ।

"যদি আনন্দ ফিরে আসে! আমার মনে হয় সেও ফিরে আসবে।"

"তার ফিরে আসা উচিত নয়। মুক্তি অসাধারণ বস্তু! তাকে মনে করিয়ে দিও যে শাক্যমুনি মহামতীকে কি বলেছিলেন।"

"কি বলেছিলেন?"

শাক্যমুনি বলেছিলেন—"হে মহামতী! মানুষ একদিনে শিল্পী হতে পারে না। ছবি আঁকা শিখতে, নাটক করতে শিখতে, বীণা বাজানো শিখতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। মানুষ একটু একটু করে এগোয়। তেমনই ত্যাগ স্বীকার করা শিখতেও মানুষের অনেক সময় লাগে। আমাদের মহারাজকুমারও ত্যাগকে একটা শিল্পচেতনা হিসেবে স্বীকার করেছেন। তারা কথা বলতে বলতে শিবিরের পেছন দিকের উঁচু যায়গায় বসে পড়ল।

"চল তোমাকে আমার ছবি দেখাই।" গৌতমের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

"ছবি দেখে আমার লাভ ?" চম্পকের স্বরে খুশীর আমেজ।

"তুমি ভাবছ অন্যান্য ছাত্রদের মত আমি অকেজো, কল্পনাবিলাসী একটা ভাঁড় ! চম্পকরাণী, একদিন এমন নিশ্চয় আসবে যেদিন তুমি শুনবে, শ্রাবস্তীর গৌতম নীলাম্বর চিত্রকলার এক বিরাট আচার্য হয়ে গেছে।" সে শিশুর মত অভিমান মাখানো সুরে কথা বলল, তারপর চম্পককে দেখল। তার আশঙ্কা চম্পক রেগে উঠবে এবং তাকে কথা শোনাবে কিন্তু সে চুপ রইল। চম্পক নিরুত্তরই রইল। আজ থেকে দশ বছর আগে হরি তাকে ঠিক এই ভাবেই বলেছিল— "তুমি ভাবছ আমি অন্য ছাত্রদের মত একটা কল্পনাবিলাসী, অকর্মণ্য ভাঁড় ! কিন্তু চম্পকরাণী একদিন তুমি শুনবে যে অযোধ্যার মহারাজকুমার এক বিরাট গণিতজ্ঞ হয়ে গেছে।"

অভিব্যক্তির স্থান উদ্দেশ্যর ওপরে। বেদান্ত বলেছে, কামনার আবরণে জড়ানো আত্মার কাছে সৃষ্টি মরীচিকার মত, যে মরীচিকা দেখে তৃষ্ণার্ত হরিণ মরুভূমিতে নদী খুঁজে বেড়ায়। এই মরীচিকা আমাকে, হরিকে ভীষণ ব্যাকুল করেছে।

উদ্দেশ্য কি ?—মূল উদ্দেশ্য কি ? সে উঠে দাঁড়াল—

"আনন্দের দেখা যদি তুমি কখনো পাও, তাহলে তাকে বোলো, সুন্দরী আজ মরীচিকা থেকেও মুক্ত। সে যেন চিন্তা না করে।

"তুমি বেড়াতে যাচ্ছ এ কথা কি সত্যি ?"

"কচিৎ-কখনও ! ক্ষতি কি ?" এটাও অনুভব করে দেখা উচিত।

"চম্পক, তোমার বয়স কত ?"

"অনেক শত বর্ষ। আমার মনেও নেই।" চম্পক হাসল।

"কয়েকদিন আগে ভাটের কাছ থেকে অর্জুন আর ভীমের কথা শুনে ভাবছিলাম, চিত্রাঙ্গদা আর অলোপী দেখতে কেমন ছিল।"

"আমাকে দেখে জেনে গেছ ত ?" সে আবার হাসল—"তুমি তো ভাস্কর ?"

"হ্যাঁ কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ প্রত্যেক সুকুমার শিল্প রূপ এবং নামের সংমিশ্রণ। চোখের জন্য রূপ, নামের জন্য কান।

"কিন্তু যে বস্তু বিশুদ্ধ, তাকে বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা যায়,

অনুভূতি দিয়ে নয়। নয়তো তুমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গীকেই খণ্ডন করছো বুঝবো।"

"কোনো বস্তুর বিশুদ্ধ রূপ তার গুণ বা ধর্ম" গৌতমের উত্তর। "কোনো ভৌতিক লক্ষণের দ্বারা তার দিকে সংকেত করা যেতে পারে, তাকে ভৌতিক লক্ষণ হিসেবে ধরা যেতে পারে না।"

"আকাশে রূপম্ লক্ষণম্" চম্পক আবার হাসল।

"বিশুদ্ধ রূপ অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করে" গৌতম উত্তেজিত হয়ে বলে, "বিশুদ্ধ রূপ স্বয়ং কোনো অস্তিত্ব নয়।"

"আচ্ছা গৌতম, বল তুমি কি হতে চাও ?"

"বলব। একদিন তোমাকে বলব, নিশ্চয় বলব আমি কি হতে চাই।"

পেছনে নূপুর বেজে উঠল। শ্বেত ফুলের ঝুড়ি নিয়ে নির্মলা এদিকে আসছে। গৌতমকে দেখে ফুলের ঝুড়ি মাটিতে রেখে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। গৌতম বুদ্ধ, পবিত্র ব্রাহ্মণের মত তাকে আশীর্বাদ করলো ও আশ্রমের দিকে ফিরে গেল।

ধন্য তারা যারা মনের শান্তি পেয়েছে। চম্পক মনে-মনে বলল এবং তার মনে পড়ল, গৌতম সিদ্ধার্থ গয়ায় একবার বলেছিলেন—"হে পুরোহিত সম্পূর্ণ বিশ্ব আগুনে পুড়ছে। দৃষ্টি, ইন্দ্রিয়, আকার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, অত্যধিক তৃষ্ণা, শব্দ, গন্ধ, বুদ্ধি, মস্তিষ্ক, বিচার সব কিছুই আগুনে পুড়ছে। এই আগুন, হে পুরোহিত ! ঘৃণা এবং প্রেম, জন্ম এবং বার্ধক্য, মৃত্যু, শোক, দুঃখ এবং নিরাশার আগুন।"

বহুদিন আগে গৌতম সিদ্ধার্থের বলা কথা চম্পকের মনে পড়ল।

গুরুকুলের ছাত্র ফিরে গিয়েছিল। জঙ্গলে মন মাতানো পূবের হাওয়া গাছের নীচে ভিক্ষু মহিলারা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেছিল। তাঁদের মুখে কি অপরূপ শান্তি ! তারা একটি প্রবাহে প্রবেশ করেছে—সেই পথে চলেছে, যেখান থেকে পিছু ফিরবার আর কোনো উপায় নেই। আমিও কি এই প্রবাহে মিশে যেতে পারব না ? চম্পক উদাস হয়ে ভাবতে লাগল।

চার

"মহিলাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কি রকম হওয়া উচিত?" শতবর্ষ আগে এই শ্রাবস্তী নগরের অনেকের মুখে এই প্রশ্ন জেগেছিল।

"তাদের দিকে তাকিও না।" এ উত্তর পেয়েছিল।

"যদি ওদের উপর দৃষ্টি পড়ে যায়।"

"কথা বোলো না।"

"কিন্তু তারা যদি কথা বলতে চায়?"

"জেগে থেকো।"

এক নাগাড়ে কয়েক রাত জেগে থাকায় চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আসছিল কিন্তু অনেক কষ্টে সে চোখ খুলে রাখল।

রাজকীয় শিবির থেকে নূপুরধ্বনি ভেসে আসছে। চতুর্দশীর চাঁদ ঠিক আশ্রমের উপরে। চাঁদের আলোয় ছোট ছোট কুটীর এবং তার আশে পাশে ছড়ানো পুষ্প লতার ঝোপ যেন গভীর শান্তিতে ডুবে আছে। কোথাও কোথাও প্রদীপ জ্বলছে। সব ছাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল গৌতমের চোখে ঘুম নেই।

গৌতম বিছানা ছেড়ে উঠল। গায়ে চাদর জড়িয়ে আশ্রমের বাইরে এল এবং মহুয়ার বাগানের দিকে চলতে লাগলো। ম্লান চাঁদের আলো। দূরে শিবির। সে শিবিরের দিকে চলল। পায়ের নীচে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি উঠল।—এদিক ওদিক দেখে, ভয় কেউ না ওকে চিনে ফেলে হঠাৎ এক কাঠবেড়াল তাকে দেখে চমকে পালাল। মশালের আলোয় সজ্জিত শিবিরের একাংশে গৌতম প্রবেশ করল। মণ্ডপে সঙ্গীতমণ্ডলীর মেয়েরা বসেছিল। আশেপাশে যন্ত্র ছড়ানো।

গত কাল তাকে যে কটু কথা শুনিয়েছিল সেই বৃদ্ধাকে হঠাৎ গৌতম দেখতে পেল। একটা তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সে একটি মেয়ের নাচ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল।—দর্শকরা দেখল শিবিরের পেছন থেকে মণ্ডপে এক যুবকের আবির্ভাব। সে নূপুর পরল, চাদর একদিকে সরিয়ে ফেলে আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল।

জনসমূহ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার নৃত্য দেখছে। যেন স্বয়ং নটরাজ।

চম্পক নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য হয়ে যুবককে দেখল। জোরে জোরে মৃদঙ্গ বাজছে। হঠাৎ নাচতে নাচতে সে ঠিক মণ্ডপের মাঝখানে চলে এল।

সে নৃত্যের আটটি রসের প্রদর্শন করল। এটা শিবের নৃত্য যার বস্ত্র চাঁদ আর তারা দিয়ে তৈরী, যার বাণী একমাত্র সত্য! শিব যে স্বয়ং সঙ্গীত, যে স্বয়ং সর্বভৌম! চম্পক নিজের যায়গা থেকে সরে এসে তার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল। সে গৌরী আর সে যুবকটি শংকর।

চাঁদের আলো মাঠে ময়দানে মধুর সঙ্গীতের মত ছড়িয়ে। নদীর জলে চাঁদের আলো ঝলমল করছে—মনে হচ্ছে রূপোর পরাত এদিক থেকে ওদিকে প্রসারিত। নদীর ধারে রূপালী বালুকারাশির উপর রূপোর সারস পাখি শুয়ে। কার্তিকের পূর্ণচন্দ্রে দিক-দিগন্ত উদ্‌ভাসিত।

কিন্তু সে রাতও শেষ হল। গান এবং বাজনার মধুর তান ঝিমিয়ে এল। ভোর হতে হতে শিবির নিস্তব্ধ হয়ে এল। মণ্ডপে কিছু ফুল আর মালা ছড়িয়ে রইল।

ভোর। হিমালয়ের চূড়ায় কুয়াশা। সরোবরে লাল পদ্ম ফুটেছে। পথে পথে কলসী হাতে গ্রামের মেয়েরা সরোবরের দিকে চলেছে। নরম রোদে তাদের কলস ঝলমল করছে। মহুয়ার হলদে ফুলে মৌমাছি গুনগুন করছে। মৌমাছির গুনগুন তার কানে গেল। কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গল না। ভোরের নরম রোদ তীব্র হল। তার চোখ-মুখ সেই রোদ সহ্য করতে পারল না। তার ঘুম ভাঙ্গল। সে দেখল সরোবরের সিঁড়ির ধারে সে শুয়ে আছে। ঘাবড়ে উঠে চারিদিকে তাকাল সে এখানে কেন? এসব কী? অনেক চেষ্টা করেও সে কিছুই মনে করতে পারল না।

সে সিঁড়ির ওপর উঠে বসল। সহসা তার দৃষ্টি পড়ল মহুয়ার

শান্ত জঙ্গলে। কাঠবেড়ালরা বেলফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মহুয়া গাছের পেছন দিক দিয়ে একটা হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল। একদল সবুজ টিয়া পাখি গাছের ডাল থেকে আকাশে উড়ে গেল। সে বিস্মিত ও ব্যাকুল হয়ে বসে রইল। তার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হল। হঠাৎ অস্পষ্ট স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে সব কিছু ভেসে উঠল। ঠিক এই যায়গায় গত রাত্রে রাজকীয় শিবিরে সে প্রায় সারারাত নেচেছিল। নাচতে নাচতে সে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তখন রাজা স্বয়ং তাকে ডেকে নিজের পাশে বসিয়েছিলেন। সে রাজার সঙ্গে বসে মাংস এবং মদিরা পান করেছিল। কিন্তু সেই গান-বাজনার আসরে তার দৃষ্টি বরাবর চম্পককে খুঁজছিল। চম্পক নৃত্য শেষ করেই শিবিরের অন্তঃপুরে চলে গিয়েছিল। চম্পকের জন্য সে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। চম্পক আসেনি। সে আশ্রমের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সরোবরের কাছে এসে সে ভীষণ ক্লান্তি বোধ করল এবং সরোবরের ধারে শুয়ে পড়ল। ভোরে প্রস্থানের দুন্দুভি বাজল, রাজকীয় শিবির উঠিয়ে নেওয়া হল। রাজকীয় শিবির যখন শিকারের জন্য প্রস্থান করছিল সেই সময় সরোবরের পাশ দিয়ে চম্পকের সাথে যেতে যেতে নির্মলা তাকে বললো "অদ্ভুত ব্রাহ্মণ! গত পরশু চিত্রকলা নিয়ে তোমার সঙ্গে বাদ-বিবাদ করেছিল, রাত্রে নটরাজের মত নাচছিল আর এখন শিশুর মত ঘুমিয়ে আছে। যাবার আগে এস একে জাগিয়ে প্রণাম করে যাই।"

চম্পক কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারপর বলল "না, কেননা যে জেগে থাকে, সে একদিন ঘুমিয়ে পড়ে; আর যে ঘুমিয়ে থাকে, সে একদিন জেগে ওঠেই। যারা সব সময় জেগে থাকে তাদের দেখ।" সে মুক্তাখচিত পাল্কীর দিকে এগিয়ে চলল।

নিস্তব্ধ মহুয়ার বাগান। সরোবরের সিঁড়িতে সে একলা। তার মনে হল, এক রাতে সে অনেক বড় হয়ে গেছে। সে মায়া অনুভব করেছে, প্রয়োগ করেছে। এই অনুভূতি তাকে অসন্তুষ্ট করেনি। কি বিচিত্র এই অনুভূতি! শিবের মত সে যেন গরল পান করেছে।

কি অদ্ভুত প্রয়োগ! কপিলের সঙ্গে সে এই প্রতিযোগিতায় তো নামেনি? হরিশংকরের কথা তার মনে পড়ছে। হরিশংকর এখন হয়তো হাজার মাইল দূরে।

কিন্তু চম্পক যাবার সময় তার সঙ্গে দেখা করেনি। তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে কথাও বলেনি। চম্পক এবং তার অস্তিত্ব কি পৃথক? না। চম্পক সদাসর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সব সময়ই সে তার সঙ্গে কথা বলছে!...চম্পক কি সত্যই আমার সঙ্গে আছে? আমার মধ্যে? আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে?...বাজে কথা। আমি নিজেকেই প্রতারণা করছি। আমি তো মায়ার জালে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছি। চম্পক স্বতন্ত্র। অনেক দূরে সে। কোথায় সে আর কোথায় আমি! সব মিথ্যে। সব অর্থহীন।

"চমৎকার!" সে পুকুরের সিঁড়ির উপর থেকে উঠে দাঁড়াল। এখানেই সেদিন সে বসে ছিল। "তুমি রাজার সমভিব্যাহারে হাতী শিকারে বেরিয়েছে। আর জীবন? তোমাকে ছাড়াও কাটানো যেতে পারে।"

আশ্রমের পথে চলতে চলতে তার মনে পড়ল—তার শিক্ষার এটা শেষ বর্ষ। কিছুদিন পর তার পিতা আসবেন। গুরু তাকে বিদায় দেবার সময় বলবেন—'সদা সত্য কথা বলবে। ধর্মাচরণ করবে' (ধর্ম?) আশ্রমের ছাত্ররা তাকে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসবে! সে জীবনে প্রথমবার চোখে কাজল পরবে। কানে কুণ্ডল পরবে। মাথায় প্রতিষ্ঠা সূচক পাগড়ী বেঁধে কাঁধে গরম কম্বল নিয়ে, জুতো পরে, চুলে সজারুর কাঁটার চিরুনী আটকে মাথার ওপরে ছাতা নিয়ে শ্রাবস্তীর রাস্তায় বেরোবে। পুরোহিতের গদীতে বসবে। অযোধ্যা এবং পাটলিপুত্রের রাজসভায় যাবে। রাজার মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দেবে। আর সেই মূর্খ মেয়েটি মগধের কোনো নিরালা জঙ্গলে মাথা ন্যাড়া করে, শাক্যমুনির উপদেশ মত নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে তপস্যা করে যাবে।

চম্পকের গর্ব কিসের? সে যদি নিজের প্রতিভা নিয়ে গর্ব করতে

পারে, আমি কি আমার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করতে পারিনা? কেবল ছবি আঁকা ও ভাস্কর্যের মধ্যে কি আছে? আমার হাতে লেখনী। জ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে, আমি বিধান সৃষ্টি করব। মনু, কপিল ও জৈমিনীও আমার সৃষ্টির ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস করবে না। শুধুমাত্র চিত্রকলা নয়, ভাস্কর্য নয় আমি সূত্রকার হব। চম্পককে না পেলে কি চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল? সরস্বতীও তো আমার। তিনি আমায় কখনো এভাবে ছেড়ে যাবেন না?

আর চম্পকের কাছে এমন কিই বা আছে! সংসারে হাজারটা সুন্দরী আছে। নির্মলাও কত সুন্দরী!...চম্পক? খুঁটিয়ে দেখলে সে এমন কিছু সুন্দরী নয়।

রাস্তায় চলতে চলতে সে তিন চারটে পাথরে লাথি মারল। আমি ঠিক করে ফেলেছি কোনোদিন তোমার ছবি আঁকব না। তুমি নিজেকে কি ভেবেছ? আমি তোমার পরোয়া করিনা। আমি তো তোমার রূপ ভুলে যেতে বসেছি। রূপ কেবল একটা আকার। আমার হৃদয়ে যে রূপ সুরক্ষিত তাকে শুধু বিশ্বকর্মাই চিনতে পারে।

নিজের ঘরে গেল কিন্তু আবার বেরিয়ে এল। এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। আশ্রমে ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকে দেখলো। একজন ছাত্র প্রশ্ন করলো "কাল রাত থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় ছিলে?" কোনো উত্তর নেই।

অখিলেশকে একটা মিথ্যা কথা বলে দিল—'নদীর ধারে তপস্যা করছিলাম'। জীবনে প্রথমবার সে মিথ্যে কথা বললো। এখন দুনিয়ার এ তমাম অসত্য তার ভাল লাগছে। সে সান্ধ্য-আরাধনা করল না, গুরুর দর্শনও করল না। আশ্রমের বাগানে বেয়াড়ার মত ঘুরতে লাগল।

আমি কখনো তার ছবি আঁকব না। সুকুমারশিল্প ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধার ধারে না। বার বার মনে মনে এসব কথাই আওড়াতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। সে শিল্পী। সৃষ্টির প্রেরণা তাকে ব্যাকুল করে তুলল।

পরের দিন সকাল বেলা রং আর তুলি নিয়ে সে মহুয়ার বাগানে

পুকুরের ধারে গিয়ে বসল। গেরু গুঁড়ো করে লাল রং তৈরী করল। বাটিতে জল গুলে নীল রং মেশাল। হলুদ আর কেশর মিশিয়ে বাসন্তী রং তৈরী করল। অন্য রঙের জন্য গাছের শেকড় ফুটিয়ে শ্বেত পাথর সামনে রেখে ছবি আঁকতে শুরু করল। কিন্তু রূপ আর অরূপের দ্বন্দ্ব তার তুলি যেন থামিয়ে দিল। আমি কার প্রতিচ্ছবি আঁকব? বেদান্ত বলে—ঈশ্বর নিরাকার। তার কোনো রূপ নেই। সে অগোচর। প্রধান সমস্যা এই যে, ভাবনার বিচার স্রেফ প্রতীকের সাহায্যে দর্শকের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে। কিন্তু বিচার থেকে পৃথক। গৌতম ভাবল, জীবিত অস্তিত্বই জীবন, লক্ষণ নয়। তার প্রতি আকর্ষণ ভাবনার ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া শিল্পী বিশুদ্ধ বিচারকে কি ভাবে উপস্থিত করবে? তার দৃষ্টিকোণ তো নিরপেক্ষ থাকবে না। ধ্যান—যা শিল্পীর জীবনের মূলমন্ত্র—সম্পূর্ণ থাকতে পারে না। বিশুদ্ধ আকৃতিবস্তুর কল্পনা যা বস্তুরই মধ্যে—তাকে অনুভব করা শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। বস্তুর নিজস্ব রূপকে কি ভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়?

যথার্থ জীবন থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এইভাবে সরোবরের ধারে বসে-বসে সে অনেক ছবি আঁকল এবং মুছে ফেলল। লাল মাটি দিয়ে অনেক মূর্তি গড়ল আর ভাঙ্গল।

আশ্রমের দেওয়ালে মাটি কাঠ গুঁড়ো আর চুন দিয়ে অনেক আকৃতি আঁকল। লাল মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ল। তার শ্বেত পাথরের পটে এতদিন সে ব্রহ্মজ্ঞান সূচক ছবি এঁকেছে—ত্রিশূল, কল্পবৃক্ষ, সংসার চক্র, পদ্মাসন, অগ্নিস্তম্ভ ইত্যাদি। এবার সে সেই পটে বাস্তব জীবনের ছবি আঁকল—স্ত্রী, কৃষক, শিশু, ফুল ও ফুলের মুকুল। এই ছবিগুলিতে জীবনের স্পন্দন ছিল, ছিল প্রচণ্ড এক আকর্ষণ, জীবনের জয়গান।

হঠাৎ একদিন সে সুন্দরী যক্ষিণীর প্রতিমা গড়ল। সুন্দরী যক্ষিণী কদম গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

নগরের ,শিল্পীরা তার নতুন সৃষ্টি দেখে অভিভূত হল। অবশ্য চিত্রশালা আর মন্দিরের পাণ্ডাদের মোটেই পছন্দ হল না।

সমালোচকরা তার সমস্ত আকৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কিন্তু সবাই অবাক হয়ে গেল, গৌতমকে কেউ প্রশংসা করল না।

তাকে নিয়ে শিল্পী এবং সমালোচকদের মধ্যে তুমুল তর্ক উঠল। গৌতম শান্তভাবে সবার কথা শুনল, কিন্তু কিছু বলল না। সে দর্শনশাস্ত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছে, তাই সে বলতে পারল না যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অনুভূতি আসলে কি এবং কি ভাবেই তা গ্রহণ করা যায়। কি ভাবে অপরের কাছে এই বিশেষ অনুভূতি পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে? রূপ ও অরূপ, ভাব ও অ-ভাবের দ্বন্দের শেষ কোথায়? সে মানুষকে জীবনের সমস্ত রহস্যকে ছবি এবং প্রতিমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। বেদান্তের উপাসক হিসাবে সে চিন্তা করল বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বোধের অনুভূতি জাগায় পৃথক আনন্দ, যা বিদ্যুতের মত অখণ্ড এবং অভিভাজ্য, স্বয়ং-প্রকাশ। যে ভাবে শিল্পীর কল্পনা বিশ্বকর্মার কল্পনায় নিহিত, ঠিক সেই ভাবে আত্মা অহংয়ের মধ্যে দ্রষ্টা প্রতি মুহূর্ত দেখছে। তার স্বরূপ রয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে। সংসারের রূপকে স্রেফ অহং মনে করাই সৌন্দর্যের স্বরূপ। এ সেই বিশুদ্ধ অস্তিত্ব, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ জীবন—হৃদয়ের চিত্রালয়ে সমস্ত ছবি, সমস্ত কল্পনা, যেখানে পৌঁছে সমস্ত উপমা এক হয়ে যায়; যেখানে বিভিন্ন রঙিন দর্শনীয় বস্তু থেকে একই রকমের প্রকাশ বেরোয়; এবং যেখানে প্রত্যেক নির্মিত বস্তু শিল্পসৃষ্টি। শিল্পী তথা দর্শক, দুজনেরই জন্য এক পথ; এবং বিদ্বান ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই তা বুঝতে পারে।

সুন্দরী যক্ষিণীর ছবি আঁকার পরই সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগ এল। সুকুমার-শিল্প জীবনের সঙ্গে যুক্ত হল। ঐ সব মূর্তিতে বিশুদ্ধ যথার্থবাদ ছিল। কদম গাছের আশেপাশে ইন্দ্র-লোকের দেবীরা বাস্তবে অযোধ্যা এবং শ্রাবস্তীর মেয়ে এবং ঐ সেই কৃষক বালা, যারা ঘাটের ধারে জল ভরতে যায়, শ্রাবণগীত গায় এবং খেতে-খামারে কাজ করে।

সুদর্শনা যক্ষিণী একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মাংসল বাহু, সুন্দর শরীর, চমৎকার গড়ন। যক্ষিণীকে জীবন্ত মনে হচ্ছিল—তার

আকৃতির মধ্যে লাস্য, সৌন্দর্য, গতি ও আবেগ ছিল। শিল্পের এই নবরূপে গতি, শক্তি, স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ ফুটে উঠেছিল। এখানে বন্ধন ছিল না; শিল্পী সহস্র বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। গৌতম এবার বুঝতে পারল—এর পর তার কি আঁকা উচিত। তার কাছে জীবনের সব রহস্যই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

একদিন গৌতম কয়েকটা নতুন ছবি নিয়ে শ্রাবস্তীতে বিমলেশ্বরের চিত্রনিকেতনে গিয়েছিল। আগে থেকেই সেখানে তার বন্ধু ও সমালোচকরা বসে ছিল। গৌতম অনেককে চিনতে পারল। এদের মধ্যে অনেকেই তার আশ্রমের কুটীরে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মাথা তু.ল তারা একবার শুধু তাকে দেখল।

সে চুপচাপ জানলার পাশে বসে সামনের বাজারে লোকেদের চলাফেরা দেখতে লাগলো।

"তুমি জান না?" বিশ্বেশ্বরের বিস্ময় চাপা থাকে না।

"কি?" গৌতম কৌতুহলী হয়ে ওঠে।

"তুমি কিছুই জান না? কোন্ দুনিয়ায় থাক?"

বাইরে করাঘাত। অখিলেশ ভেতরে এল। সে ঘন-ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল। তার গা ধুলো-মাখা। মনে হচ্ছিল, অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসেছে—

"ভাই সব!" সে খুব আস্তে বলল—"নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে এক্ষুণি এখান থেকে পালাও!"

"কেন? হয়েছে কি?" গৌতম জানতে চায়।

"মগধে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য তীরবেগে এদিকে এগিয়ে আসছে। তার শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করছে। তোমার সময় পার হয়ে গেল। যম যুদ্ধের দুন্দুভি বাজাতে বাজাতে তোমার দিকে এগিয়ে আসছে—যম যে রূপ আর অরূপ, ভাব ও অভাবের ভেদাভেদ মিটিয়ে ফেলে!" ক্লান্ত অখিলেশ মাদুরের উপরে বসে পড়ল। তার চোখ বন্ধ। কিছুক্ষণ পর সে বলল—মহারাজ শিকার থেকে ফিরে আসছিলেন। পথেই তাঁর উপর চন্দ্রগুপ্তের

সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলে মারা গেছে!"

"সবাই?" গৌতম আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, শুনেছি রাজকুমারীরা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা সাঁতার কেটে পাঞ্চাল রাজ্যের দিকে এগিয়ে গেছে কিন্তু সৈন্যরা তাদেরও পিছু নিয়েছে।

সে উঠে দাঁড়াল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ অখিলেশ?" গৌতমের গলার স্বর ধরে এল।

"আমি যুদ্ধ করতে চললাম। জানি, তুমি হয়ত আমার সঙ্গে যাবে না কেননা অহিংসার তুমি পূজারী হয়েছ।" অখিলেশ পাদুকার ধুলো ঝেড়ে শান্তভাবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

গৌতমের মনে প্রচণ্ড সংশয়। সে বিমলেশ্বরকে বলল—"আমাকে বলে দাও, এখানে তোমার যাঁরা উপস্থিত আছে সবাইতো বিদ্বান এবং শিল্পী, তোমরা আমাকে বলে দাও, এ যুদ্ধ কেন? জীবহত্যা কেন? জীবহত্যা কখন উচিত আর কখন অনুচিত?" সে কামরায় ব্যস্ত ভাবে পায়চারী করতে লাগল। "ভাই সব, রাজা নন্দের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। তবু এরা সকলে আমাকে যুদ্ধে টানতে চায় কেন? আমাকেও তো যুদ্ধ করতে গেলে হত্যা করতে হবে? আমি জীবনকে ভালবাসি—সকলের জীবনকে—মানুষের জীবনকে! আমি নিজেও বাঁচতে চাই। এখন আমি কি করি?" জানালায় মাথা ঠেকিয়ে সে চোখ বন্ধ করে দাড়িয়ে রইল।

চিত্রনিকেতন থেকে সকলে বাইরে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর গৌতম চোখ খুলল। শূন্য কামরা। সে তাদের পেছনে-পেছনে বারান্দায় বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল—"নিজের-নিজের প্রতিমা ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ভাই সব, আমার কথা শোনো সব ভেঙ্গে যাবে।"

প্রচণ্ড শব্দ। সৈন্যরা নগরে ঢুকে বাজারের দিকে এগিয়ে আসছে। হাতী আর যুদ্ধ-রথে চড়ে তারা বাজার আক্রমণ করেছে। ঢাল-তলোয়ারের ঝংকার, নারী শিশুর করুণ আর্তনাদ আর সৈন্যদের

বিজয় উল্লাসে আকাশ বাতাস কাঁপছে। গৌতমের কথা এই আওয়াজে ডুবে গেল। সে পাথরের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে লাগল। বাজার মাটিতে মিশে গেছে। তার শিল্পী বন্ধুদের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে আছে। চাণক্যের সৈন্যরা নির্দয়ভাবে এক একটি লোককে হত্যা করে চলেছে। গৌতম যেন চোখের সামনে প্রলয় দেখছে। সে কোনোরকমে নিজেকে সামলে চিত্রনিকেতন থেকে নীচে নেমে এল। মৃত বিশ্বেশ্বরের হাত থেকে তলোয়ার নিল এবং রাস্তায় নেমে এল। তার সব কিছু একটা নিষ্ঠুর স্বপ্নের মত মনে হল।

গৌতম গভীর রাত পর্যন্ত লড়তে লাগলো। শেষে আহত হয়ে পথের ধারে পড়ে রইল। তার চারিদিকে নাগরিকদের শব পড়ে আছে।

দূরে রাজপ্রাসাদ গাছের আড়ালে যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদের উপরের কলস অন্ধকারে ঝলমল করছিল। মনে হচ্ছিল কলসের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এবং কলসটি এই দৃশ্য দেখে হাসছে।

পাঁচ

সময় এগিয়ে চলেছে। ময়ূর এখন দেশের রাজচিহ্ন। দেশে একটিমাত্র রাজার একাধিপত্য। যে লেখকরা সম্রাটদের বংশাবলী সম্বন্ধে লেখেন তাঁদের লেখনী এখানে এসে থেমে গেছে…এই প্রিয়দর্শী সম্রাট, পাটলীপুত্রের সিংহাসন আলো করে বসে আছেন—তিনি শূদ্র মাতার সন্তান, রাখালরা তাঁকে লালনপালন করেছে আর চাণক্য যাঁকে তক্ষশীলায় রাজনৈতিক শিক্ষায় দীক্ষিত করেছে; এখন নতুন ইতিহাস রচনা করাবে। একটা কাল শেষ হল। নন্দবংশের কাহিনী এখন স্বপ্ন হয়ে গেল।

এটা নতুন যুগ।

চন্দ্রগুপ্ত বড়ই পরাক্রমী সম্রাট। যোগ্য শাসক। তাঁর রাজধানী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহানগরের অন্যতম। তাঁর সৈন্যবলে অন্য দেশ ভীত কেননা বিষ্ণুগুপ্ত যাঁর অন্য নাম চাণক্য ও কৌটিল্য, এবং যে মহাপদ্ম নন্দকে কূটনীতিতে পরাজিত করেছে, তাঁরই পরামর্শে রাজ্যের শাসন কাজ চলে। শাক্যমুনি বলেছিলেন, বিজয় ঘৃণাকে জন্ম দেয়, কেননা যে পরাজিত সে দুঃখ পায়। কিন্তু যারা জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে তারা সত্যিই সুখী।

প্রত্যেকটি যুদ্ধ, জয়-পরাজয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই ভাবেই এগিয়ে চলে, উন্নত থেকে উন্নততর হয়। প্রিয়দর্শী চন্দ্রগুপ্তর বিজয়ও মানুষের মনে এক নতুন অনুভূতির সঞ্চার করলো। জনসাধারণ প্রথমবার 'রাষ্ট্র' শব্দের সঙ্গে পরিচিত হল। তারা প্রথমবার বুঝল, নানা ধর্ম, বংশ ও শ্রেণীর গোষ্ঠীর নাম রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্থান ধর্মগত, জাতিগত ও শ্রেণীগত ভেদাভেদের চেয়ে অনেক উপরে। তারা এমন একটি রাষ্ট্র যারা চন্দ্রগুপ্ত প্রিয়দর্শীর নেতৃত্বে ইরাণিদের দেশের বাইরে তাড়িয়েছে। পাটলীপুত্র এত সমৃদ্ধ কোনদিন ছিল না। নতুন নতুন প্রাসাদে নগর ছেয়ে গেছে। এত জাঁকজমক কেউ কোনদিন দেখেনি। সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন ঘটছে। মগধী ভাষা নতুন রূপ নিচ্ছে। সঙ্গীত ও নাট্যকলাও উন্নতির পথে।

কাশীর একটি নাট্য সংস্থা নতুন নাটক দেখাচ্ছে। এক নাট্যকার প্রথমবার পাটলীপুত্রে এসেছে। এখানে আসার আগেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। নানা গল্প শোনা যায়। কেউ বলে সে অদ্ভুত সুন্দর প্রতিমা গড়তে পারে। নৃত্যবিদ্যা নাকি তার মুঠোর মধ্যে। সে নট, সুন্দর নৃত্য করে; সে অভিনেতা, চমৎকার অভিনয় করে; সে গায়ক, চমৎকার গান গাইতে পারে। ভরতমুনির সমস্ত শিল্প সে আত্মসাৎ করেছে। বছরের পর বছর সে অযোধ্যার গুণীজন ও গন্ধর্বদের সাহচর্যে কাটিয়েছে। সমস্ত স্বর তার করায়ত্ত, তবুও তার মনে শান্তি নেই। কোনো এক জায়গায় সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সারা

দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় যেন সে মেঘের ছায়া ধরতে বেরিয়েছে, ধরেও ধরতে পারছে না।

নাটকটির জয়-জয়কার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মহিলারা দূর দূর থেকে রথ এবং পাল্‌কীতে বসে নাটক দেখতে আসছে। রাজ কন্যা, মন্ত্রী কন্যা, ব্যাপারী কন্যা কেউ বাদ যায়নি। তাদের পরনে রঙীন শাড়ী, হাতে সোনালী বালা, কানে এবং মাথায় মুক্তাখচিত আভূষণ। অবিবাহিতা মহিলারা এই নাট্যকার অভিনেতার দর্শন চায়। তারা শুনেছে সে অত্যন্ত রূপবান এবং মহিলাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, শিল্পের ভাল-মন্দকে শিল্পীর রূপ এবং আকৃতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে।

সুসজ্জিত মঞ্চ। কাঠের কাজকরা রঙ্গভূমির পেছনের পর্দা কলস এবং ছবি দিয়ে সাজানো শ্বেত পর্দা একদিকে সরে গেল। একদিকে বাদ্যমণ্ডলী বসে। মেয়েরা বন্দনা করতে করতে মঞ্চের পাশ থেকে এগিয়ে এল। তারা শিবের স্তুতি করল। তাদের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সে নাটকের নায়িকা। তার বেণী মুক্তাখচিত। অত্যন্ত রূপবতী সে। শরীরের আভূষণ তার সোনালী কটিবন্ধে মুক্তা ঝলমল করছে।

তারপর মঞ্চে তার আবির্ভাব হল—যার জন্য দর্শকরা অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। তার গর্বিত দৃষ্টি শূন্যে—ধীর পদক্ষেপে সে এগিয়ে এল। তারপর নটীকে নির্দেশ দিল। নটী নিয়মানুসারে নাটকের সংলাপ আরম্ভ করল। তার স্বর শুনে দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল। প্রত্যেকের দৃষ্টি তার দিকে।

সংলাপ বলতে বলতে একবার সে তার বাঁ এবং ডান হাত উপরের দিকে ওঠাল।

দর্শকরা বিস্ময়ে হতবাক্। তার চেহারা এক বেদনার প্রতিচ্ছায়া। দর্শকরা দুঃখ পেল, বেদনা অনুভব করল। মহিলারা চোখ বন্ধ করলেন।

অত্যন্ত রূপবান এই অভিনেতার দুটো হাতের সবকটা আঙ্গুলই কাটা।

গৌতম নীলাম্বরের সামনে একটি নগর। নগরে গুণমুগ্ধ দর্শক।

গৌতমের লেখা নাটক এই নগরের প্রশংসিত হয়েছে। তার দর্শকরা তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু গৌতমের জীবনের নাটক কেউ দেখেনি। মঞ্চের শেষ পর্দারও পেছনে এই নাটক অভিনীত হচ্ছে।

পাটলীপুত্রের সভ্য ও প্রতিষ্ঠিত নাগরিক তার নাটকের সংলাপ নিয়ে মেতে উঠেছে। তারা কেউ জানেনা দুনিয়ার কোথায় কোথায় ভ্রমণ করে বেরিয়েছে, জীবনের যা কিছু প্রাপ্য তার পরিচয় পেয়েছে, জীবনের নানা দিক নানা ভাবে প্রয়োগ করে দেখেছে। এসব খবর এরা কেউ জানেনা। এখন কিছুই নেই। ভেবেছিল জীবন মানে শুধু শূন্য অনুভূতি কিংবা শুধু প্রকাশ বা শুধু অন্ধকার। কিন্তু এখানে তো 'শুধু'র অস্তিত্ব নেই; সংসারের বাস্তব চাহিদা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেনি। দুনিয়া প্রতিপদে তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভেংচি কাটছে।

শ্রাবস্তীর বাজারে সে সারাদিন যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করতে করতে আহত হয়ে, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পথের ধারে পড়ে গেছে। অনেক সময় কেটে যাবার পর যখন সে নিজের জ্ঞান ফিরে পেল—দেখল রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় সে তার রক্তাক্ত হাত দেখল। শুয়ে শুয়ে অতি কষ্টে সে তার রক্তাক্ত হাত চোখের সামনে তুলে ধরল।

সেই মুহূর্তে সে এক নিষ্ঠুর সত্য আবিষ্কার করল। হাতের আঙ্গুল যার ধর্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা—যে কোনো সময়ে মানুষই সেই আঙ্গুলগুলোকে নির্মমভাবে নষ্ট করে দিতে পারে। কোনো শান্ত পুষ্পকুঞ্জে বসেও সে এই সত্যকে আজ অস্বীকার করতে পারে না। শিল্পীর কাছে আঙ্গুলের অসীম মহত্ব। আঙ্গুল নৃত্যের সময় বিভিন্ন মুদ্রা প্রদর্শনে জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে, ইমারৎ বানায়, খেতে-খামারে ফসল তোলে, বাঁশি বাজায়, শিশুকে আদর করে ঘুম পাড়ায়। এটা একটা দিকের সত্য। অপর দিকে এই আঙ্গুলই তীর ছোঁড়ে, তরোয়াল চালায়, মানুষকে গলা টিপে মেরে ফেলে।

একটু শক্তি সঞ্চয় করে সে উঠল। শব টপকে, কোনোক্রমে নিজের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

বাড়ী জনশূন্য। কুড়ি বছর পর সে বাড়ীতে পা দিল। কাউকে সে সেখানে পেল না। তার পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগেই তার মা-বাবা যুদ্ধের বিভীষিকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। ক্ষত-বিক্ষত শরীর সুস্থ হবার পর সে শ্রাবস্তী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ দেশে শান্তি ফিরে এল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। গৌতম ঘুরতে ঘুরতে কাশী এল। সে সুযোগ্য, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ। তার একমাত্র পুঁজী জ্ঞান। তবুও তার কষ্ট হল না। ব্রহ্মচারী এবং ছাত্র ছিল বলে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই অনাহারে থাকার অভ্যেস আছে। ভবঘুরের জীবন তার মন্দ লাগে না কিন্তু এখন বিদ্বানদের সাহচর্য এবং বাদ-বিবাদ তার ভাল লাগে না।

একদিন কাশীর এক নাট্যশালায় রঙ্গালয়ের নায়িকার সঙ্গে তার দেখা হল। সে গৌতমকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেল। তাকে সেই নায়িকা নাট্যশালায় নিয়ে এল।

গৌতমের কাটা আঙ্গুল। সে ছবি আঁকতে পারে না। প্রতিমা গড়তে পারে না। অভিনয় ছাড়া আর কোনো পথ নেই তার সামনে। নিজেকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবার জন্য সে অভিনয়ের পথ বেছে নিল। ছাত্র-জীবনে সে নাটক লিখেছে। ছিল একদিন দার্শনিক, বিদ্বান, শিল্পী, এবার হল অভিনেতা গৌতম নীলাম্বর।

বহুরূপ আর একটি সত্য।

বিরহ নাটকের মুখ্য বিষয়। গৌতম এই বিষয়টাই বেছে নিল। বিরহ ছাড়া আর কি-ই বা আছে তার জীবনে?

অম্বিকা রঙ্গালয়ের রূপসী অভিনেত্রী। অনেক বিদ্বান, ধনী এবং শিল্পীর মুখে মুখে অম্বিকার নাম ফিরত। কিন্তু সেই রূপসী অভিনেত্রী শেষ পর্যন্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভাল বাসল—যার হাতের সব কটা আঙ্গুল কাটা।

গৌতমের চোখের সামনে আর একটি সত্য উদ্ভাসিত হল—তুমি যাকে ভালবাস, সে তোমার কথাও ভাবে না, আর তোমার জন্য যে

প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে তার প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ নেই। গৌতমের কাছে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা যদিও হাজার হাজার মানুষ জীবনে প্রতি মুহূর্তে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে।

অম্বিকার সঙ্গে সে চারিদিকে ঘুরে বেড়ালো। মৌর্যরাজ্য সমৃদ্ধির শিখরে। ললিতকলা অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়েছে। এখন গৌতম ধনী যুবকদের মতই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। মদ্যপান করে, প্রতিদিন রূপসীরা তাকে সঙ্গ দেয়, তাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটায় আবার তাদের ত্যাগ করে। অম্বিকা-তার পূজারিণী এ সমস্ত দেখে-শুনেও তাকে ভালবাসে, তাকে আরাধ্য দেবতা মনে করে। তার প্রেমের পরিবর্তে গৌতম তার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, তাকে দুঃখ দিয়ে মনে-মনে সে প্রীত হয়।

চম্পকের খোঁজে দূরদেশে যাত্রা করল কিন্তু চম্পকের দেখা পেল না। শেষ পর্যন্ত সে চম্পকের অনুসন্ধান ত্যাগ করে অম্বিকার প্রেমের কাছে হার মানলো।

আজ সে পাটলীপুত্রে। অম্বিকার সঙ্গে অভিনয় করে, দর্শক সশ্রদ্ধে তাকে দেখে। দর্শক বহুরূপের পূজারী, তাই তারা আসল গৌতম নীলম্বরকে কখনো দেখতে পাবে না···।

ছয়

মহিলারা দুঃখে অভিভূত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন। মেয়েরা বিস্ময়ে হতবাক্‌।

মহিলাদের মধ্যে চম্পকও ছিল। সে এক বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিল।

চম্পক চোখ তুলল। সামনে গৌতম নীলাম্বর। চম্পক কেঁপে উঠল। তার চোখে অশ্রুবিন্দু। দৃষ্টি ঝাপসা ম্লান দীপশিখার মত গৌতমের চেহারা তার চোখের সামনে যেন কাঁপছে।

গৌতম অভিনয় করতে করতে দৃপ্ত কণ্ঠে নিজের সংলাপ বলে সামনের দিকে তাকাল। সে চম্পককে দেখতে পেল। কিছুক্ষণের জন্য সে সংলাপ ভুলে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

চম্পক তার সামনে। সে কত প্রতীক্ষাই তার জন্য করেছে। অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা সহ্য করে তাকে সে দিনের পর দিন খুঁজেছে কিন্তু আজ সামনে বসে থাকা চম্পকের সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। নিজের ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে চম্পক রঙ্গমঞ্চে বান্ধবীদের সঙ্গে বসে আছে।

চম্পক পবিত্র ছিল। এখন পবিত্রতর মা।

গৌতম আর একটা সত্যকে যেন আবিষ্কার করল। যোগাযোগ, দুর্ঘটনা আর সময়ের নির্মম খেলা—সত্যেরই আর এক রূপ।

সে আবার অভিনয়ে ডুবে গেল।

নিঃশব্দে, চুপচাপ সে তার সমস্ত কান্নাকে বুকের ভেতর ঠেলে দিল। একজন লোক সংসার ত্যাগ করল, তবুও তার কথা সে ভুলতে পারেনি। সে হরিশংকর। একজন লোক তার জন্য ত্যাগের জীবন ছেড়ে সংসারে আশ্রয় নিল, তবুও তাকে বৈরাগী হয়ে থাকতে হল। সে গৌতম নীলাম্বর। সে শুধু সারা জীবন দুঃখই পেয়ে গেল। সবই মায়ার খেলা। নিজের দুঃখও ত্যাগ করতে পারল না, জীবনকে উপভোগও করতে পারল না।

সে মেয়ে তাই তার ভাগ্যে যা লেখা তাকেই সে স্বীকার করে নিল। মহারাজার মৃত্যুর পর অন্য রাজকুমারীদের সঙ্গে তাকেও বন্দী করে পাটলীপুত্রে নিয়ে আসা হল। অযোধ্যার রাজ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতীরা বিজয়ীদের বিয়ে করল। চাণক্য মহারাজের এক বয়স্ক উত্তরাধিকারীর সঙ্গে তারও বিয়ে হল। ব্রাহ্মণ অধিকারীর বয়স ষাট বছর, মোটাসোটা ও অত্যন্ত কৃপণ। চাকরি করতো রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে।

লোকটি তার স্বামী। তার সেবা করা চম্পকের ধর্ম। পাটলীপুত্রের হাজার হাজার গৃহ-বধূর মত সেও ঘর-সংসার করত এতে আর বিশেষ কথা কী? এখন কোলে তার ছেলে। নিজের বান্ধবীর সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছিল। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে নাটকের প্রথম দৃশ্য শেষ হল। পর্দা নামল। চম্পক নিজের দাসীকে কানে কানে কি যেন বলল। দাসী দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

প্রথম অঙ্কের শেষে গৌতম প্রসাধন গৃহে গেল। "একটি দাসী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

অম্বিকা আয়নার সামনে গলার মালা খুলে রেখে মুখটা ঘুরিয়ে বললো।

"কে সে?" গৌতম অনুত্তেজিত স্বরে বললো। তার স্বরে কোনোরকম রুক্ষতা নেই। তার এই হঠাৎ পরিবর্তনে অম্বিকা অবাক। গৌতমকে ভীষণ শান্ত মনে হচ্ছে। "জানিনা" অম্বিকার উত্তর—"তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস।" অম্বিকা কাপড় পরে অন্য নর্তকীদের কাছে চলে গেল।

গৌতম প্রসাধন গৃহের সিঁড়ির উপরে এসে দাঁড়ালো। নীচে একজন শ্যামলী দাসী দাঁড়িয়ে। সে হাতজোড় করে বলল—"আমার রাণী তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে। সে জানতে চেয়েছে, যাবার সময় তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পার কিনা?"

সিঁড়ির আর এক ধাপ নীচে এসে সে বলল—"না। রাণীকে বোলো, যে জেগে থাকে, সে একদিন ঘুমিয়ে পড়ে; আর যে ঘুমিয়ে থাকে সে একদিন জেগে ওঠে। যারা সব সময় জেগে থাকে তাদের দিকে তাকাও। তাকে বোলো, আমিও জেগে আছি। আমার পথে এখন বাধা হয়ে কেউ আসতে পারবে না। আর তাকে একথাও বোলো—সে কি ভুলে গেছে যে কোনো পতিব্রতা স্ত্রীর কাছে পরপুরুষ

ছায়ার সমান ?…তুমি যেতে পার।"

সে নাট্যশালার দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে আবার ফিরে এল—"আমার রাণী বলেছে, তোমার কথা ঠিক। এতদিন পরে যদি তুমি জেগে থাক, তাও ভাল। রাণী বলেছেন, পতিব্রতার অর্থ তুমি কি বোঝ ? যাক্ তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবার অধিকার বা ইচ্ছে তার নেই। এবার তুমিও যেতে পার।"

সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দর্শকদের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

নাটক শেষ হবার পর দর্শকদের দিকে কোনোরকম দৃষ্টি না দিয়ে সোজা প্রসাধন গৃহে চলে গেল। সাজ পোষাক ছেড়ে একটি শ্বেত চাদর কাঁধে ফেলে গৌতম খালি পায়ে নাট্যশালার বাইরে বেরিয়ে এল। অতি কষ্টে জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে নগরের প্রবেশ দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল। কারাবাস থেকে পালানো কোনো কয়েদী পাহারাদারের ভয়ে ঠিক যেভাবে দৌড়ায়, গৌতম সেই ভাবে এগিয়ে চলল।

চারিদিকে লোক নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। চিকিৎসালয়ে রোগী মৃত্যু বা সুস্থ হবার আশা নিয়ে শুয়ে আছে। বাজারে রূপো বা তামার পয়সা ঝনঝন করছে। অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হচ্ছে, বন্দরে জাহাজ। দূরে দেখা যাচ্ছে রাজভবনের গম্বুজ।

এই সময় সম্রাট নিজের বৈঠকে চাণক্য মহারাজের সঙ্গে চতুর খেলায় ব্যস্ত, একথা ভেবে মুচকি হাসলো।

একটি বেশ্যা তার পাশ দিয়ে তাকে দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। হয়ত এও অন্যান্য চতুরা বেশ্যাদের মত গুপ্তচর বিভাগে চাকরি করে। প্রশ্নটা এই কেউ মহারাজকে যেন জিগ্যেস করে—কে কার ওপর নজর রাখবে ? সে আবার মুচকি হাসলো।

চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে এল। প্রাসাদ দেওয়ালের মিনারে পাহারাদার সাবধান বাক্য উচ্চারণ করছে। একটি প্রবেশ দ্বারে এসে সে থমকে দাঁড়াল। চৌষট্টিটি ফটক। কোন দরজা তাকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে ? দ্বাররক্ষীরা তাকে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ মনে করে দরজা খুলে দিল। সে রাজপথে নেমে এল। এই

পথ সোজা প্রয়াগের দিকে চলে গেছে।

সে শোন নদী পার হয়ে কয়েকদিন হেঁটে চলল। পথে গভীর জঙ্গল, নদী, নালা। নদীর ধারে সাধুরা তপস্যায় মগ্ন।

বাণপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। হয়ত আমিও সেই পথে চলেছি। এই সময়ে মানুষের মনে জীবনধারণের ইচ্ছাও যেমন থাকে না, মৃত্যু বাসনাও আসে না।—সে এগিয়ে চলল। পথে নগর, সরকারী খেত-খামার, আশ্রম, ময়ূরপালকদের গ্রাম…! তার পথের শেষ কোথায়?

ভয় পাবার কি আছে। ধরণী তার সাথে-সাথে চলেছে। মৃত্তিকা তার মা। মন বলছে—ধরণী সদা-সর্বদা তোর সঙ্গে রয়েছে।

পায়ের তলায় সবুজ ঘাস, নরম মাটি, শীতল পাথর। আকাশের দিকে দুই বাহু তুলে সে বাতাস স্পর্শ করল আর মৃদু স্বরে বলে চলল—"মা, ধরণী তোমার বুকে হিমাচ্ছাদিত পাহাড়, বন-উপবন হাসছে। আমি তোমারই মাটি স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি এখনো অপরাজিত। আমি এখনও কোন আঘাত পাইনি। আমি এখনো পূর্ণ। কেউ আমাকে শেষ করতে পারেনি।"

"মা ধরণী, তোমার ভেতরে কত রহস্য লুকিয়ে আছে! কত মানুষকেই তো তুমি পথ দেখিয়েছ! আমাকে কোথাও আশ্রয় দাও!"

পথে পথে আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। নানা ফুল তার পথে ছড়িয়ে—গাছপালা দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলেছে। পাখিরা ওকে দেখে যেন গান গেয়ে চলেছে। শ্রাবণের জলবিন্দু পদ্ম ফুলের উপর টপ টপ করে পড়ছে, যেন জলতরঙ্গের সুর ছড়িয়ে পড়ছে।

একটা উঁচু জায়গায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অশ্রু-সজল নয়নে এই দৃশ্য দেখল।

আকাশ থেকে এক ফোঁটা জল তার চোখের পাতায় পড়ল—যেন ঝিনুকে স্বাতী বিন্দু। আকাশে কালো মেঘের গর্জন। আনন্দে বিভোর। অন্তরে আনন্দের তুফান, মস্তিষ্কে ঝর্ণার সুরনিনাদ। ইন্দ্র তাকে সাহায্য করতেই দাঁড়িয়ে আছেন। রুদ্র তার সঙ্গেই আছেন। একটি গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ

করলো। বর্ষার ধারা তার সুন্দর উদাস মুখে ঝরণার মত ঝরে চলল।

সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়ছে। ভোরের দিকে বৃষ্টি থামল, আলো ছড়িয়ে পড়ল। নদীর ধারে ব্রাহ্মণ উষার আরাধনা করছে। ঘরে-ঘরে শঙ্খ বাজছে। "দেবতার জননি! তোমার প্রকাশ অম্লান থাকুক আর আমাদের রাষ্ট্র উন্নত থেকে উন্নততর হোক।"

ব্রাহ্মণদের স্বর নদীর জলে ছড়িয়ে পড়ছে। সে মন্দিরের সামনের পথ দিয়ে আবার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

সামনে অযোধ্যা।

ভেজা মাটিতে সে হাঁটু গেড়ে বসলো—দেখল, চারিদিকে কেউ কোথাও নেই। সে নিতান্ত একা। সংসারের আদি-অনন্ত মানুষের মত, ক্লান্ত পরাজিত তবুও প্রসন্নচিত্ত, আশাবাদী মানুষ—প্রশান্তি ঠিক যেন ঈশ্বরের মত। এবং যে স্বয়ং ঈশ্বর সামনে অযোধ্যা নগরী বর্ষায় ভিজে ঝলমল করছে। মনে হচ্ছে নগরটি সোনা দিয়ে আগাগোড়া মোড়া আর তার মধ্যে থেকে সোনালী আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে।

সে দাঁড়াল। নিজের ঈশ্বরকে দৃপ্ত কণ্ঠে ডাকল। তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, গর্ব ও অভিমান। সে বলল—ঈশ্বর! তুমি অগ্নি, তুমি সূর্য, তুমি বায়ু, তুমি চন্দ্র, তুমি নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি প্রজাপতি, তুমি জল।

"তুমি নারী, তুমি পুরুষ, তুমি যুবক, তুমি যুবতী! তুমি সেই বৃদ্ধ যে নিজের লাঠি নিয়ে কোনোক্রমে এগিয়ে চলে। দিশায় মুখ করে তুমি জন্ম নিচ্ছ। তুমি গভীর নীল মাছি, তুমি লাল চক্ষু টিয়াপাখি, তুমি মেঘ, তুমিই ঋতু, তুমিই সমুদ্র।"

"দুটি পাখি, দুই বন্ধু এক ডালে বসে আছে। একজন ফল খাচ্ছে, অন্যজন তাকে দেখছে। সেই গাছের ডালে একটা মানুষ বসে আছে—উদাস কিন্তু দুঃখী নয়;" কেননা সে অপর জীবকে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট দেখছে। যে অপরকে সন্তুষ্ট দেখে তার নিজের দুঃখ শেষ হয়ে যায়। সে ঋগ্‌বেদের এই অবিনাশী অস্তিত্ব জানে না। কিন্তু যার ভেতরে দেবতার বাস ঋগ্‌বেদ দ্বারা সে কি ভাবে উপকৃত হবে? তারা, যারা এসব জানে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

"তুমি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, তোমার অনেক রূপ, তুমি শিব অর্থাৎ আনন্দ।"

"এবং যখন জ্যোতির প্রসার হয় তখন না দিনশেষ, না রাত্রি, না অস্তিত্ব, না অনস্তিত্ব। শেষে থাকে একমাত্র শিব। সাবিত্রীর সেই অনন্ত জ্যোতি থেকে বুদ্ধির জন্ম।"

"তোমার সৌন্দর্য অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। তোমার ঐশ্বর্য ও মাহাত্ম্যের তুলনা নেই। তুমি আমার অন্তরে।"

"তুমি অজন্মা! তোমার কাছে আজ কম্পিত বক্ষে কেউ আসছে, বলছে হে রুদ্র, আমাকে রক্ষা কর।"

"সে বিশ্বের নিরালা পাখি। সূর্যের মতন, যা সমুদ্রে ডুবে গেছে। মানুষ এসব জানলে মৃত্যুজিৎ হয়।"

সে চোখ খুলল। তার শরীর কাঁপছিল। তার পায়ের নীচে সরযূ নদী একাকী বয়ে যাচ্ছে। সে চোখ তুলল, দৃষ্টি প্রসারিত করল, মাথার উপর হাতের ছায়া ফেলে দেখতে চাইল। সে কিছুই দেখতে পেল না। নদীর ওই পারে গেরুয়া বস্ত্রধারী কিছু লোক ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘাটের ধারে বসা একটি মেয়েকে সে জিজ্ঞেস করল (মেয়েটি বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরেছিল, তার মাথায় চাঁপা ফুল)—"নদীর ওই পারে কারা থাকে তুমি জান?" "কয়েকজন ভিক্ষু" মেয়েটির বেপরোয়া উত্তর। সে নদীর জলে পা ধুতে লাগল।

"আচ্ছা, আমি তাদের কাছে যেতে পারি?"

"এই তুফানে নদী কি করে পার হবে? তাছাড়া নৌকোও নেই।"

"নদী তো পার হবার জন্যই! চিন্তা কোরনা।"

চমৎকার পরিবেশ। দূরে কোথাও ময়ূর ডাকছে। নদীর ধারে পাপিয়ার কলরব, আকাশ বাতাস স্বপ্নের মত মোহময়। ভারী চমৎকার দৃশ্য! গাছ থেকে কয়েক গুচ্ছ ফুল তার পায়ের কাছে পড়ল। সে ফুল তুলে নদীর জলে ভাসিয়া দিল। তারপর নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সরযূ নদীর বুকে সাঁতার কাটতে কাটতে গৌতম এগিয়ে চলল।

হঠাৎ এক বিরাট তরঙ্গের দাপটে বয়ে সে তীরের খুব কাছে চলে এল। তীর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। হঠাৎ নদীর বুকে তরঙ্গ উঠতে শুরু করল। গৌতম প্রাণপণে শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে, একটার পর একটা তরঙ্গ পার হয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু জলের শক্তি তার চেয়ে বেশী। সে হাঁপিয়ে উঠল। তীরের কাছাকাছি এসে সে জলের মধ্যে এক ভগ্ন মন্দিরের পাথর আঁকড়ে ধরল। খুবই ক্লান্তি অনুভব করছে। ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে-নিতে সে চোখ বন্ধ করল। কালের প্রবাহ বয়ে চলেছে। চারিদিকে জলরাশি। কিন্তু পাথর আঁকড়ে ধরে সে একটু নিশ্চিন্ত হল, কেননা এই পাথরের সঙ্গে অতীত সম্পর্ক যুক্ত, ভবিষ্যতেও যুক্ত হবে। তার হাতে একটাও আঙুল নেই। সে কয়েক মুহূর্তের বেশী পাথর ধরে রাখতে পারল না।

সরযূ নদীর জল গৌতম নীলাম্বরের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। অন্যদিকে আবুল মনসুর কমালউদ্দীন নদীর ধারে পৌঁছে নিজের ঘোড়া বটগাছের ডালে বেঁধে চারিদিকে দেখল। সামনে নদী বয়ে যাচ্ছে। দূরে ছোট-ছোট কুটীর। শিবালয় থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। বট গাছের নীচে কোনো পীরের মজার। সে নদীর জলে নিজের হাত ডোবালো। জলে পাথরের নীচে সে নিজের চেহারা দেখতে পেল। সে ভীষণ অবাক হল।…এখানে সত্যি ও কি করছে ?

এখনো চম্পা আসেনি। সে দ্বিতীয়বার নদী দেখল। কদম গাছের ডালে একরাশ ফুল ফুটেছে। কয়েকটা ফুল টপটপ করে তার পাগড়ীর ওপর পড়ল। পাগড়ী খুলে হাতে ফুল নিল। তারপর নিজের তলোয়ারের উপর একটা হাত রাখল। ফুলের মাঝে তলোয়ার অত্যন্ত অর্থহীন মনে হল। সে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

চম্পা সাঁতার কাটতে কাটতে ঘাটের ধারে এল।

“আমি ভেবেছিলাম তুমি আবার কোথায় মারামারি করতে গেছ !” চম্পা হাসতে হাসতে বলল।

"আমি সিপাই নই—কতবার বলেছি সুলতানের কুতুবখানা দেখা-শোনা করি।"

"তাহলে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখ কেন? আমি অস্ত্র সহ্য করতে পারি না।"

"চম্পারাণী, অস্ত্র পুরুষ মানুষের ভূষণ। অসি আর পাগড়ী ছাড়া আমাদের পোষাক অসম্পূর্ণ। তুমি মালবা ও বুন্দেলখণ্ডের রাজপুতদের দেখনি! দেখেছ? আমার এক বন্ধু, উদয় সিং রাঠোর—কন্নোজী রাজপুত, দারুণ দেখতে! খুব ভাল সৈন্য! জানিনা আজকাল কোথায়। শুনেছিলাম গোয়ালিয়রের কীরত সিং-এর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। সে হয়ত মালবায় কোথাও মারামারি করছে।" কামালউদ্দীনকে বন্ধুর স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখল।

"শোনো!" মেয়েটি নিজের ঘন কালো চুলের জল নিঙড়ে খোঁপা বানাতে-বানাতে বলল—"যুদ্ধের কথা আমাকে কখনো বোল না। যখন তোমাকে দেখি আর তোমার এই তলোয়ার দেখি, আমার ভীষণ ভয় করে।"

"ভয়? সে আবার কি জিনিস?"

"তোমাকে বোঝানো বেকার!" সে আবার ঘাটের সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ল। কামালউদ্দীন গাছের ছায়া দেখছে।

"আচ্ছা চম্পাবতী! তোমাকে খোদার হাতে ছেড়ে দিলাম।" সে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোলো।

পাশ দিয়ে মুসলমান ফকীরের একটি দল চলে গেল। একজন তরুণ ফকীর, চম্পা এবং কামালকে দেখল—তারপর মাথা নীচু করে এগিয়ে গেল।

"এরা সবাই ভাঁড়।" কামাল বলল।

"ভাঁড় নয়, এরা বড় প্রেমী মানুষ। এদেরকে নিয়ে ইয়ার্কি কোরো না।" চম্পা রেগে বলল—"একদিন এরাই তোমাকে সাহায্য করবে।"

"তুমি কাশী গিয়ে কবীরের শিষ্যা হচ্ছ না কেন?"

"তোমাকেও আমি কাশী নিয়ে যাব কিন্তু তার আগে তোমার ঐ

তলোয়ার ত্যাগ করতে হবে।"

"আচ্ছা, খোদা হাফিজ!" কামাল বলল। তারপর সে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

"অন্য পারে ভাঙ্গা পাথরের টুকরো জলে ডুবে আছে। ওটা কি?" কামালের প্রশ্ন।

"ওইটা? আরে!···ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। অনেক হাজার বছর পুরোনো।"

আর ওই দিকে, ছোট ছোট কুটীর—ওখানে কারা থাকে?"

"সুফী সম্প্রদায়ের লোকেরা থাকে···তুমি এখন কোথায় চললে?" চম্পার প্রশ্ন।

"বহরাইচ। জানিনা কত দিন লাগবে ওখানে পৌঁছতে।"

"বর্ষা শুরু হবে। নিজের দিকে লক্ষ্য রেখো।"

"হ্যাঁ লক্ষ্য রাখব। খোদা হাফিজ, পাগল মেয়ে।"

সে তাকে পাগলী বলত। এই সম্বোধনের আড়ালে তার প্রতি কামালের গভীর ভালবাসা লুকোনো। চম্পা হাসল—মিষ্টি হাসি। তার চোখে জল। কামালউদ্দীন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছে। পথের ধুলো কিছুক্ষণ পর তাকে আড়াল করল।

সাত

বহরাইচের জনসংখ্যা কম। হলুদ রং-এর কাঁচা ছোট-ছোট বাড়ী চারিদিকে ছড়ানো। পথে ধুলো। তার ওপর দিয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গরুর গাড়ী চলছে। চারিদিকে একটা উদাস-উদাস ভাব। শোনা যায়, অতীতে এখানে চমৎকার একটি নগর ছিল। শ্রাবস্তী সেই নগরের নাম। সোমবংশী রাজা সুলহদেবের অধীনে এই নগরকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হত। সোমবংশী রাজা বড়ই তেজস্বী ও পরাক্রমী। জ্যোতিষীরা সুলহদেবকে

বলেছিল যে এমন এক সময় আসবে যখন উত্তর দিক থেকে লম্বা-চওড়া, ভীমকায় তুর্কীরা এসে তোমাদের শেষ করবে। তারপর একদিন মোহম্মদ গজনীর এক সেনাপতি মসউদ গাজী ঝড়ের মত এদিকে এগিয়ে এল। সুলহদেব প্রাণ হারালেন। দিল্লীতে কুতুবুদ্দীন এবক এল। কোশল, মগধ আর বাংলার মূর্তি-পূজারী সমস্ত রাজা তার হাতে প্রাণ হারালেন।

কিন্তু গত দু'হাজার বছরে যে ভাবে শাক্যমুনি বিষ্ণু ভগবানের নবম অবতার বনে গিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবে গত দুই শতকে মূর্তি-ভঞ্জক সেনাপতি মাসুদ গাজী, বালে মিয়াঁ রূপে, কোশলবাসীর জন্য দেবতা বনেছিলেন। আবুল মনসুর কামালউদ্দীন প্রথমবার বহরাইচ এসেছিল। মসউদের সমাধির কাছে ঘোড়া বেঁধে, একটি গাছের ছায়ায় সে বসে রইল। পথ দিয়ে হিন্দু মেয়েদের একদল এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে পেতলের থালা। তারা সমাধির দিকে এগিয়ে আসছে।

নালন্দা, বিক্রমশিলা, উজ্জয়িনী এবং অমরাবতীর অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। শ্রাবস্তীর প্রাচীন আশ্রম এখন জনশূন্য এবং তালপত্রে অদ্ভুত ভাষায় লেখা পুঁথির কোনো পাঠক নেই।

কিন্তু কাশ্মীরের সুলতান জৈনউল আবদীন এবং গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মত জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কীও মূর্তি ভাঙ্গা বন্ধ করে এইসব প্রাচীন পুঁথি-পত্রে মনোযোগ দিলেন।

সুলতান হুসেন শর্কী যখনই সময় পেতেন, নিজের তানপুরা নিয়ে নানা রাগ-রাগিণীর মধ্যে ডুবে থাকতেন। তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠোদ্ধার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সময় অবশ্য তিনি বেশী পেতেন না, কেননা প্রায় সব সময়ই তাঁকে দিল্লীর বহলোল লোধী আর সুলতান সেকেন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত। কিছুদিন আগে অযোধ্যার কয়েকজন পণ্ডিত তাকে বলেছিল যে বহরাইচের কোনো মঠে দেড়-দু'হাজার বছর পুরোনো তাম্রপত্র রাখা আছে। নিজের পুস্তকালয়ের নিরীক্ষক আবুল মনসুর কামালউদ্দীনকে

অযোধ্যার পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন।

কামালউদ্দীন কিছুদিনের জন্য অযোধ্যা গেল। অযোধ্যায় তার সঙ্গে চম্পাবতীর দেখা হল। চম্পাবতী কোনো এক পণ্ডিতের বোন।

নিরস দর্শনশাস্ত্র ছেড়ে সুলতানের কথামত কামাল তাম্রপত্রের সন্ধানে পণ্ডিতদের কাছে গেল ঠিকই কিন্তু তখন পণ্ডিতগণ কবীর ও কবীরের "ভক্তি" নিয়ে ব্যস্ত। কামাল, কবীর বা সুফী ইত্যাদির ধার ধারত না। তার এসব ভাল লাগে না। সুলতান ওকে ইতিহাস লেখক হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। তার সময় খুব ভাল-ভাবে কেটে যাচ্ছিল। এখন আবার সুলতানের আদেশ—পণ্ডিতদের সাহায্যে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং অর্ধমগধী ভাষায় লেখা বিচিত্র সব পুস্তক সে যেন ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে।

প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধানে সে সব কটা মঠে গেল। শ্রাবস্তীর ভগ্নাবশেষে ঘুরে বেড়ালো। একদিন এই ভগ্নাবশেষে সে বিরাট বিরাট পাথরের টুকরো, অট্টালিকার মত প্রশস্ত জায়গা দেখল। এর চারিপাশে গলি। কোনোদিন এই জায়গায় হয়ত বিরাট একটা বাজার ছিল এবং বাজারের পাশে উচ্চ প্রাসাদ ছিল হয়ত। ভগ্ন প্রাসাদের ভেতরে সে ঢুকলো। কামাল ভাবলো, কে জানে কার প্রাসাদ ছিল এটা! মঠে গিয়ে একজন ব্রাহ্মণকে সে প্রশ্ন করল—"অত অট্টালিকার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখে এলাম, সেটা কার প্রাসাদ ছিল?"

কামালকে সে রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল। একজন বিদেশী পণ্ডিত যেন অর্থহীন এ প্রশ্ন করছে। তারপর তার উত্তর—"এখানে অসংখ্য চক্রবর্তী নরেশ এসেছে আর চলে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক প্রিয়দর্শী, সমুদ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের আগে এখানে মহান শিল্পী, ভাস্কর আর লেখকরা থাকত—তাদের নামও আমি জানিনা। নাম মুছে যায়, মানুষ তার কীর্তির মধ্যে বেঁচে থাকে।"

"আশ্চর্য!"—কামাল মনে মনে বলল—"এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস লেখা অসম্ভব। তাম্রপত্রে প্রাচীন লেখকদের নামও নেই

যাঁদের লেখা অনুবাদ করবার জন্যই সে এখানে এসেছে। সে ঘুরে-ফিরে সেই ভগ্নাবশেষে ফিরে গেল আর একটা ভাঙা পাথরের থামের ওপর বসে ভাবতে লাগল, এরপর তার কি করণীয়।

হঠাৎ বাগদাদ আর নেশাপুরের কথা তার ভীষণভাবে মনে পড়ল।

কামাল এই দেশে নতুন এসেছে। জৌনপুরে মাত্র কয়েক বছর ধরে সে আছে। বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাগদাদের নিজামিয়া পাঠশালায় ইব্‌নেসীনা আল্‌ফারাবী আর ইরানের ফকরুদ্দীন রাজী, স্পেনের ইব্‌নেরুশ্দ আর ইবনুল আরবী'র বিস্তৃত জগতের কথা পড়ে ফেলেছে। ইব্‌নে-খুল্‌দুনকে সে নিজের গুরু মনে করত। সে ভাবছিল আরব রাষ্ট্রের ইতিহাস লিখবে। ইব্‌নে খুল্‌দুনের কিছু সমর্থকের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে সে উত্তর আফ্রিকায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কাহিরা থেকে সে যখন খবর পেল, তার পিতা দেহত্যাগ করেছে, তখন সে বাগদাদ ফিরে এল এবং সেখান থেকে ইরাণ চলে গেল। নেশাপুরে এক সতীর্থ তাকে বলল, আজকাল যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিদ্বানও হিন্দের দিকে যাত্রা করছে। কামাল নিজের প্রিয় গ্রন্থগুলো সঙ্গে নিল এবং মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর আর লাহোর হয়ে তুগলকাবাদ পৌঁছল।

এই সময় পৃথিবী বড়ই অশান্ত। কামালের মনে আছে, সাধারণ মানুষ কষ্ট পায়নি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন যুগই আসেনি। গত শতকে তাতারীদের আক্রমণ অনেক দেশকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। আরব, ইরাণ, স্পেন আর উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা মিলে যে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জলিত করেছিল, গোবী মরুস্থলের বুক থেকে উঠে আসা নির্মম ঝড় তা নিভিয়ে দিয়েছে। মানুষ অশান্ত, দুঃখী ঠিকই কিন্তু এই মারামারি, অরাজকতা, যুদ্ধ ও লুটপাটের মধ্যেও জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলেছে। সুফিদের গ্রন্থালয়ে ও আলিমদের পাঠশালায় গ্রন্থ লেখা হয়েছে, শিক্ষার আদান প্রদান করা হয়েছে। মনুষত্বের প্রদীপ কখনো নেভেনি।

কমলীবালা ফকীররা এই দেশে আসছে। এরা বাংলা, বিহার অযোধ্যা, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে

পড়েছে।…শর্কীরাজ্য ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। জৌনপুরকে ভারতের 'শিরাজ' বলা হয়।

আবুল মনসুর কামালউদ্দীন দিল্লীতে কয়েকদিন কাটিয়ে জৌনপুরে পৌঁছল।

তার সামনে এক নতুন ও বিচিত্র পৃথিবী। ভারত অদ্ভুত সুন্দর দেশ।

কিন্তু ভারত তার দেশ নয়।

নিজের দেশের কথা ভাবতে ভাবতে তার মন উদাস হয়ে যায়। ভগ্নাবশেষের এক থামে মাথা ঠেকিয়ে সে চোখ বন্ধ করল। এখান থেকে আমি কেন ফিরে যাচ্ছি না?

সে স্থির করল জৌনপুর ফিরে গিয়ে সুলতানের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে দামস্ক ফিরে যাবে। দামস্ক? দামস্ক গিয়ে কি কারাবাস? নেশাপুরে তার কে আছে? বাগদাদের সঙ্গে তার আর কি সম্পর্ক? এ সব ভেবে সে আরও উদাস হয়ে যায়। এবং কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত লোকের সে সংস্পর্শে এসেছে? একটি চোখ খুলে সে সেই কৃষককে দেখল যে মাথায় গামছা জড়িয়ে উচ্চ স্বরে 'বারহমাসা' গাইতে-গাইতে গ্রামের দিকে চলেছে।

তার পৃষ্ঠভূমিতে ইবরাণী সভ্যতা, য়ুনান এবং রোম; ইরাণ ও স্পেন—এই জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই যেখানে সে শুনেছিল যোগীরা হাওয়ায় উড়তে পারে, কামরূপের মেয়েরা মন্ত্রবলে মানুষকে ছাগল বানিয়ে দেয়, যেখানে বাংলার ও বিহারের তান্ত্রিক মন্দিরে রোমাঞ্চকর যাদু-টোনা হয়।

কামাল চুপচাপ ভগ্নস্তূপের সিঁড়ির উপরে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। চম্পা অযোধ্যায় তাকে যেমন গান শুনিয়েছিল হঠাৎ তার সেই সব গান মনে পড়ল। কামাল পাথরের উপর বসে ঝুপ করে নেমে আসা রাত দেখতে লাগল।

মৃদু চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে।

পূর্ণিমার চাঁদ ধ্বংসস্তূপের ভগ্ন ছাতের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। জ্যোৎস্নায় লাল পাথরের মেঝেতে আশ্চর্য রকমের আকৃতি; মেঝেতে

অনেক রকমের অস্পষ্ট আকৃতি গড়া। শত-শত বর্ষা সেই সব আকৃতিকে অনেক ম্লান করে দিয়েছে। ত্রিশূল এবং কল্পবৃক্ষ, পৃথিবীর প্রতীক পদ্মফুল সৃষ্টিচক্র; পদ্মফুলের সিংহাসন, এবং অগ্নিস্তম্ভ—কে জানে, এই সব অদ্ভুত, আশ্চর্য রকমের প্রতীক এবং আকৃতির কি অর্থ! কেন তারা একদা এ সব এঁকেছিল? অর্থ কি?—কামাল অবাক হয়ে এই সমস্ত আকৃতি দেখতে লাগল। বাইরে মহুয়ার বাগানে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিচিত্র রকমের ধ্বনি কামালের কানে এল! হঠাৎ কামালের মনে হল, ভগ্ন প্রাসাদ থেকে বিরাট একটি রথ বেরিয়ে আসছে। রথের ওপর স্বর্ণখচিত ছাতার নীচে এক সুদর্শন, সৌম্যকান্তি পুরুষ বসে। সে কামালকে দেখছে। তার চোখ অন্ধকারে চক্‌চক্ করছে। তার মুখে বিচিত্র এক হাসি। কামালের সামনে এসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কামালের মনে হল সে তাকে ভেংচি কাটছে আর বলছে—"দেখ আমরা যে ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছি, যে ভাবে কাল আমাদের গ্রাস করেছে—তুমিও একদিন সেইভাবে শেষ হয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে।"

ভগ্ন প্রাসাদের দরজা থেকে আর একটি সুপুরুষ বেরিয়ে এল। চন্দ্রগুপ্ত নৃচন্দ্র—ভারতের সম্রাট। সে তো যিশুর জন্মের তিনশো বছর আগেই মারা গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে সে হাসছে কি করে? কামালের পেছন থেকে আর একটি মাথা উঁকি দিল। খুব সংযত স্বরে সে বলল—"আমি অশোক-প্রিয়দর্শী অশোক। আমি সারা ভারতের সম্রাট ছিলাম। আর আমি যখন মারা গেলাম তখন আমি মাত্র দেড়টি আমলার স্বামী! অশোক তার বদ্ধ মুঠি খুলল। হাতের দেড়টি আমলা কামালের দিকে ছুঁড়ে দিল।

এরপর প্রাচীন মৃত আত্মা ঝড়ের মত তার সামনে এক এক করে আসতে লাগল।

"আমি ভরতমুনি। আমি নৃত্য ও নাটকের জন্মদাতা।"

"আমি তক্ষশিলার বিষ্ণুগুপ্ত। আমি অর্থশাস্ত্র লিখেছিলাম।"

"আমি রাজা ভোজ।"

"আমি গাঁওয়া তেলী।"

"তিমির নিবিড় রাতে মেঘের গর্জন। আমি কালিদাস।"

"আমি কনৌজের রাজশেখর।"

"আমি ভবভূতি। আমি 'মালতী মাধব' লিখেছিলাম।"

"আমি ভর্তৃহরি। আমিই বলেছি সংসার রঙ্গমঞ্চ। আমরা সবাই অভিনেতা। তুমি নট, আমি নট, আমরা সবাই নট।"

মাটির গাড়ী হাঁকিয়ে শূদ্রক উঠানের বাইরে চলে গেল। প্রচণ্ড কলরব। যুদ্ধের আভাস। তার পরেই অন্ধকারে শত শত তলোয়ার চমকে উঠল। ছিন্ন মুণ্ডু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

"আমরা চন্দেলে রাজপুত! আমরা বাঘলে! আমরা রাঠোর! আমরা চৌহান! আমরা আলহা! আমরা উদল!

আবুল কামালউদ্দীন ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। ভোর হয়ে আসছে। মহুয়া বাগানে পাখির কলরব। কৃষক খেতের দিকে এগোচ্ছে।

ঘাবড়ে গেছে। বুঝতেই পারছে না, কোথায় এসেছে। পরে মনে পড়ল, জায়গাটা বহরাইচ। সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শুয়েছিল। বাইরে তার ঘোড়া গাছের সঙ্গে বাঁধা। আকাশে বর্ষায় ভেজা মেঘ। মিষ্টি হাওয়া বইছে—সে উঠে দাঁড়াল। বাতাসে নাম না জানা ফুলের সুগন্ধ। সে ভোরের নামাজ পড়বার উদ্দেশ্যে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

আট

সারাদিন পণ্ডিতদের সঙ্গে তাম্রপত্র নিয়ে মাথা ঘামালো কামাল। তারপর মঠের বাইরে এল। কাল ভোরবেলা সে অযোধ্যার দিকে যাবে। হঠাৎ বৃষ্টির একটা ফোঁটা কামালের মুখে এসে পড়ল। কামাল একটি কাঁচা ঘরের বাইরে আশ্রয় নিল। শ্রাবণ এসে গেছে। এ দেশে শ্রাবণ অত্যন্ত মোহময়। বস্তুতঃ প্রত্যেক ঋতুই মোহময়। তাদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য রাগ এবং রং। এ তার

নিজের দেশ নয় কিন্তু ঋতুর যাদুমন্ত্র থেকে তার মুক্তি কোথায়? হঠাৎ একজন সাধু চিমটে বাজাতে বাজাতে বর্ষার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তার পাশেই খড়ের ছাতের নীচে আশ্রয় নিল। কামাল তাকে সাগ্রহে দেখল।

এ সম্ভবতঃ মোহময় ঋতুর প্রভাব। 'জয় রাম জী কী!' কামাল বলল।

'জয় রাম জী কী!' সাধুর উত্তর এবং প্রশ্ন—"কোথায় চলেছ সৈনিক? কোথা থেকে এসেছ?"

"বাবা, তুমি এখানেই থাক?"

"না। আমি জৌনপুরবাসী।"

"আরে!" কামাল ভীষণ খুশী হল—"তাহলে তুমি আমার দেশেরই লোক!"

পর মুহূর্তে সে নিজেই একটু আশ্চর্য হল।—"আমার দেশ?"

কিন্তু জৌনপুর তার দেশ তো নয়। তার দেশ তো বাগদাদ—সে মনে মনে বিরক্ত হল।

"নির্গুণ রাম? নির্গুণ রাম! জপোরে ভাই নির্গুণ রাম।"

সাধু চোখ বন্ধ করে সমস্বরে পাঠ করে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে কামালকে বলল—"আজ কিছু কলন্দর (দেবেশ) মিয়াঁর সমাধির জন্য ঝাণ্ডা নিয়ে এদিকে এসেছিল, রাপড় থেকে।

খবর পেলাম আমাদের সুলতান আর দিল্লীর সুলতানের মধ্যে ফের লেগে গেছে। এবার আমাদের সুলতানের রক্ষা নেই। নির্গুণ রাম! নির্গুণ রাম!"

কামাল চমকে উঠল। সে তাড়াতাড়ি পটকা কোমরে বেঁধে সোজা ধর্মশালার দিকে এগোলো। ধর্মশালার বাইরে উদয় সিংহ রাঠোর তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি—তুমি এখানে! খবর কি?" কামাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—"বন্ধুবর, তুমি তো গোয়ালিয়রে ছিলে!"

"আমি গোয়ালিয়র থেকেই আসছি। আমার সঙ্গে চল। আমাকে আলমপনাহ তোমাকেই খুঁজতে পাঠিয়েছেন।"

"আমাকে খুঁজতে এত দূর এসেছ ?"

"আলমপনাহও এখানে বহরাইচে উপস্থিত।" উদয় সিংহ বলল—"তুমি এখানে জ্ঞান-ধ্যানে ব্যস্ত। ওদিকে পৃথিবী অনেকটা বদলে গেছে। সুলতান বহলোল তোমার বাদশাহের উপর রাপড়ীতে আক্রমণ করেছে। এস এখানে বস, তোমাকে সব গল্প শোনাই।"

উদয় খাটের ওপর বসল। তারপর বলে চলল—"সুলতান হোসেনের উপর যখন আক্রমণ হলে, তিনি যমুনা পার করে আমাদের রাজার সাহায্য নিতে গোয়ালিয়র এসেছিলেন। আমরা সাহায্য করলাম। আমি তার সৈন্য নিয়ে কালপীর দিকে এগোলাম। ভীষণ যুদ্ধ হল ভাই।" উদয় সিংহ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বিশুদ্ধ সৈনিকের ভঙ্গিতে কামালকে বোঝাতে আরম্ভ করল। সে ঝুঁকে একটা খড় নিয়ে কাঁচা মেঝেতে দাগ কাটতে লাগল—"এই দেখ, এদিকে সুলতান বহলোলের সৈন্য—ওদিকে আমরা। মধ্যে যমুনা নদী। তারাও যমুনা পার হতে পারছে না। আমরাও পারছি না। সময় কেটে যাচ্ছে। তারপর একদিন ত্রিলোকচন্দ্র সুলতান বহলোলকে নদী পার করতে সাহায্য করল।" উদয় থেমে গেল।

"ত্রিলোকচন্দ্রকে চেনো ?"

"না।"

বক্‌সরের হাকিম। বক্‌সর গিয়েছে কখনো ?"

"না।" কামাল একটু চটে উঠে বলল—"আরে কি হল বল না ?"

"হবে কি! দিল্লীর সৈন্য আমাদের ধাওয়া করল। আমরা জৌনপুর পালালাম। সেখানেও তারা আমাদের রেহাই দিল না। আমরা ঈশ্বরের ভরসায় জৌনপুর ছেড়ে বহরাইচ চলে এলাম। তোমার জৌনপুর জনশূন্য। এখন দিনের বেলায় ওখানে শেয়াল ডাকে। চল আমার সঙ্গে।" উদয় উঠে দাঁড়াল।

—"আলমপনাহ বলেছিলেন—কয়েকমাস ধরে তুমি এখানে আছ। সকাল থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মঠের পণ্ডিতরা তোমার ঠিকানা দিল।"

কামাল তলোয়ার কোমরে বেঁধে উদয় সিংহের সঙ্গে লশকরের দিকে চলল। লশকর রাপ্তী নদীর তীরে।

বহরাইচ থেকে তারা কনৌজ গেল। বহলোল লোদীর সৈন্য সেখানেও তাদের পরাজিত করল। শেষে ক্লান্ত, পরাজিত সুলতান হুসেন বিহারে আশ্রয় নিলেন।

জৌনপুরে দিল্লীর এক শাহজাদার রাজত্ব। শর্কীশাসন শেষ হল। ভারতের 'শিরাজ' মরুভূমিতে পরিণত হল। আবুল মনসুর কামালউদ্দীন, কাজী সাহেবউদ্দীন—জৌনপুরের উত্তরাধিকারী, ইতিহাসজ্ঞ, গবেষক এখন সব ত্যাগ করে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। সারারাত, সারাদিন সে এখন সুলতানের সঙ্গে বসে বসে চিন্তা করত—দিল্লীর সুলতানকে কিভাবে পরাজিত করা যায়।

সুলতান বহলোলের মৃত্যুর পর তার সুপুরুষ সুপুত্র, সেকেন্দার হিন্দের বাদশাহ্ হল। তার হিন্দু মাতার নাম হেমবতী। সে নিজের পিতার চেয়েও শক্তিশালী ও সাহসী।

বিহারে আশ্রিত সুলতান আরেকবার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সেকেন্দারের মোকাবিলা করলেন। তিনি আবার পরাজিত হলেন। সঙ্গীতপ্রিয় বাদশাহ আবার বিহারের দিকে ফিরে এলেন।

কামালের আর ভাল লাগেনা। সে অনেক রক্তপাত দেখেছে, অনেক মানুষকে সে খুন করেছে, অনেক অসহায় মহিলার অভিশাপ কুড়িয়েছে। সুলতান হুসেনের দরবারের বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিদের সাধারণ কয়েদীদের মত গলায় দড়ি বেঁধে, হাঁটিয়ে সেকেন্দারের দরবারে পেশ করা হয়েছে—কামাল এসবই দেখেছে। এরা বিদ্বান, শায়ের ও লেখক। তাদের যারা জয় করেছে তারাও বিদ্বান কিন্তু এখানে বিদ্যা জ্ঞান নিরর্থক। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা ও রক্তপাত তাকে পীড়া দেয়। জ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, ইতিহাস সবই অর্থহীন! মানুষ মানুষের রক্তপাত ঘটাচ্ছে। ইতিহাস তার প্রিয় বিষয় কিন্তু এখন সে ইতিহাস ঘৃণা করে। সে সুলতানের বংশাবলী, যুগ, কাল এবং তাঁর রাজ্যের ঘটনাবলী সব কিছু ভুলে থাকতে চায়।

গৃহহীন সুলতান হুসেন বিহার থেকে বাংলাদেশের দিকে চলল।

শেষ পর্যন্ত গৌড়ের সুলতান শাহ জৌনপুরের পরাজিত সম্রাটকে আশ্রয় দিল।

এবার আমার আত্মা কি খুঁজছে? গৌড়ের বাদশাহী বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কামাল নিজেকে প্রশ্ন করল। তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব যেন এক ভয়ংকর শূন্যে দুলছে যেখানে শুধু গভীর নীরবতা।

সেই গভীর নীরবতা থেকে একটা চিন্তা বার বার তার কানে বাজছে—আমি যতদিন এই গোলকধাঁধায় থাকবো, ততদিন আমি মানুষকে হত্যা করবো। তারাও আমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করবে। মানুষ সত্যই মানুষ নয়, হিংস্র জন্তু।

এই সমস্ত ধ্বনি, সেই নীরবতায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আমার সামনে দাঁড়ানো এই লোকটিকে মারব কেননা তার মাথায় টিকি এবং সে গরুকে দেবতা বলে মনে করে। আমি যদি একে হত্যা না করি—সে সুযোগ পেলেই আমাকে হত্যা করবে, কেননা আমার মাথায় টিকি নেই আর আমি গরুর মাংস খাই।

কামালের ভেতরে ঝড় বইছে।

সুন্দর শিবপুরী—বেনারস। বেনারসকে আমার মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত কেননা সেখানকার মন্দিরে লক্ষ-লক্ষ মূর্তি সাজানো—কিন্তু মূর্তির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি কেন এসব ধ্বংস করব?

ঋতু বদলে চলেছে। কামালের আর কিছুই ভাল লাগে না। সে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করে। শূন্য হৃদয়ের হাহাকার থেকে ঘাবড়ে গিয়ে সে রাগ-রংয়ের মজলিসে আশ্রয় নিল। কিন্তু সারেঙ্গীর সুরে সে মৃত্যুর করুণ সুর শুনতে পেল। লখনবতী নর্তকীদের নাচ দেখল কিন্তু নৃত্যের ছন্দে যুদ্ধের দামামা তার কানে বাজে। বাইজীদের মুখ আর হাসি দেখে তার মনে হল—মৃত মহিলারা দাঁত বের করে তাকে ভেংচি কাটছে।

নানা ধ্বনি, আর্তচিৎকার, অদ্ভুত-অদ্ভুত সমস্ত গান মৃত মানুষের ছবি মৃত ভাষার বাক্য ক্রমাগত তার মাথায় যেন ঘুরছে। কামাল আর এ সব সহ্য করতে পারে না। জীবন এত অশান্ত কেন? শান্তি কোথায়? নীরবতা এত ধ্বনিময় হতে পারে সে জানত না।

একদিন এক যুবক তার কানে কানে বলল—"হীরা জনম অমোল থা, কৌড়ী বদলে যায়। হীরা জনম অমোল থা—হীরা জনম অমোল থা" (জীবন হীরের টুকরোর মত অমূল্য, তাকে এভাবে শেষ করছ··· জীবন হীরের টুকরোর মত···জীবন হীরের টুকরোর মত···)। সে বিরক্ত হয়ে কোনো গায়িকার কাছে গেল। বলল—মধু মাধবী গাও! রাগ ললিত শোনাও!

গায়িকা তানপুরা হাতে নিয়ে গান শুরু করতেই গানের শব্দ বদলে যেত। "সাস নকারা কুচকা বাজত হ্যায় দিন রৈন···দিন রৈন···" (জীবন প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষয়ে চলেছে···ক্ষয়ে চলেছে)। শেষ পর্যন্ত সে লখনবতী. গৌড় ও সুনারগ্রাম ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে এল। জায়গাটা তার ভাল লাগল। পুকুরে পদ্ম ফুল সকালের নরম রোদ ঝলমল করছে। ফুলের ওপর শিশির বিন্দু মুক্তোর মত টলমল করছে। অশোক গাছের ছায়ায় বৈষ্ণব পূজারী ও পূজারিণী, তাদের মুখে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম গীত। সেখানে সে প্রাচীন কালের সম্রাট বংগাপতি ও গৌড়েশ্বরের শূন্য ভগ্ন প্রাসাদ দেখল। প্রাসাদের দেওয়ালে সবুজ ঘাস। পাল ও সেন সম্রাটের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের এক পাশে একটা সমাধি। সমাধির পাশে একটা বুড়ো বসে বসে কাশছে। পাশের জমিতে কৃষক লাঙ্গল নিয়ে নেমে পড়েছে। সামনে মহানন্দা নদী বয়ে চলেছে। তার ভাল লাগছে। সে আর ছটফট করছে না। ধ্বনিময় নীরবতা কমে আসছে। অযোধ্যায় অনেক দিন আগে কারুর কাছ থেকে শোনা বাণীর অর্থ এখন স্পষ্ট হল। কেউ তাকে বলেছিল—

আজকালের মধ্যে জঙ্গল হবে আবাদ।

অনেক অনেক লাঙ্গল চলবে, পশু চরবে ঘাস—পশু চরবে ঘাস, পশু চরবে—কিছুক্ষণ ঠিক থাকার পর আবার সে অস্থির হয়ে উঠল। সে ঠিক করল, বাংলা ছেড়ে পালাতে হবে। সুলতান হুসেন শর্কীকে এভাবে গৌড়ে একলা ছেড়ে পালাবার কথা ভেবে সে দুঃখ পেল। "কিন্তু সমস্ত আবেগ ক্ষণিকের" সে নিজেকে বলল এবং রাজপ্রাসাদ থেকে একদিন চুপচাপ সে বেরিয়ে পড়ল। ঘাটে এসে সে একটা

নৌকোয় বসে পড়ল। সে জানে না নৌকো কোনদিকে চলেছে। নদীর বুকে আলো ঝলমল করছে। মাঝিরা সমবেত কণ্ঠে গান গাইছে। কামাল একধারে চুপচাপ বসে আছে। সেই বিরাট নৌকো এগিয়ে চলল—প্রয়াগের দিকে।

দিন কেটে যায়। গংগার বুকে নৌকো এগিয়ে চলেছে। ভাগলপুরের কাছে লাল চেলী পড়ে এক নববধূ নৌকোর ওপরে বসল। তার সঙ্গে অনেক লোক। সম্ভবত তারা বরযাত্রী। সঙ্গে হলুদ রঙের ধুতিপরা বর। নববধূ ঘোমটা টেনে বসে আছে। মাঝে মাঝে কাঁদছে। বরযাত্রীরা হল্লা করছে। কামাল নৌকোর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একধারে বসে এ সব দেখছে, শূন্য দৃষ্টি মেলে। "শোনো চম্পাবতী, আমাকে বিয়ে করবে?" "রাম রাম, কি বলছ কি! মৌলবীদের দাড়ি আমি হুচোখে দেখতে পারি না। জৌনপুরের কাজী হয়ে তুমিও লম্বা লম্বা দাড়ি রাখবে।"

"এখনো সময় আছে চম্পারাণী! নয়তো কোনো দিন মাথা ন্যাড়া কোনো পাণ্ডার কাঁধে তোমায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। সারাজীবন হুঃখ পাবে আর যখন সে মরবে, তোমাকেও তার সঙ্গে চিতায় যেতে হবে। নিজের এই ভয়ানক ভবিষ্যতের কথা তুমি কি কখনো ভেবেছ?"

"আমি তোমার সঙ্গেও মরতে রাজি।"

"সে কি?" সে ঘাবড়ে গেল—"আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে তো হয়নি! তার মানে…আমি…তুমি…!"

"তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তরের সাথী।"

"জনম-জনমের সাথী?" কি আজেবাজে বলছ?" কামাল হেসে বলল—"ফের তুমি তোমার যাহু-টোনার কথা শুরু করেছ!"

এতে যাহু-টোনার কি আছে? চম্পা অবাক হয়ে বলল—"আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। তোমার সামনে আমি মাথা নত করছি।"

"আমি কি খোদা যে আমার সামনে মাথা নত করছ!"

"হ্যাঁ, তুমি ঈশ্বর, খোদা। মানুষের মনেই ঈশ্বরের জন্ম।" সে হাসতে হাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল—

পাটনার ঘাটে অনেকে চড়ল, অনেকে নামল। এক পাল সন্ন্যাসী এল। সঙ্গে কমলালেবু রঙের আলখাল্লা পরা এক ভিক্ষু—সে সকলের চেয়ে একটু দূরে দূরে আছে। কিছুক্ষণ পরে এক সন্ন্যাসী কামালের সামনে এল। কামালের মনে হল, সে তাকে কোথাও দেখেছে।

"তুমি কোথায় চলেছ?" কামালের প্রশ্ন।

"কাশী।"

"ওখানে কি আছে?"

"সেখানে কি নেই?" কাশী, শিবপুরী। মানুষ সেখানে শান্তি পায়। সেখানে আমার মুর্শিদ, আমার শেখ আছে। আশ্চর্য, এত বয়স হল তোমার, তবুও এসব তুমি জানলে না।" সে থামল—"তুমি জৌনপুরের কামালউদ্দীন না?"

কামাল মূর্তিবৎ তাকে দেখছে।

"আমি সুলতান সেকেন্দারের সেনাপতি ছিলাম। চুনার যুদ্ধে আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করেছিলাম। তোমার তলোয়ারের আঘাতে আমার ডান হাতের সব কটা আঙ্গুল গেছে।" সে নিজের একতারা বাঁ-হাতে বাজাচ্ছে। "তুমি কি জান যে তুমি যখন গৌড়ের দরবারে ফুর্তি করছিলে তখন সে তোমার পথ চেয়ে বসেছিল। জঙ্গলে জঙ্গলে সে পাগলের মত তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কোনো রাজহংস তার বাণী তোমার কাছে পৌঁছতে পারেনি।"

কামাল ঘাবড়ে গেল। সন্ন্যাসী জ্যোতিষ বিদ্যাও জানে!

"আমি আমার সৈন্য নিয়ে অযোধ্যা হয়ে এগোচ্ছিলাম। রাপড়ী'র যুদ্ধে তার ভাই মারা গেছে এবং সে সারা জঙ্গল কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিল। সে প্রত্যেক সৈন্যকে দেখে মনে করত এবার হয়ত তুমি ফিরে এসেছ। কেন তুমি তাকে কথা দিয়েছিলে, তুমি তার কাছে একদিন ফিরে আসবেই। আমাকে সৈন্য মনে করে সে তোমার কথা জিগ্যেস করল। তোমার বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারলাম না তাকে। তারপর সে কোথায় চলে গেল, জানি না। এই বিরাট পৃথিবীতে তুমি তাকে কোথায় খুঁজবে!" সাধু বলছিল—

"তুমি তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। সেও তোমায় কোনো-দিন ফিরে পাবে না। ক্ষুদ্র জীবনে দুটি মানুষের মাত্র একবার দেখা হয়। কেউ হারিয়ে গেলে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে হারিয়ে যায়। পাওয়া আর হারানোর অর্থ বুঝতে পার?" সাধু আবার একতারা উঠিয়ে বাজাতে বাজাতে নিজের সঙ্গীদের দিকে চলে গেল।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। গঙ্গার জল যেন রূপোর চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে অনেক যাত্রীবাহী নৌকো, বজরা, এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যেবেলা যখন সূর্য ডোবে তখন মন মাতানো পাগলা হাওয়ায়, নৌকোর পাল ফুলে ফেঁপে উঠে। মনে হয় অসংখ্য শ্বেত রাজহংস মানস সরোবরের দিকে উড়ে চলেছে। নৌকো থেকে গানের সুর ভেসে আসছে—সন্ন্যাসীদের সুমিরণ, ফকিরের আলাপ, বৈষ্ণব পূজারীদের ভজন। ব্যাপারীদের নৌকো আড়তের দিকে এগিয়ে চলেছে। দূর দূর দেশের লোক—আরব আর চীনের বিদ্বান, তিব্বত আর কাশ্মীরের ভিক্ষু, আরবের পর্যটক, ইরানের ভাস্কর, যাভা'র নর্তকী নৌকোয় চড়ে বসে। দেশে এখন শান্তি। দিল্লীতে সুলতান সেকেন্দারের শাসন। জীবন ব্যস্ততায় ভরপুর।

"যারা মনের শান্তি পেয়েছে তারা ভাগ্যবান। ভাই, আমি শান্তি চাই।" কামাল ধীরে ধীরে বলল। ভিক্ষু চোখ তুলে কামালকে দেখল। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। আজ থেকে দু হাজার বছর আগে, এক বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনই তার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে। চতুর্দশীর চাঁদ নদীর বুকে কাঁপছে। দিগন্ত পর্যন্ত চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। ভিক্ষু এবং কামালের মুখ চাঁদের শীতল আলোয় ঝলমল করছে।

"আমাকে আমার ভাবনা হতে মুক্তির পথ দেখাও!" কামালের অনুরোধ। ভিক্ষু রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখল।

"ভাবনা! ভাবনা নিজেকেই জানে না। ভাবনা আপনা-আপনিই বাইরে যেতে চায় না। সৃষ্টির বাইরে কোনো ঈশ্বর নেই—আর ঈশ্বরের বাইরে কোনো সৃষ্টি নেই। সত্য আর অসত্যে কোনো

অন্তর নেই কিন্তু এরচেয়েও উপরে চরম সত্য, মহাশূন্যের মত।” ভিক্ষুর স্বর গম্ভীর।

“শূন্যতা, নিস্তব্ধতা—আমার বড় ভয় করে এসব কথা ভেবে।” কামাল বলল—“আমি বড় একলা। শূন্য-নীরবতা-শূন্যতা; যা অন্তিম সত্য; যা শূন্যের পরিকল্পনা। এই নীরবতায় আমি একলা কোথায় যাই? তুমিও আমার সঙ্গী হতে পার না!”

কামাল মহাযানী ভিক্ষুকে সংশয়াকুল নেত্রে কি দেখল।

নৌকো একটা গ্রামের ধারে ভিড়ল। কামাল নেমে পড়ল। চারিদিকে দেখল। কোথায় যাবে জানে না। বৈষ্ণব পুজারীর দলও নৌকো থেকে নামল। কামাল তাদের পেছনে পেছনে চলল।

অনেকদিন পর্যন্ত সে এইভাবে ঘুরে ঘুরে কাটালো। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন এক সবুজ জঙ্গলে পৌঁছল। সে জায়গার নাম জানেনা। পাশেই তাঁতীদের বস্তি। চন্দনের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। শ্রাবণ মাস আগতপ্রায়।

বৈষ্ণব যোগিনীরা গলায় তুলসী মালা পরে কাঁঠাল গাছের নীচে করতাল বাজাচ্ছে। গাছের ডালে গোলাপী চোখওয়ালা টিয়া পাখি বসে। হাতে কমণ্ডলু নিয়ে যোগীরা তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ছে।

পুকুরের ধারে রসবেলী ফুলের সুগন্ধ। মহুয়া গাছের ঝোপ থেকে মধুর গীত ভেসে আসছে। কামাল পুকুরের সিঁড়িতে বসে জঙ্গল এবং শ্রাবণের মহিমা দেখছে আর শুনছে।

তখন সে বুঝতে পারল, নীরবতা ফিরে এসেছে। নীরবতার ভিন্ন-ভিন্ন স্তর। সে অবাক হয়ে গেল। এই নীরবতাই চরম সত্য। এই নীরবতাই সে খুঁজছিল। ভিক্ষুর কথা সে বুঝতে পারল।

সে লক্ষ্য করল মহুয়ার ঝোপে বৈষ্ণব পুজারিণীরা বর্ধমানের জয়দেবের গান গাইছে। জয়দেব গোস্বামীরা, পুজারিণীরা গাইছিল—“মলয় দেশের গরম জঙ্গল থেকে পাগলা হাওয়া এদিকে ছুটে আসছে। ওখানকার এলাচ গাছের চুরি করা সুগন্ধ এদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে মৌমাছির মেলা বসে।”

“বসন্ত কালে নিঃসঙ্গতা মানায় না। এখন সে নৃত্য করছে।

বাতাসে নৃত্যের ছন্দ। যেখানে সে নৃত্য করছে, সেখান থেকেই এই পূবের হাওয়া আসছে।"

হলুদ ফুল কামদেবের বাণের মত ঝলমল করছে। ফুলের উপরে মৌমাছি শুয়ে। মাধবী হাওয়ায় দুলছে। এবং এই সময়ে সে কুটীরে নৃত্য করছে। বসন্ত কাল—আর একলা থাকা যায় না।

সূর্যের আলো আমের মুকুলের ওপর পড়ছে। ঠিক যেন তপ্ত ঠোঁট মুদিত নয়নকে ছুঁয়েছে। সে যমুনার ধারে নৃত্য করে চলেছে। ফুলের এই ঋতুতে সে কিন্তু একলা নয়।"

"গোপীদের সঙ্গে নেচে-নেচে সে সময় নষ্ট করবে। অথচ রাধা তার প্রতীক্ষায় বসে আছে।"

পূজারিণীরা গানের দ্বিতীয় কলি ধরল—

"দূর দেশের যাত্রী কোনো পথিক, কোয়েলের ডাক শুনে হঠাৎ যেমন নিজের দেশের নদী আর আম্রকুঞ্জের কথা মনে করে, তেমনি সহসা তার রাধার কথা মনে পড়ল।"

আর রাধা দেখল—"সোনালী বস্ত্র ধারণ করে, মাথায় বনফুল সাজিয়ে, রঙিন অধরে বাঁশি ঠেকিয়ে সে গোপীদের সঙ্গে নাচছে।"

কামাল বসে বসে শুনছে—

পূজারিণীরা গাইছে—

কোয়েলের গান পথিককে আনমনা করে।
যে আনন্দ সে উপভোগ করতে পারেনি তারই যন্ত্রণা,
যে যাত্রা সে করতে পারেনি—তার পীড়া,
সেই পরিশ্রমের পীড়া যার কোনো ফল সে পায়নি,
পথিককে আনমনা করে,
সব সুখেই দুঃখ আছে, দুঃখ অনন্ত।

কামাল উঠে দাঁড়াল। পূজারিণীদের গান, জয়দেবের শব্দ সব যেন দূরে সরে গেল।

জয়দেব বলেছিল—আমি প্রতীক্ষা করছি। প্রেম তো সেও করে যে বিলম্বে প্রেম আরম্ভ করে।

সে চলেছে। জঙ্গলের ছায়াঘন পথে পথে নানা পাখির গান

তাকে কখনো উদাস করছে কখনো আনন্দ দিচ্ছে। চলতে চলতে হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়ে সে দেখল গঙ্গার জল চক্চক্ করছে।

সে জানতো না, এভাবে চলতে চলতে সে বেনারসে পৌঁছে গেছে। ওই পারে শিবপুরী। মন্দিরের কলস রোদে ঝলমল করছে। শত-শত ঘণ্টা একসঙ্গে বাজছে, বাতাসে ধূপের সুগন্ধ। কাশী—অনাদি ও অনন্তকালের নগরী।

গাছের ছায়ায় সে সারাদিন এমনি ঘুরে বেড়াল। ভীষণ ক্লান্ত। জঙ্গল শেষে তাঁতীদের বস্তি। সে বস্তির দিকে এগিয়ে গেল।

তাকে দেখে একজন আহীর জিগ্যেস করল—"ভাই, মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূর থেকে আসছ? তোমার পায়ে অনেক ধুলো!"

"হ্যাঁ" সে উত্তর দিল—"আমি অনেক দূর থেকে আসছি।"

"এস, একটু ছাতু খাও আমার সঙ্গে।" সে তাকে একধারে নিয়ে গেল—"তোমার জামাকাপড় দেখে তো বড়লোক মনে হচ্ছে—তোমার কিসের দুঃখ? তুমি সুলতানের লোক?"

"না। আমি কোনো সুলতানের লোক নই।"

সে জুতো খুলে ভাল করে বসল এবং চারিদিকে দেখল।

"চম্পাবতী, একবার এসে দেখে যাও" সে মনে মনে বলল—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। তুমি বলেছিলে, আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করি, তুমি তাহলে আমাকে কাশী নিয়ে যাবে। আমি আমার তলোয়ার নদীর বুকে ফেলে এসেছি। আমি আজ কাশী পৌঁছেছি। তুমি কোথায় চম্পা?"

সামনে দিয়ে এক দল সাধু চলে গেল। সন্ন্যাসীরা কানে কুণ্ডল পরে, হাতে ত্রিশূল নিয়ে, ঘাটের দিকে চলেছে। তাঁতী, আহীর কাঙ্গালদের একদল করতাল বাজিয়ে ভজন গাইতে গাইতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

চম্পা বলেছিল—"এদেরকে হেয় মনে কোরো না। এদেরকে ভালবাস। একদিন এরাই তোমার সাথী হবে।" তার মনে পড়ল।

সে উঠল, এগিয়ে গিয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেল। এরা সবাই নিজের গুরুর কাছে চলেছে।

মিয়া কবীর সকালে কাপড় বুনতেন, কাপড়ের ঝুলি কাঁধে নিয়ে দুপুরের দিকে বেনারসের গলিতে কাপড় ফেরি করতেন। সন্ধ্যে-বেলায় তাঁর বাড়ীর সামনে ভক্তরা আসত। একতারা এবং করতাল বাজিয়ে তারা ভজন গাইত।

কাশীর পণ্ডিত ও দিল্লীর মৌলবীরা মিয়া কবীরের দর্শন এবং বাণী পছন্দ করত না। কিন্তু তাদের করণীয় কিছুই ছিল না। সারা দেশ যেন এক নতুন সুরে মেতে উঠেছে। গত তিনশত বছর ধরে ভারতের ভক্তিমার্গে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল। সম্রাট, রাজা, ছত্রপতি, মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের জগৎ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে কামাল এক নূতন পৃথিবীর সন্ধান পেল। এ এক অদ্ভুত সুন্দর জগৎ—এখানে নাপিত, মুচী,. তাঁতী, কৃষক সব সমান। এ গণ-তান্ত্রিক ভারত এবং এই ভারত গৃহহীন, সুফী ও সাধুদের শাসনাধীন। হিন্দু ভক্তরাও ইস্লামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। শান্তিপ্রিয় সুফীরা ইস্লামের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—এখানে তলোয়ারের প্রয়োজন কোথায়? হাজার হাজার বছর ধরে শোষিত, অস্পৃশ্য মানুষ, সুফী আর সন্তদের কাছে বসে রামনাম জপ করছে। এ এক অন্য জগৎ। হিন্দু আর মুসলমানের ভেদাভেদের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। এখানে প্রেমেরই জয়গান। এ এক সত্যিই বিচিত্র সুন্দর জগৎ। কামাল মনুষ্যত্বের খোঁজে পথভ্রষ্টের মত ঘুরে বেড়িয়ে দেখল, দুনিয়ায় শুধু হিংস্র জন্তুই নেই, মানুষও আছে। সে হিংসা, অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত ও যুদ্ধ দেখেছিল! আজ এখানে এসে দেখল—এই সংসারে মানুষ আছে, আছে মনুষ্যত্ব। সেই লোকটি যে তাকে বসিয়ে ছাতু খাইয়েছিল, সে তার প্রাণ কোনো দিন নেবে না, কেননা কোনো রাজত্বের লোভ তার মধ্যে নেই। দুবেলা দুমুঠো খেতে পেয়েই সে খুশী। দেশের রাজনীতি নিয়ে সে কেন মাথা ঘামাবে? এই কৃষকটি যে তার বাড়ীর বারান্দায় বসে-বসে নিজের

মেয়েকে রুটি খাওয়াচ্ছে সে হয়ত স্বপ্নেও ভাবে না যে আগামী কাল দিল্লীতে কার শাসন কায়েম হবে! সুলতান হুসেনের রাজত্ব হলেও সে লাঙ্গল চষবে, কর দিয়ে যাবে আর সেকেন্দার গদীতে বসলেও সে তাই করে যাবে। তুর্কীদের আগে যখন পৃথ্বীরাজের রাজত্ব ছিল তখনো এদের প্রপিতামহ, এদের পিতা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রোদে মুটে-মজুরী করত, শ্রাবণ মাসে শ্রাবণ-গীত গাইত আর একদিন যখন দুর্ভিক্ষ আসত চুপচাপ মরে যেত।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ভক্তরা ভজন-কীর্তন করবার জন্য জড়ো হচ্ছে। কামাল তাদের মধ্যে মিশে গেল।

বাগদাদ আর জৌনপুরের ঐতিহাসিক, গবেষক, সেনাপতি, আবুল মনসুর কামালউদ্দীন, আধ্যাত্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারত না। আজ সে কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনো পায়নি। কবীর তাকে বলেছিল —"শোনো ভাই, হরির সঙ্গে একাত্ম হও, ঈশ্বরকে ভালবাস, তোমার সব দুঃখ সে গ্রহণ করবে।"—দুঃখই সত্য, দুঃখের মূল্য সত্য··· ! নৌকোয় সেই তান্ত্রিকও তাকে একই কথা বলেছিল। কিন্তু হরি কে? এর শেষ কোথায়? সেখানে পৌঁছে কি পাবে সে? যথার্থ বিশ্বাস কোথায়? ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি? প্রেম এবং বৈরাগ্য মানুষকে কি দেয়? মোক্ষ কি? জ্ঞানের ক্ষেত্র এত বিশাল! সে কোন চিন্তাধারার অধ্যয়ন আগে করবে! কামালের সামনে তিনটে পথ—প্রেম, জ্ঞান এবং কর্ম। সে স্থির করতে পারছে না, কোন পথে সে এগোবে! মদরসায় (পাঠশালায়) ইস্‌লামী দর্শন নিয়ে লম্বা-চওড়া আলোচনা হয়। সুফী আর দরবেশরা নিজের নিজের প্রভাব বিস্তার করছে এবং ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর। গঙ্গার ধারে ধারে আম্রকুঞ্জের নীচে অসংখ্য উপাসনা গৃহ—সেখানে আল্লার বান্দারা 'সসীম' থেকে 'অসীম' পর্যন্ত সমস্ত আধ্যাত্মিক স্থিতি পার করেছে অথবা গুরুর ধ্যানে গুম হয়ে বসে আছে। নির্বাণের খোঁজে

যোগী ও সুফীরা সমাধিস্থ। সুফীরা তাকে বলল—"আলোই শেষ সত্য—আলো…আলো…আলো! যা আলো নয়, তার কোনো অস্তিত্ব নেই।"

কিছু পর্বেশ তাকে বলল—"শেষ সত্য মানুষের হৃদয়, চিত্ত।"

আল্লার সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রতিধ্বনি সে এই কুঞ্জে শুনল। এটা হিন্দুস্তান। এ ফরীউদ্দীন অত্তার এবং সেখ জলালউদ্দীন জবারজী এবং বহাউদ্দীন জকরিয়া এবং জলালউদ্দীন সুর্খপোশ এবং খাজা মোইনউদ্দীন চিস্তী ও কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর দেশ। এইসব মহান আত্মার দেশে যুগ-যুগান্তর ধরে যা সে খুঁজছে—তা পাবে না এমন অভাগা হয়ত একজনও নেই।

একদিন রাত্রে সে মঠের বাইরে বসে বসে এইসব ভাবছিল। মঠের ভিতরে পণ্ডিতরা শ্লোক পড়ছিল। সে মুসলমান তাই তার প্রবেশ নিষেধ। পণ্ডিতরা বিচিত্র ভঙ্গীতে শ্লোক পাঠ করে যাচ্ছে। তার ভাল লাগল না। জৌনপুরের মুসলমান বিদ্বান ও কাশীর পণ্ডিত, এই দুই সম্প্রদায়ই তার কাছে অর্থহীন। কেউ তার কথা শুনছে না। সে বসে রইল।

"সাহেব মেহেরবান! সাহেব মেহেরবান!

সে ঘুরে দেখল। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মন্দিরের সিঁড়িতে কয়েকজন পাহাড়ী একতারা হাতে নিয়ে গাইছে—"সাহেব! মেহেরবান!"

সে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল। নিজেই নিজেকে বলল—"কামালউদ্দীন, মনে হচ্ছে কবীরের 'সাহেব' তোমাকে ডাকছে। সে সত্যিই মেহেরবান। তুমি দুটো পথই দেখেছ কিন্তু প্রেমের পথে পা বাড়াওনি। সেই পথে এগিয়ে চল—তুমি যাকে খুঁজছ তাকে হয়ত সেই পথে পাবে। "হ্যাঁ প্রেমের মার্গে ঝুঁকি আছে।"

সে ঘাটের দিকে চলল এবং গঙ্গা পার করে কবীরের কুটীরে ফিরে এল।

দিন বয়ে যায়।

চম্পার স্মৃতি এখন অন্য এক রূপে তার মনে গাঁথা। হজরত

আমীর খুসরোর একটি দোহা মনে পড়ে যা তিনি হজরত নিজামউদ্দীন, আওলিয়ার ব্রহ্মে লীন হবার খবর শুনে বলেছিলেন—

"প্রিয়া বিছানায় শুয়ে আছে, মুখের চারিপাশে কেশ ছড়ানো,
খুসরো, নিজের ঘরের দিকে চল, ভোর হয়ে আসছে।..."

প্রেম নির্বাহ করার অর্থ সে বুঝতে পারে না। প্রেমের পথ তাকে চম্পাই দেখায়। গঙ্গার সঙ্গে যেমন যমুনা মিশে থাকে, ঠিক সেই-ভাবে সে কবীরের সাথে থাকে। আর চম্পা এই গঙ্গা যমুনার তরঙ্গে সরস্বতীর মত অন্তঃসলিলা। বাইরের চোখ তাকে দেখতে পায়না।

কবীরের সঙ্গ সে কিছুদিনের জন্যই পেল কেননা কাশীর পণ্ডিত ও মৌলবীরা সুলতান সিকন্দর লোদীর কাছে নালিশ জানাল যে পথভ্রষ্ট তাঁতী কবীর জনসাধারণকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর সুলতানের আদেশ কবীর যেন কাশী ছেড়ে চলে যায় কেননা সুলতানের মতে এ ছাড়া পাণ্ডা ও মৌলভীদের ধর্মান্ধতা সুরক্ষিত রাখার কোনো পথ নেই।

দশ

মিয়াঁ কবীর নির্বাসিত। কামাল আবার কোমর বেঁধে পথে নামল। ঘাটে পৌঁছে বাংলাদেশগামী নৌকায় চড়ে বসল। গঙ্গার একধারে, এখান থেকে শত-শত মাইল দূরে গৌড়দেশ। সেখানে সে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে সুলতানকে একলা ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। কয়েক সপ্তাহ পরে নৌকো পাটনা পৌঁছল। পাটনায় সে খবর পেল সুলতান হোসেন শর্কী ভাগলপুরে এসেছিলেন। সেখানেই তিনি নির্বাসিত অবস্থায় দেহত্যাগ করেছেন।

সুলতান হোসেন শর্কী সঙ্গীতের জগৎ যাঁর কাছে তাঁর "হুসেনী পিয়া"র জন্য চিরকৃতজ্ঞ—যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে বন-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিন্তু "হুসেনী পিয়া" অক্ষয়, শ্বাশত। সঙ্গীত জগতে তিনি অমর হয়ে রইলেন।

কামাল এবার সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াল, নূতন নূতন দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ালো—সঙ্গীত-যার জন্ম সবচেয়ে আগে—পরম সত্যের সঙ্গীত, যাকে সুফীরা 'নওয়াবেশর্মদী' এবং কবীর 'অনহদনাদ' বলতেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভজন—মাঝি ও কৃষকের গীত—সঙ্গীতের সম্পূর্ণ জগৎ এখন কামালের নিজের। যুদ্ধ, রাজনীতি, মৃত্যু, হত্যা সব সে ভুলে গেল। সুরের মধ্যে সে যেন পরম ঈশ্বরকে খুঁজে পেল। সঙ্গীতের অদ্বৈত পরমেশ্বরের অদ্বৈত।—বাংলাদেশ। কোনো এক ঘাট। কামাল নাম জানে না। যে দিকে চোখ যায়, পানের ফসল, ধানের সবুজ শিষ। ঝিলে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। অশোক গাছের নীচে মুর্শিদের আরাধনা গৃহ। সে এখানেই আশ্রয় নিল।

কামাল বাংলাদেশের ভবঘুরে কবিদের সঙ্গে দেশটা চষে বেড়াল। পূর্বদিকে নদীর বুকে নৌকো ভাসিয়ে সে চট্টগ্রামের পাহাড়ে পৌঁছল। চট্টগ্রামে যাত্রীদের সঙ্গে সে সীতাকুণ্ড গেল। পাহাড়ে বাঘ ঘুরে বেড়ায়, পাশেই মহারাণী সীতার মন্দির। পাহাড়ের গায়ে ঘেঁসা লাল পাথর দিয়ে মোড়া একটা পুকুর। পুকুরের ধারে কয়েকজন মেয়ে বসে আছে।

সে এক নতুন ভাষা শিখছে। বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার মধ্যে আর অবধ বা বিহারী ভাষায় বিশেষ পার্থক্য নেই—এ সব ভাষাই সংস্কৃত ভাষার খুব কাছে এবং দেশের নূতন ভাষা হিসেবে খুব তাড়াতাড়ি বিকশিত হচ্ছে।

বাংলা বড়ই মধুর ভাষা। কামাল বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে স্বীকার করল। সে এখন বাংলায় ভাবে, বাংলায় কথা বলে, বাংলা লেখে। এই কি সেই কামাল যে একদা জৌনপুরের দরবারে সরদারের চাকরি নিয়ে সুদূর বাগদাদ থেকে এসেছিল?

কিন্তু পৃথিবী—জৌনপুরের আবুল মনসুর কামালউদ্দীনকে ভুলে গেছে। কেউ কি জানে যে এই রূপবান যুবক যার কানের পাশের

চুল একটু একটু করে সাদা হয়ে আসছে, যে চাঁপা গাছের নীচে বসে মুসলমান ফকীরের কাছে কাঞ্চনমালার রূপকথা শোনে, কখনো একতারা বাজিয়ে বাংলা মুর্শিদগীত গায়—কখনো কাগজ কলম নিয়ে কোনো বাংলা লোকগীত বা গল্প লেখে। সে কে? কামালের এ আরেক রূপ। সে নিজেই কি জানত যে ফারসী লিপিতে লেখা তার বাংলা আজ থেকে অনেক শত বছর পর বাংলার অমূল্য সম্পদ—পুঁথি আর লোকসাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত হবে!

কয়েক বছর ধরে সে গল্প ও গীত লিখে চলল। ঐতিহাসিক, গবেষক, সেনাপতি, সুফী ও কবীরের শিষ্য কামাল এখন গীতিকার।

ঘুরতে-ঘুরতে সে সোনারগ্রামে পৌঁছল, বিয়ে করল। নাম—সুজাতা। জাতিতে শূদ্র। একদিন সে কাঁখে কলসী নিয়ে পুকুরে জল ভরতে এল। কামাল তার লম্বা চুল ও বড় বড় চোখ দেখে তাকে ভালবেসে ফেলল। এটা প্রেম করার বয়স নয়। কিন্তু অনেক ঘোরার পর কামাল বুঝতে পেরেছিল—জীবনে শান্তি অমূল্য সম্পদ—এমন শান্তি যেখানে ঝড়-ঝাপটার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সহজ, সরল গ্রাম্য মেয়ে সুজাতা তাকে এই শান্তি দিয়েছিল। সুজাতাকে পেয়ে তার মনে হল—সুজাতাকেই সে এতদিন খুঁজছিল।

সুজাতা এখন তার সহধর্মিনী। সুজাতা জাতিতে শূদ্র। কামাল বুঝতে পারে না শূদ্ররা এত দুঃখ পায় কেন। সে সুজাতার নাম বদলে আমনা বিবি রাখল। এবং আমনা বিবির সঙ্গে ঘর বাঁধল—একটি কাঁচা বাঁশের সুন্দর কুটীরে।

চাষ-বাস করা তার জীবিকা। সে ধানের চাষ করত। কুটীরের সামনে পুকুর। আকাশে যখন ইন্দ্রধনু, ফুলের বাগানে মৌমাছির গুন গুন, তখন কামাল ঘরের ছোট্ট বারান্দায় বন্ধু গীতিকারদের সঙ্গে বসে আনন্দ লহরী বাজাতো। দেখা যেত আমনা শরীরে সবুজ রঙের শাড়ী পরে পুকুরের দিকে চলেছে।

সময় বয়ে যায়। বাংলা দেশের সুলতানরা যুদ্ধবাজ কিন্তু সেই বাংলাদেশ এখন শান্ত। গৌড়ের সিংহাসনে সৌয়দুসাদাত আলাউদ্দীন আবুল মুজফফ্‌র হুসেন শাহ। তাঁর যুগে দুধের নদী

বইতো। রক্তপাত, লুটপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলা দেশের এই মহান বাদশাহের রাজত্বে বিদ্যাপতি, ঠাকুর ও মহাপ্রভু চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেম গীতে দেশ ছেয়ে গেছে। রাজমহল থেকে পাথর আনিয়ে গৌড়ে সুন্দর সুন্দর ইমারৎ তৈরি করা হচ্ছে। দরবারে সাহিত্যসভা ও মজলিসের আয়োজন চলছে।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। কামালের সন্তানরা এখন যুবক। তার ছেলে দু'টোর নাম জমাল ও জলাল। মেয়ের নাম সাকীনা বিবি। ছেলে মেয়েরা তার চোখের মণি। ছেলে দু'টো গৃহ নির্মাণ কলায় নিপুণ এবং গৌড় তথা সোনারগ্রামে কাজে ব্যস্ত। কামালের স্ত্রী মারা গেছে। সে পুকুরের ধারে নিজের হাতে সমাধি গড়েছে স্ত্রীর জন্য। কামালের চুল এখন সাদা। সারাদিন ঘরের বারান্দায় বসে মুর্শীদ গান রচনা করে ও গায়। বাংলা দেশের সুলতানদের রক্ষণাবেক্ষণে বাংলা ভাষা, লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত প্রগতির পথে। তার ছেলেরা গৌড় থেকে গ্রামে ফিরে এসে তাকে দেশ-বিদেশের গল্প শোনায়; রাজনৈতিক খবর আলোচনা করে। কামালের কিন্তু মনে হত, এ সব কথা যেন অন্য কোনো নক্ষত্রের।

আবুল মনসুর কামালউদ্দীন এখন বাংলা দেশের লোক—বাঙ্গালী। অতএব সুদূর পশ্চিমে দিল্লীতে আরেকবার যখন রাজা বদলের পালা চলল, সুলতান ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলেন, জহীরুদ্দীন বাবর বিজয়ী হলেন এবং দুনিয়ার ভার বাহক গরু যখন নিজের সিং বদলালো তখন বড় ছেলে জামালের কাছে এ সব খবর শুনে সে একটুও আশ্চর্য হল না। তার ছেলে জালাল যখন তাকে বলল যে সে মোঘলদের জন্য ইমারৎ গড়তে দিল্লী যাবে--তখন সে মৌন। সে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে নিজের গন্তব্যস্থল খুঁজে পেয়েছে। এখন তার ছেলেদের সামনে সেই বিশ্ব। তারাও তাদের গন্তব্যস্থল নিজেই খুঁজে নেবে।

অশান্তি আবার ঘনিয়ে আসছে। বাংলাদেশে সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দীন শাহের রাজত্ব। মোঘলদের কাছে পরাজিত আফগানরা যারা গতকাল পর্যন্ত দিল্লীর শাসক ছিল, গৌড়

ও লখনবতীর অলি-গলিতে ঠিক সেইভাবেই ঘুরে মরছিল যেভাবে একদা জৌনপুরের শাসক এই আফগানদের কাছে পরাজিত হয়ে এখানে আশ্রয় নিতে এসেছিল! সর্বত্র আফগানরা ছড়িয়ে আছে। কামালের সঙ্গে প্রায়ই তাদের দেখা হয়। তারা নিজেদের লুণ্ঠিত বৈভবের গল্প সকলকে শোনায়। একদিন গৌড়ের গলিতে তার সঙ্গে এক পর্তুগীজের দেখা, সে সগর্বে চলেছিল। কামাল লাঠির সাহায্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকে দেখল। পর্তুগীজদের জাহাজ এখন চট্টগ্রামের বন্দরে। তারা সম্ভবতঃ শহর দেখতে বেরিয়েছে।

সময় কেটে যায়। গৌড়ের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। এখন সেখানে নাসিরউদ্দীনের ভাই গিয়াসউদ্দীনের রাজত্ব।

একদিন কামাল শুনল, বিহারের শের খাঁ গিয়াসউদ্দীনের কাছ থেকে বাংলার গদী কেড়ে নিয়েছে। তারপর সে শুনল দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুঁ ও শের খাঁর সৈন্যরা দারুণ যুদ্ধে লিপ্ত। শস্য-শ্যামলা বঙ্গে অশান্তি বেড়ে চলেছে। শের খাঁ আবার বিপুল সৈন্য নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে এসে মোঘলদের পরাজিত করে বাংলার বাদশাহী পেল। হুমায়ুঁ এবং শের খাঁর সৈন্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে গৌড়ের পথে লড়তে-লড়তে জলাল নিহত হল। একদিন রাত্রে শের খাঁর সৈন্যরা কামালের গ্রাম ঘিরে ফেলল। লুট-পাট করতে করতে সৈন্যরা তার ঘরের কাছে এল। "বেরিয়ে এস" তাদের উল্লাস—"তুমি দুশমন! তুমি উপদ্রবী! তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না! তোমার এক ছেলে দিল্লীতে মোঘলদের পক্ষ নিয়েছে। তুমি দেশদ্রোহী।" কামাল নিরুত্তর। তারা আবার চেঁচাল— "আরে সেই গীতিকার বুড়োটা এখানেই থাকে তো? বেরিয়ে আয় বুড়ো—আজ তোকে দেখে নেব।" কম্পিত হস্তে প্রদীপ নিয়ে কামাল ক্ষীণ আলোয় সৈন্যদের দেখল। সে এখন বৃদ্ধ, তার হাত কাঁপছে। নিজেকে রক্ষা করবার জন্য তলোয়ারও নেই। তবু দৃঢ় মনোবল নিয়ে সে নিজের কুটীরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। তার দোষ কি? আফগানের আর মোঘলের মধ্যে বাদবিসংবাদে তার

কোনো আগ্রহ নেই। তার একটিই আকাংক্ষা—সে শান্তিতে থাকতে চায়। ভারত তার দেশ। সে এই দেশেরই নাগরিক। এখানেই তার সন্তানদের জন্ম—এই মাটিতেই তার স্ত্রীকে সে কবর দিয়েছে। এই বাংলা দেশকে সে ভালবেসেছে, ভালবেসেছে বাংলা ভাষা। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সে গীত লিখেছে। সে এখানেই থাকবে। কারুর তাকে দেশদ্রোহী বলবার অধিকার নেই। এখানকার মাটি যুদ্ধ চায় না—শান্তি চায়। এটা যুদ্ধ-গৃহ নয়—শান্তি গৃহ। সে বুঝতে পারল যুদ্ধ গৃহ আর শান্তি গৃহে কোনো তফাৎ নেই। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেই যা তফাৎ। যুদ্ধ দুই ধর্মের মধ্যে হয় না, হয় দুই রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে।

সহসরামের শের খাঁ আর দিল্লীর হুমায়ুঁ বাদশাহ, দুজনেই ইসলামের কলমা পড়েন কিন্তু একজন অপরকে শেষ করতে চান। শান্তি-গৃহের মধ্যে পাপ ঢুকলে তা যুদ্ধ গৃহে পরিণত হয়।

শের খাঁর মূর্খ সৈন্য এ সব বুঝবে না। তারা কামালকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর হল্লা করতে করতে এগিয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তার মুখ রক্তাক্ত হল, কয়েক ঘণ্টা সে শিশুর মত কাঁদল তারপর নিঃশব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

হিন্দ এখন মোঘলদের। পুরোনো নিয়ম বদলে গেছে। গৌড়, লখনবতী, পাটনা এখন স্বপ্ন। তুর্কীদের দিল্লীও নেই। দিল্লী এখন মোঘলদের। দিল্লী, যা একদা ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল এখন তার নাম তুগলকাবাদ। আজ দিল্লী মহান তৈমুরদের জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানী শাহজহানাবাদ।

কিন্তু সেই কৃষকটি আজও আছে যে গভীর আগ্রহ নিয়ে ধান চাষ করে চলেছে। লাঙ্গল নিয়ে মেঘনা নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। [illegible] নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলেছে। সে মুর্শীদ আর সুফীদের চরণে বসে তাদের গান গেয়ে চলেছে।

বাংলার কৃষক আবুল মনসুর কামালউদ্দীন বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। সে নিজের ছোট্ট নৌকোয় বসে পদ্মার ঝোড়ো হাওয়ার মোকাবিলা করছে। নৌকো পদ্মার তরঙ্গে দুলছে। সামনে ঘন অন্ধকার। প্রচণ্ড ঝড়। ভয়ঙ্কর তুফান। শত-শত কুমীর অন্ধকারে হাঁ করে আছে যেন। কিন্তু পদ্মার এই দৃশ্য, উপবাসে জর্জরিত মাঝির নৌকো তুফানের মোকাবিলা করে চলেছে। কেননা নিষ্ঠুর তুফান ও মৃত্যুর সঙ্গে তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। শেষে যখন প্রচণ্ড বেগে নৌকো দুলতে লাগল তখন ত্রিল লণ্ঠন তুলে চারিদিকে তাকিয়ে পীটারকে বলল—"পীটার আমরা ঝড়ে আটকে যাইনি তো?"

"না-না, ভয় নেই।" পীটারের উত্তর।—কিন্তু এই কালো শুয়োরটাকে নিজের বেসুরো গান থামিয়ে পাল সামলাতে বল, নয়ত কাল সকাল পর্যন্ত আমরা ঘাটে পৌঁছতে পারব না।

"ঘুমিয়ে পড়েছিস্ নাকি? বুড়ো কুকুর।" ত্রিল অন্ধকারে চটের ছাতে ঝুঁকে পড়ে অন্যদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল। মাঝি চোখ তুলে তাকে দেখল তারপর শক্ত হাতে পাল ধরল।

"এরা ভীষণ নীচ। হাণ্টার ব্যবহার না করলে এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা মুশকিল"—পীটার বলল। ত্রিল রূপো দিয়ে বাঁধানো হাতলওয়ালা হাণ্টার দিয়ে বুড়োর কোমরে খোঁচা দিল।

"তোর নাম কি?"

"আবুল মনসুর, সাহেব।"

"আবুল মনসুর—তুমি যদি চাও, এই হাণ্টার দিয়ে তোমার চামড়া না তুলি তাহলে ভালো করে নৌকো চালাও। বুঝলে?"—ত্রিল বলল।

"জী সাহেব!"

সে আবার পালে ঝুঁকে পড়ল। নৌকো চলছে। দুধারে কলা গাছ। দূর গ্রামের আলো টিম টিম করছে—অন্ধকারে জোনাকির মত। ত্রিল নৌকোর ভেতরে দেখল। আবুল মনসুরের সম্পত্তি মাটির প্রদীপ, চট, নামাজ পড়ার চাটাই, কাঁসার দু'একটা বাসন।

দেওয়ালে হুকো টাঙ্গানো। বৃদ্ধের এই সম্পত্তি পদ্মার বুকে দুলতে থাকে। ব্রিল অবাক হল। বড় অদ্ভুত জায়গা। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস তাকে কেম্ব্রিজের গলি থেকে এই নৌকোয় এনে বসিয়েছে। এই অদ্ভুত সুন্দর বাংলা দেশ, যার নাম বাংলা, যার নাম ইণ্ডিয়া,—ব্রিল দুচোখ বিস্ময় নিয়ে সেই দেশ দেখছে। লণ্ঠন উচিয়ে সে চারিদিকে আরেকবার দেখল। আলোয় তরঙ্গে পথ বনে গেছে। পাশ দিয়ে একটা জাহাজ এগিয়ে গেল। বেদের গাছের পেছনে, বেশ কিছুটা আলস্য নিয়ে চাঁদ উঠছে।

এগারো

ব্রিল হার্বাড মাত্র ২০ বছর বয়সে সাসেক্স কলেজ, কেম্ব্রিজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিল। বাবা পাদরী, আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। কেম্ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য তাকে নিজের গ্রামের জমিদারের সাহায্য নিতে হয়েছিল। স্নাতক হবার পর সে লণ্ডনে মিডিল টেম্পলে ভর্তি হল। পাশেই ফ্লীট ষ্ট্রীটের কফি হাউস ও হোটেলে লেখক—সাংবাদিক-দের আড্ডা। ব্রিল প্রায়ই এই আড্ডায় বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে যোগ দিত। তারা সারা পৃথিবীর নানা খবর, ঘটনা, দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করত। এখানেই তার সঙ্গে পীটার জ্যাকসনের দেখা। পীটার ভারতে ব্যবসা করত এবং কয়েকদিনের জন্য দেশে এসেছে। সে ব্রিলকে প্রায়ই বলত—বাংলা দেশে নীলের চাষ করে আমি হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জন করেছি, নেটিবরা মহামূর্খ; তাদের শাসকরা অত্যন্ত ধনী; কোলকাতা চমৎকার শহর; তুমি এখানে করছ কি? তুমি বুদ্ধিমান —ভারতে গিয়ে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই কুবের হ'তে পারবে। …কি বললে? তুমি কবিতা লিখতে চাও? নাটক লিখতে চাও? উকিলের 'নোবল প্রফেশান' যোগ দিতে চাও? যত সব বাজে কথা। তুমি বুদ্ধিমান। মগজ খাটিয়ে কাজ করলে চার দিনেই

তুমি সেখানে সোনার প্রাসাদ তৈরী করবে। পীটার কিছু দিনের মধ্যেই তাকে তার এক কাকার কাছে নিয়ে গেল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর। ফ্রিল কোলকাতায় চাকরি পেয়ে গেল। একদিন সে টিলবরী থেকে 'ইণ্ডিয়া ম্যান' জাহাজে এক নুতন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। জাহাজ তীর ছেড়ে এগিয়ে চলল। ডোভারের শ্বেত পাথর যখন ক্রমশঃ অদৃশ্য হতে লাগল তখন সে অনুভব করল, সে ব্রিটেন ছেড়ে চলেছে। ব্রিটেনে যেখানে ক্যাণ্টে তার গ্রাম, যেখানে কেমু নদী বয়ে চলেছে, যেখানে গোল্ডস্মিথ আর কুপার, গ্রে আর বার্কের জন্ম; যেখানে হোগার্থ আর গেজবরো এবং রেনালড্‌জ ছবি এঁকেছে, সেই দেশ সে ছেড়ে চলল। ব্রিটেন যেখানে শান্তি আর সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা আর বাংলা দেশ থেকে কুড়িয়ে আনা বৈভবে দেশ সমৃদ্ধ। গরীব আজ বড়লোক। বড়লোক আরও বড়লোক। চারিদিকে শুধু টাকা! টাকা! টাকা! ফ্রিল সাহিত্যের উপাসক। অর্থ তার কাছে অর্থহীন তবুও সে টাকার আকর্ষণে বাংলাদেশে চলেছে। তার মত দরিদ্র শিক্ষার্থীও একদিন বড়লোক হবে। লণ্ডনে তারও বিরাট প্রাসাদ উঠবে; এমনও হতে পারে সে অসভ্য জংলী কোনো হিন্দুস্থানী সরদারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মারা যাবে আর মাদ্রাজ বা মুসৌরীতে তাকে কবর দেওয়া হবে।

ভয়ংকর সমুদ্র। সংসারের বৈচিত্র কত তুচ্ছ। ফ্রিল শিহরণ অনুভব করল এবং ডেক থেকে সরে এল। জাহাজে কত বিচিত্র লোক তার সঙ্গেই চলেছে, কত আশা আর স্বপ্ন নিয়ে এক অজানা দেশের সন্ধানে। প্রত্যেকটি লোক এক একটি আশা নিয়ে চলেছে। তাদের সব সাধ-আহ্লাদ, আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে কি? এর শেষ কোথায়? কোম্পানীর ব্যাপারী, মাদ্রাজের চীফ জাস্টিস; উচ্চ বংশের অবিবাহিতা মেয়ে—এদের সকলের মনেই এক একটি স্বপ্ন। মেয়েরা ভাবছে—হিন্দুস্থানে গিয়ে তাদের বিয়ে হবে। ডিনার টেবিলে জাহাজের কাপ্তান তাদের হায়দার আলীর গল্প শোনাতো। পাটনা এবং ঢাকার নীলের ব্যাপারীরা সব সময় 'মাভয়রা' পান করত

এবং নিজের ব্যবসার কথা নিয়ে মেতে থাকত। সিডনীর সাসেক্স কলেজ, কেম্ব্রিজের শান্ত পরিবেশ থেকে বাইরে বেরোবার পর ব্রিল এই প্রথম বুঝতে পারল, এটাই পৃথিবী।

জাহাজ ম্যাডাগাস্কর পৌঁছেছে। 'পূর্ব' দেশ। কালো গোলামদের দেশ। পূর্ব দেশ ব্রিলের অপেক্ষায়। চীন এবং হিন্দুস্থান এবং ইরান সমবেত স্বরে যেন ডাকছিল—এস ভাই ব্রিল! তোমাকে আমরা স্বাগত জানাই। বাইবেল, বন্দুক আর তলোয়ার নিয়ে এস আর আমাদের চামড়া তুলে নাও। কানপুর ও ঢাকার পুরোনো পাপীরা তাকে সাবধান করে দিল—"মাথা ঠিক রেখে কাজ করলে কিছুদিনের মধ্যেই লাখপতি বনে যাবে।"

"সিরাজুদ্দৌলা কে?" ব্রিল পীটার জ্যাক্‌সনকে জিগ্যেস করল।

"সিরাজুদ্দৌলা?" পীটার মুখ বিকৃত করে বলল— "পরে তোমাকে তার বিষয়ে সব কথা বলব। আমি কাশিমবাজারে ছিলাম। অত্যন্ত বাজে লোক। নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যেমন অবধের বর্তমান নবাব।"

পীটার জ্যাক্‌সন ব্রিলকে লক্ষ্ণৌ ও ফৈজাবাদের শোনা গল্প শোনাতে লাগল। পরে মহীশূর ও আর্কটবাসীদের বর্ণনা দিল। বম্বে পৌঁছতে পৌঁছতে ব্রিল গত দুশো বছরের ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হল ও হিন্দুস্থানের পুরো ইতিহাসের পণ্ডিত বনে গেল। হিন্দুরা এক লাল জিভযুক্ত মূর্তির উপাসনা করে, বিধবাদের জ্যান্ত আগুনে পোড়ায়, খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, গরু, বাঁদর আর সাপকে ঈশ্বর মনে করে। মুসলমানরা অত্যাচারী। মেয়েদের পর্দার ভেতরে পুরে রাখে। পনেরোটা বিয়ে করে। অত্যন্ত অভিমানী আর নিষ্ঠুর জাতি। সংক্ষেপে পীটার জ্যাক্‌সন তার সামনে ভারতের যে চিত্র তুলে ধরল তা শুনে সে অত্যন্ত বিচলিত হল।···নেটিবরা নীচু জাতির লোক। মনুষত্ব বলে কোন কিছু পদার্থ তাদের মধ্যে নেই। বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি নামক একটি সংস্থা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পুরোনো ধ্বংসাবশেষ বের করছে। কি কি সব বিচিত্র ভাষার সন্ধান

তারা পেয়েছে—মন্ত্র-তন্ত্র লেখা পাথর। এসব দেখে আমাদের খোদ কর্তারা বলছে—হিন্দুস্থানও এককালে সভ্য ছিল। পীটার নিজের কথা শেষ করল।

বম্বের বন্দর সামনে।

হিন্দুস্থান!!

জাহাজ বন্দরে থামল। যাত্রীরা এক এক করে নামল। দেড়শ' বছর আগে মোঘল—সীমা কর অধিকারীরা য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে কর নিয়ে তারপর তাদের ভারতের মাটিতে নামতে দিত। এখন এখানে অন্য ব্যাপার। নিজেদের রাজত্ব। তাই যাত্রীরা শিস্ দিতে দিতে, বেপরোয়া হয়ে নামল। কালো লোকেরা তাদের ঘিরে ধরল। দৌড়ে গিয়ে তাদের জিনিসপত্র নামাল। পীটারকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পালকী এসেছিল। খ্রিল তার সঙ্গে পালকী চেপে মালাবার হিলের দিকে চলল।

কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি থেমেছে। ইংরেজদের বাড়ীর ছাদে ফুলের বাহার। পীটার ও খ্রিল যে ভদ্রলোকের অতিথি, তিনি দরজা পর্যন্ত এসে তাদের স্বাগত জানালেন। তারা কাঠের থামওয়ালা বারান্দায় বসে চা খেল। চা পর্ব শেষ হলে খ্রিল নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখল। ঘরের কোণায় এক হাবশী গোলাম অতি তৎপরতার সঙ্গে তার জুতো পালিশ করে চলেছে। ছেলেটিকে অন্যান্য গোলামদের সঙ্গে ম্যাডাগাস্কর থেকে আনা হয়েছে। যতক্ষণ সে ঘরে রইল, খ্রিল অস্বস্তি অনুভব করল।

এক রাতে ডিনারের সময় দু'জন পারসীর সঙ্গে তার পরিচয় করানো হল। এরা জাহাজ কোম্পানীর মালিক। তারা অত্যন্ত সহজভাবে ইংরাজি ভাষায় কথা বলছিল। এ দেশে কত বিচিত্র লোক আছে। খ্রিল অবাক হয়ে ভাবল।

কিছুদিন পরে পীটার জ্যাক্সনের সঙ্গে সে জাহাজ তৈরির কারখানা দেখতে গেল। সুরত! মোঘলদের বন্দর। একশ' বছর আগে এই শহরের জনসংখ্যা লণ্ডন ও প্যারিসের জনসংখ্যার চেয়ে অধিক ছিল। পীটার এখানেই কাজে আটকে গেল। খ্রিল জাহাজের

প্রতীক্ষায় রইল। তাকে একলা যাত্রা করতে হবে। ভারতীয় জীবনে থ্রিল এখন অত্যন্ত।

জাহাজ নোঙ্গর তুলল। কারামণ্ডল তট ছুঁয়ে ছুঁয়ে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। পণ্ডিচেরীতে কয়েকজন ফরাসী জাহাজী এল। তারা ফ্রান্স যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন সাবোর্ণের ছাত্র। সে খুব তাড়াতাড়ি থ্রিলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ছেলেটি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতে এসেছিল। ছেলেটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। কাঁধ উঁচিয়ে উঁচিয়ে সে কথা বলছিল—প্যারিসের কথা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গল্প, ইনক্লাবের বাণী—স্বাধীনতা, সমতা আর বন্ধুত্ব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ। ফ্রান্স জিন্দাবাদ! একই আনন্দ আর উৎসাহ নিয়ে সে কিছুক্ষণ পর নৌকোয় চেপে অন্য জাহাজে চড়বার জন্য অদৃশ্য হল। থ্রিল মনেও করতে পারছে না তার নাম কি! আর ইনক্লাবের ময়দানে তার ভবিষ্যতে কি লেখা আছে! চারিদিকে রক্তপাত ঘটানো হচ্ছে। বাংলায় যুদ্ধ, দক্ষিণে যুদ্ধ, য়ুরোপে নেপোলিয়ন লাফালাফি করছে। সমস্ত য়ুরোপ জ্বলছে। আরও কয়েকবার জ্বলবে। এই আগুনে সাবোর্ণ আর কেম্ব্রিজের ছাত্ররা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। চিরদিনই এরকম হয়ে এসেছে। এবং সে, থ্রিল হার্বাড এখন বে অফ বেঙ্গল হয়ে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে মৃত্যু হিংস্র জন্তুর মত থাবা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে মহীশূরী আর মারাঠা। উত্তরে দাড়িওয়ালা আফগান আর শিখদের তলোয়ার সামনে ঝলসে চলেছে। চারদিকে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা! দিল্লীতেও দুঃখ, মুর্শিদাবাদেও দুঃখ, ফয়জাবাদে বিষাদ। থ্রিল এসব জানেনা। সে এও জানেনা দিল্লীর দ্বিতীয় শাহ আলম এখন চন্দাবাঈয়ের নৃত্য দেখতে মশগুল।···সে এল মাদ্রাজে।

মাদ্রাজে জাহাজ পাঁচ-ছয় দিন থামল। সে নবাব আর্কাটের প্রাসাদ দেখল। সেণ্ট টমাস রোডের ইংরেজদের কয়েকটা দোকান দেখল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে সে ইয়ুরেশিয়ানদের এলাকায় এল।

এখানে এক বাড়ির সিঁড়ির ওপরে সে একটি মেয়েকে দেখল। মেয়েটি—সুন্দরী মিশ্রিত রক্তের সুন্দরী। তাকে দেখে মেয়েটি উদাস হাসি হাসল আর বাড়ির ভেতরে চলে গেল। একটি কালো মেয়ে কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে বাইরে এসে দরজার উপরে বসে পড়ে চাল-ডাল বাছতে লাগল। স্ত্রিলকে দেখে তিন চারটে বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরল। তাদের বাবাও চলে এল। লোকটিকে দেখে এক দরিদ্র ইয়ুরেশিয়ান মনে হয়। "ভেতরে আসবে ?" একটা বাচ্চা ছেলে তাকে জিজ্ঞেস করল। প্রত্যেকেই আশ্চর্য—একজন ইংরেজ কি করে তাদের পাড়ায় এসেছে। বিলেতে স্ত্রিলের সম্প্রদায় বর্ণভেদে প্রচণ্ড বিশ্বাস করে। ভারতেও তারা কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্যের সূত্রপাত করেছিল। মাদ্রাজ ব্ল্যাক টাউন, ইয়ুরেশিয়ান টাউন আর সাদা কলোনীতে বিভক্ত। স্ত্রিল কিন্তু কেম্বিজে অষ্টাদশ শতাব্দীর লিবারেলিজম প্রচারের কাজে নেমে পড়েছিল। কিন্তু কালো ও সাদার পার্থক্য সে বুঝতে পারত। সে দেখল, ভারতে যে সাদারা থাকে, তারা কালোর সম্পর্কে এলে শ্রেণীচ্যুত হয়। স্ত্রিল আবার মেয়েটিকে দেখতে পেল—মেয়েটি এগিয়ে চলেছে। একবার স্ত্রিলকে মুখ ফিরিয়ে দেখে হেসে আবার এগিয়ে চলল। ইয়ুরেশিয়ান মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী। স্ত্রিল ডাকল, "একটু শুনবে!" সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল, "তুমি এখানেই থাক ?"

"তুমি কলকাতা থেকে আসছ ?"

"না, কলকাতা যাচ্ছি। লণ্ডন থেকে এসেছি। এখন আসছি বম্বে থেকে।"

"খুব ঘুরে বেড়াও নাকি ?"

"হ্যাঁ, এখন আরও ঘুরতে হবে। কবে থেকে তুমি এখানে আছ ?"

"চিরদিন থেকে।"

"চিরদিন ? তুমি তো ক্রিশ্চান ?"

"হ্যাঁ, হিন্দুস্থানী খৃস্টান হতে পারে না কি ?" মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—"আমার ঠাকুরদা ইংরেজ ছিলেন—একদম তোমার মত। আমার মা হিন্দুস্থানী। •

পীটার জ্যাক্‌সন তাকে জাহাজে উপদেশ দিয়েছিল, ইয়ুরেশিয়ান-দের সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। গত শতকে আমাদের পূর্বপুরুষরা এদেশে এসে কালো মেয়েদের বিয়ে করে-করে এদেশে একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে। তাদের সন্তান-সন্ততিরা, বংশধররা সব কালো।

"তোমার পিতা জীবিত? কি করে সে?"

"ওই তো, সিঁড়ির ওপরে বসে আছে! মদ বিক্রী করে।"

"এস আমরা এখানে বসি!" ত্রিল সাহস করে একটি বেঞ্চের দিকে সংকেত করল।

মেয়েটি সসংকোচে কালো জালের রুমালে মুখ ঢেকে বেঞ্চে বসল। বেঞ্চ রাস্তার ধারে পাতা। পথটি গির্জাঘরের দিকে গেছে। ত্রিল কথা বলছে;

ত্রিলের কি যে হল। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলল, "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমার সাথে কলকাতা চল!"

"তা কি করে হয়?" মেয়েটি বলল।

"কেন?"

"তুমি উঁচু বংশের ইংরেজ। কয়েকদিন পর তুমি হয়ত আমার সঙ্গে কথাও বলবে না। তোমার মত অনেক সৈন্য মাদ্রাজে আসে।" মেয়েটি উদাস হয়ে একটা গাছের পাতা ছিঁড়ল!

ত্রিলের মনে হল, সে প্রথম নজরেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে। "শোনো"। সে অত্যন্ত ভাবুক হয়ে বলল—"শোনো!" কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না। ত্রিল মেয়েটির নাম জানেনা।

"আমার নাম মারিয়া টেরেজা।"

"মারিয়া টেরেজা! মারিয়া টেরেজা!!"

সেই রাত্রে গভর্ণমেণ্ট হাউসের বল ছেড়ে সে ইয়ুরেশিয়ান শহরে পালিয়ে এল। তার পরের রাতেও…তার পরের রাতেও। চতুর্থ দিন সকালে জাহাজ কলকাতা যাবার জন্য নোঙ্গর তুলল।

কলকাতা রওনা হবার সময় সে বুঝতে পারল কয়েকদিন যাবত সে মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই করেনি। সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে

পারে না। বিয়ে করার কথাও তাকে বলেনি। কিন্তু ইয়ুরেশিয়ান মেয়েটি, তাকে হিন্দু মেয়েদের মত মনে মনে দেবতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যখন সে গির্জাঘরের বাগানে পৌঁছাল দেখল, সেও তার সঙ্গে কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত, ব্রিল সত্যিই ঘাবড়ে গেল।

নিজের সমস্ত পটুতা, কাব্যময় ভাষা ও অভিনয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে মারিয়া টেরেজাকে বিশ্বাস করালো যে কলকাতা পৌঁছেই সে তাকে ডেকে পাঠাবে। এ সব কথা বলার সময় ব্রিলের নিজেকে অত্যন্ত নীচ মনে হল।

এই ছোট, ভাবুক এডভেঞ্চারের পর ব্রিল কলকাতা রওনা হল। বে অফ বেঙ্গলের জলতরঙ্গ দেখতে-দেখতে সে মেয়েটিকে ভুলে গেল।

জাহাজ এখন কলকাতার কাছেই। ডায়মণ্ড হার্বারে পৌঁছে জাহাজ নোঙ্গর ফেলল এবং পাইলটের জন্য অপেক্ষা করল। যাত্রীরা ডকে নেমে এল। তারা এখানে জাহাজ ছেড়ে নৌকোয় উঠল। কামাল একটা ভাড়া করা নৌকোয় উঠল। মাঝিরা হাল ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দরের কোলাহল ছাড়িয়ে নৌকো শান্ত পরিবেশে এগিয়ে চলল। পাশেই অন্যান্য নৌকো এগিয়ে চলেছে। জলের দুপাশে ছোট ছোট গাছ জলে নুয়ে পড়ছে। দূরে জঙ্গলে বাঘ আর শেয়ালের ডাক। মাথার ওপরে মশা ভন্‌-ভন্‌ করছে। ব্রিল চোখ বন্ধ করে—কলকাতার এক কাল্পনিক রূপ দেখছে। বাংলা দেশের মায়াবী চাঁদ নৌকোর সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে। মাঝিরা নিজের ভাষায় গান গাইছে। তাদের সুর অসাধারণ সঙ্গীতময়।

দৃশ্য বদলাচ্ছে। নৌকো গার্ডেনরীচে পৌঁছল। ঘাটে ব্রিল পালকী চড়ল। জনবহুল শহর ছাড়িয়ে পালকী ব্যারাকপুরের দিকে চলল।

ব্যারাকপুরে ইংরেজদের চমৎকার কান্ট্রি হাউস। ডাচ-শ্রীরামপুর ও ফরাসী চন্দননগর পর্যন্ত এই কান্ট্রি হাউস বিস্তৃত। কেল্লার কাছাকাছি সরকারী ইমারত। আলীপুরে বেলভেডিয়ার গভর্ণমেণ্ট

হাউস। সেখানে কিছু বছর আগেই কর্ণওয়ালিশ থাকত।

ছ'মাস পর গ্রিল নিজের বাবাকে লিখল, আমি সেট্‌ল করেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার বাঙালী গোমস্তা আশুতোষ দে খুব ভাল ইংরাজী বলে। আমার পদোন্নতি হবে—কিছুদিনের মধ্যেই আমি নগরের উপকণ্ঠে নীলের ব্যবসা শুরু করব। একজন মুসলমান মুন্সীও রেখেছি। সে আমাকে ফরাসী ও বাংলা পড়ায়।

কয়েক বছর কেটে গেছে। গ্রিল এখন হাই সোসাইটির মানুষ। তার পাল্কীবাহক খাকি ড্রেস পরে সব সময় তৈরি। দেহ-রক্ষক রূপালী হাতোল ওয়ালা ছড়ি নিয়ে সদা তৎপর। রাত্রে তার পালকী যেদিকে যায়, মশাল নিয়ে একদল লোক অন্ধকারে আলো করে চলে। খানসামা, বাবুর্চী ড্রইংরুম দেখাশোনা করে। রূপোর হুকো নিয়ে চাকর এদিকে-ওদিকে দৌড়োয়। অফিসে তার এক ইয়ুরেশিয়ান ক্লার্ক—নাম, রোল্‌ফ জোসেফ। গ্রিল তাকে সহ্য করতে পারে না। অফিসে তার আরামের জন্য এক বাঙ্গালী সরকার, অগুনতি চাকর, চাপরাশী ও হরকরা। একলা গ্রিল এশ্‌লে এবং তার ব্যক্তিগত স্টাফ—চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক তার সুখ-স্বাচ্ছন্দের খবর রাখছে। এ ছাড়া তার মালী, ঘাস কাটার সহিস, ভিস্তী, দারোয়ান, চৌকিদার আছে। ব্যক্তিগত বজরা ও মাঝি। শ্বেত রঙের বিরাট প্রাসাদে গ্রিল এশ্‌লের সাম্রাজ্য—যার নিরঙ্কুশ শাসক গ্রিল এশ্‌লে। সে এদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ইচ্ছে করলে সবাইকে উল্টো ঝুলিয়ে বেত্রাঘাত করতে পারে। গ্রিল করেছেও। এ সেই গ্রিল যে কয়েক বছর আগে কেম্বি্‌জের গলিতে বিলিয়াম ব্ল্যাকের বই নিয়ে কবিতা লিখবার কথা ভাবত এবং কোনো পাব এ গিয়ে কয়েক পেন্‌সের আলু কিনে খেত।

সকাল সাতটার সময় দারোয়ান তার প্রাসাদের হলের দরজা খুলতো। তার সরকার ও চাপরাশী কাগজপত্র নিয়ে সেলাম করতে করতে বেডরুমে আসত। নাপিত তার দাড়ি কামিয়ে দিত। উইগ পরে, জ্যাকেট পরে সে খাবার ঘরের দিকে এগোতো। সেখানে চা এবং ধূমপান। ব্যবসা এবং সরকারী কাজে যারা সেলাম জানাতে

আসত তারা কিছু দূরে সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। গ্রিল তাদের দিকে তাকাতও না। শুধু আদেশ দিয়ে যেত। প্রায় দশটার সময় এই জলুস পালকীতে গ্রিলকে নিয়ে গ্রিলের অফিসের দিকে এগোতো। চারটের সময় গ্রিল অফিস থেকে ফিরে কলকাতার কায়দা মাফিক সাতটা-আটটা পর্যন্ত ঘুমোতো। তারপর জামাকাপড় পরে লেডিজদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোতো। সোস্যাল কলে যেত, রেসকোর্স ঘুরে বেড়াতো বা কখনো কোথাও ডিনার খেতে যেত। ব্যবসায় তার প্রচুর লাভ। গভর্ণর জেনারেল তার ওপর ভীষণ খুশী। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, গ্রিলকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে কোনো শহরে অথবা লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে পাঠানো হবে। বলরুমে নাচতে-নাচতে অবিবাহিতা মেয়েরা ভাবত সত্যিই সে ভাগ্যবতী যাকে এই ধনী এবং হ্যাণ্ডস্যাম গ্রিল এশ্‌লে বিয়ে করবে।

কিন্তু মিস্ প্যামেলা অথবা মিস্ স্নেহলতাকে বিয়ে না করে এই অসাধারণ বুদ্ধিমান গ্রিল এশ্‌লে যা করল তা ইংরেজ 'নবাব'দের মধ্যে বহুল প্রচারিত। অর্থাৎ গ্রিল এশ্‌লে একটি নেটিব মেয়েকে রক্ষিতা হিসেবে বাড়ীতে তুলে আনল।

ইংরেজরা 'নবাব'দের নিয়ে ইংল্যাণ্ডে খুব হাসাহাসি করত। ওখানকার জমিদাররা এদের সমগোষ্ঠীভুক্ত বলে স্বীকার করত না। গতকাল পর্যন্ত এরা লণ্ডন শহরে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে তারা যেন আলাউদ্দীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে, রাতারাতি বড়লোক হয়েছে। গ্রিল এখন এদেরই একজন। পাটনা, ঢাকা, কাশিমবাজার, বালাসোর আর হুগলীর ব্যাপারী মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, গোয়ালিয়র এবং দিল্লীর দরবারের কূটনীতিজ্ঞ, বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যার কালেক্টর; মিলিটারি অফিসার—যারা আবধে ছাওনি বানিয়েছে, এরা সবাই গ্রিলের বন্ধু। গ্রিল এদের ভাল বোঝে। পলাশী যুদ্ধের পর লক্ষ্মী ভারতবাসীদের ত্যাগ করে এদের কাছেই আশ্রিতা। শোরা আর নীল ব্যবসায়ীরা আজ কোটিপতি। নবাবদের মত জীবনযাপন করা তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করত।

হিন্দুস্থানী নবাব, রাজা এবং ইংরেজ উচ্চ সম্প্রদায়রা নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ করেছিল। এই আপোষের ফলে এক 'সুসংস্কৃত' সম্প্রদায়ের জন্ম। অত্যন্ত কম বয়সে ইংরেজরা বিলেত থেকে এ দেশে আসত এবং দ্রুত নিজের ভাগ্য বদলে ফেলত। জেলায় কলেকটারের পদ পাবার পর তারা সেখানকার জমিদারের সঙ্গে ভাব করত। এই ইংরেজ সম্প্রদায় এখন কোটিপতি হয়েই ক্ষান্ত নয়—এরা দেশী 'নবাব' বলে নিজেকে জাহির করতে চায় এবং হারেমে দশ-পনেরোটা দেশী মেয়ে মানুষ রাখতে চায়।

ব্রিলও সুজাতা দেবীকে নিজের কুঠিতে তুলে 'নবাব' বনে গেল। সুজাতার চোখ দুটি ব্রিলকে মাতাল করে। ঘন, কালো লম্বা চুল তার। বাড়ী ঢাকায়। তার বাবা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছিল কেননা ঢাকায় প্রায় দুর্ভিক্ষ। সুজাতারা সাত বোন। তিনটে বাল বিধবা। চারটের বিয়ে হয়নি। তার এক ভাই শ্যামাচরণ, কলকাতায় এক গুদামে চাকরি পেয়ে, বোনদের কলকাতা ডেকে পাঠাল। গুদামের মালিকের নাম ব্রিল সাহেব।

ব্রিল এখনো বালক কিন্তু কলকাতায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। একদিন সুজাতা পূজো করবার জন্য কালীঘাট যাচ্ছিল, ব্রিল তাকে দেখল। ব্রিল সাহেব অত্যন্ত রোমান্টিক স্বভাবের—সবাই জানে। সুজাতার ভাই দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে ভাবছিল শ্রীরামপুরে গিয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম অবলম্বন করবে—এমন সময় ব্রিল সাহেবের 'সরকার' এসে বলল—সাহেব তোমাকে ডেকেছে। এবং তার পরের দিন সুজাতাকে সাহেবের কুঠিতে পৌঁছে দেওয়া হল। শ্যামাচরণের পরিবার অনাহারের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ব্রিল সাহেব সুজাতাকে বিয়ে করল না কিন্তু রূপবতী সুজাতা তাতেই খুশী। অত্যন্ত আনন্দে সে ব্রিল সাহেবের কুঠিতে প্রায় রাজত্ব করে, চাকর-বাকরদের শাসন করে। এমন অনেক দেশী মেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে থাকত। তাদের ছেলেদের বিলেত পাঠানো হত এবং যত দিন তাদের বাপ বেঁচে থাকত ততোদিন তারা সুখেই থাকত।

ব্রিল জানত, তার মৃত্যুর পর সুজাতার সন্তানদের ভাগ্যে কি

আছে। তাদের মাদ্রাজ অথবা কলকাতার অনাথালয়ে ভর্তি করা হবে। বড় হলে তারা ভাল চাকরিও পাবে না। তারা রাল্‌ফের মত ক্লার্ক হবে অথবা কোনো রেজিমেন্টে ভর্তি হয়ে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে। তার মেয়ে কোনো ইংরেজ নবাবজাদীর আয়া হবে অথবা কোনো মিলিটারি অফিসারের রক্ষিতা। এখন ত্রিল বুঝতে পারল, ইয়ুরেশিয়ান সম্প্রদায় একটা কি ভীষণ ট্র্যাজেডি। তার মারিয়া টেরেজার কথা মনে পড়ল যাকে সে নিষ্ঠুরভাবে মাদ্রাজে ছেড়ে এসেছে। এ সব ভেবে ত্রিল বেদনা অনুভব করল। সে কি মিস্ সিন্থিয়াকে বিয়ে করবে? কিন্তু সুজাতা যখন তাকে খুব আদর করে ডাকত, সে সব কিছু ভুলে যেত. পালকী চড়ে রেসকোর্সের দিকে চলে যেত। তার ব্যস্ত জীবন; সারা বাংলা, বিহার তার পদতলে। বাংলার সমস্ত জলপথ তারই জন্য খোলা। তার নৌকো ধলেশ্বরী, হরিমঙ্গল, কর্ণফুলী, মধুমতী আর শিবসুন্দরীব জলে নীল বোঝাই হয়ে ভাসত। ঢাকার মোঘলদের বৈভবশালী নবাবরা তার হাতে!

রূপো দিয়ে মোড়া ছড়ি বাড়িয়ে বুড়োর কোমরে খোঁচা দিয়ে সে বলল—"আবুল মনসুর! তুমি যদি চাও, এই হাণ্টার দিয়ে তোমার চামড়া না তুলি, তাহলে ঠিকভাবে হাল ধর।"

বুড়ো প্রাণপণে হাল সামলে ধরল। কত নিষ্ঠুর এরা। চারিদিকে আকাল, দুর্ভিক্ষ কিন্তু এরা বেহায়ার মত বেঁচে আছে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে কত লোক অনাহারে মরল—কিন্তু এদের কিছুই হল না। সে ঘড়ি দেখল। রাত নটা। আজ রাতেই গিরিশচন্দ্র রায়ের জমিদারীতে পৌঁছতে হবে তাকে। কলকাতার শাসনে অনেক পরিবর্তন হতে চলেছে। দু'একদিনের মধ্যেই স্যার জন শোর চলে যাবেন এবং নতুন গভর্ণর জেনারেল আসবেন। এখান থেকে ফিরে সে গভর্ণমেণ্ট হাউসে যাবে। "আজ কত তারিখ?" সে পীটারকে জিগ্যেস করল। পীটার নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ত্রিল লণ্ঠন উঁচু

করে বিলিয়াম হিকীর বেঙ্গল গেজেট দেখল। গতকালের সংবাদপত্র।

৮ জুন, ১৭৯৮। ব্রিল চমকে উঠল। হিন্দুস্থানে আজ তার পাঁচ বছর পূর্ণ হল। এই পাঁচ বছরে সে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। নীলের ব্যবসায় ক্রমাগত লাভ হচ্ছে। গুজরাটের নীলের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে। তার জায়গায় কোম্পানীর ইংরেজ-প্ল্যাণ্টারস্ দিল্লী থেকে বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলার কৃষক ইংরেজ প্ল্যাণ্টারস্‌দের কাছ থেকে ধার নিয়ে নীলের চাষ করত কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে তাদের ওপরে নানা রকম অত্যাচার করা হত।

সারাদিন নীলের খেতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বাংলার কৃষক আবুল মনসুর কামালউদ্দীন নিজের নূতন মনিবকে নিয়ে নৌকোয় ওপারে নিয়ে চলেছে। চাঁদ পদ্মার জলে ভাসছে। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। তীরের কলাগাছের ঝোপে শেয়াল ডাকছে।

অত্যন্ত ভয়াবহ রাত।

বারো

রাধেচরণ লণ্ঠন উঁচু করে দূরে জলের বুকে একটা নৌকো দেখল। দূরে প্রায় দিগন্তের কাছে একটা নৌকা, ঘাটের দিকেই এগিয়ে আসছে। লণ্ঠন নীচে রেখে নদীর ধারে বসে পড়ল। পাশে বাঁশ বাগানে তার ছোট্ট বাড়ি। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। কাছেই চৌপালে বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে। শুধু গিরীশচন্দ্র রায়ের প্রাসাদ থেকে বাজনার সুর মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। শোনা গিয়েছিল, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজীরা এখানে এসেছে। রাজা সাহেব, লাটসাহেবের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তাই নাচ-গানের আয়োজন। কলকাতা থেকে সাহেবরা ফুর্তি করতে আসছে এখানে। চৌপালে এখন আশ্চর্য নীরবতা।

"কথা বল দাদা!" প্রমোদ কলকের ছাঁই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে উদাসভাবে পাশে বসা রাধেচরণকে বলল।

রাধেচরণ মৌন, তিনি ঘাটের দিকে তাকিয়ে। বাঁশের ঝোপ দুলছে। এমনিই রাতে মাথায় চন্দনের টিপ পরে, হাতে বাঁশী নিয়ে, গেরুয়া বস্ত্র পরে সত্যপীর সত্যনারায়ণ[১] পদ্মার ধারে বেরিয়ে পড়েন। আমার সঙ্গে যদি সত্যনারায়ণের দেখা হয় তা হলে আমি তাঁকে জিগ্যেস করব···কি জিগ্যেস করব? রাধেচরণ উবু হয়ে বসে-বসে ভাবল।

অনেক শৃংখল ঝনঝনিয়ে উঠল। রাধেশ্যাম মুখ তুলে দেখল—সামনে সত্যপীর না, কিছু ফকীর দাঁড়িয়ে আছে। তারা বাঁশ ঝাড় থেকে বেরিয়ে রাধেচরণের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল এবং তার দরজায় দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলতে লাগল।

রাধেচরণ অপ্রস্তুত হয়ে তাদের দেখল। সত্যনারায়ণের ভিখিরী তার দরজায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তাকে দেবার মত কিছুই নেই। শত শত বছর ধরে এই ফকীররা গান গাইতে গাইতে ভিক্ষে চেয়েছে। গ্রামের হিন্দু মহিলারা এদের ঝুলিতে চাল, আটা ফেলেছে—আশীর্বাদ নিয়েছে। গত বছর সুজাতা ভিক্ষা দিতে এসেছিল। তাকে দেখে তারা বলেছিল—"মেয়েটি পদ্মিনী, ভাগ্যবতী।"

এদের গান শুনে সুজাতার মা বাইরে এসেছিল। তাদের কলসী খালি। ফকীরদের দান করার মত কিছু নেই তার কাছে। এই সত্যপীর, মাণিকপীর, লক্ষ্মী, চণ্ডী এই সমস্ত দেব-দেবীর উপরে সে ভীষণ চটে গেল। সবাই ধোকা দেয়—সব দেব-দেবী। শাড়ীর আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছল আর চুপচাপ ফকীরদের দেখতে লাগল।

"সুজাতা কোথায়?" তাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করল।

"কলিকাতায়" রাধেচরণের স্ত্রী আস্তে আস্তে উত্তর দিল। "তার—তার বিয়ে হয়ে গেছে।" সে বলল না যে সুজাতা লজ্জা ত্যাগ করে ফিরিঙ্গির কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছে।

"আমাদের জামাই কি করে?"

"কলকাতায় চাকরি করে।" শান্ত স্বরে সুজাতার মা বলল। সে বলতে পারল না যে সুজাতা একজন ইংরেজ শাসকের কুঠিতে রক্ষিতা।

১. সুফী দেবতা, যিনি মুসলমানদের জন্য সত্যপীর ও হিন্দুদের জন্য সত্যনারায়ণ।

"চমৎকার!" ফকীর আশীর্বাদ দিতে দিতে এগিয়ে গেল। তারা সব জায়গায় একই কথা শুনছে। আজকাল—"দান করার মত কিছুই নেই আমাদের কাছে!" দুর্ভিক্ষ তাদেরও গা সওয়া হয়ে গেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচণ্ড লাভের ফলে বাংলা দেশে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয়। ফিরিঙ্গীর রাজধানী কলকাতার বুকে মানুষের মৃত দেহ ছেয়ে গিয়েছিল। আজ তিরিশ বছর পরেও সে একই অবস্থা। এখনো গ্রামে লোক না খেতে পেয়ে মরছে।

"দাঁড়াও!" সুজাতার মা বলল—আমি প্রফুল্লকে হাটে পাঠিয়েছি। ও হয়ত কিছু নিয়ে আসবে।" কিন্তু ফকীররা আশীর্বাদ দিতে দিতে উদাস পায়ে এগিয়ে গেল।

প্রফুল্ল হাট থেকে বাড়ী ফিরল না। চৌপালে গিয়ে বসল। সে গত তিন দিন ধরে একটু তেল খুঁজে মরছে। পায়নি। আকাশ ছোঁয়া দামে তেল বিক্রী হচ্ছে। নুন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। চাল বাজার থেকে উধাও। সুপুরি আর চাল, তামাক আর নুন—সব কিছুই কোম্পানীর লোকদের হাতে। নদীর বুকে নৌকা বোঝাই তাদের মাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। কিন্তু বাজারে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া গেলেও আকাশ ছোঁয়া দাম। চৌপালে সাত-আট জন লোক এসে বসল। গল্প শুরু হল।

"মামুদ দাদা, তুমিও ঢাকা থেকে আসছ?" প্রমোদ বসু জিগ্যেস করল।

"হ্যা, আমি নজির ও আরও অনেকে। এখন ওখানে অন্ন জোটে না। কাপড় বোনার কাজ করে না খেতে পেয়ে মরছি। এবার থেকে আমরাও লাঙ্গল ধরব। তোমার রাজা সাহেব আমাদের কাজ দেবেন?" মামুদ উল হক নিজের হাত তার কাছে মেলে ধরল। হাতের সব কটা আঙ্গুল শক্ত।

"জানি না।" প্রমোদ আনমনা ভাবে উত্তর দিল। তার এসব আর ভাল লাগে না। শহর থেকে লোকেরা গ্রামে উপছে পড়ছে। গ্রামে জমি কম। জন সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কল-কারখানার দেশ হিন্দুস্থান এখন বিশুদ্ধ কৃষি-প্রধান দেশে

পরিবর্তিত হচ্ছে। ফসল কম, কর বেশী—প্রায় প্রত্যেক বছর দুর্ভিক্ষ!

"আর কত দেখব!" রাধেচরণ চৌপালের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবল কর্ণওয়ালিশের কানুন একেবারে কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। তিন-চার জন যুবক তার কাছে এসে বসল।

দাদা, তোমাদের নবাবদের সময়ও কি এরকমই ছিল?"

আশুতোষের প্রশ্ন।

"কি?"

এই সব—অকাল, দুর্ভিক্ষ, লুট-পাট।"

দুজন হিন্দু বুড়ো বসে বসে হুঁকো টানছিল আর ধোঁয়াটে দৃষ্টি দিয়ে এদের দেখছিল। এরা বক্সারের যুদ্ধে লড়েছিল। গ্রামে এরকম অনেক বুড়ো এখনো বেঁচে যারা সারা দিন মোঘল আর নবাবদের যুগের কথা বলত আর কাঁদত।

"এমন দিন আসছে যখন আমাদের মেয়েরা পর্দা ছেড়ে বাড়ির বাইরে বেরোবে। আমাদের ছেলেরা অনাহারে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে। আমাদের বাদশাহের মুকুট মাটিতে গড়াগড়ি খাবে। মহাভারতে লেখা আছে বৃদ্ধ ধনগোপাল মজুমদার বলতে আরম্ভ করল।"

"আরে, মহাভারতের কথা ছাড় দাদা!" প্রফুল্ল রেগে গেল। এই পক্ক কেশ বৃদ্ধদের নিয়ে আর পারা যায় না। কথায় কথায় সিরাজুদ্দৌলার উদাহরণ দেবে আর হা-হুতাশ করবে।" পুরোনো দিনের কথা বলে কোনো লাভ নেই!"

সে বলল—"কলকাতা চল যেখানে শ্যামদা গেছে।" শ্যাম রাধেচরণের ছেলে যে গ্রিল সাহেবের গুদামে চাকরি করে।—"আরে লাট সাহেবের চাকরি কর। সিরাজ-এর যুগ আর নেই!"

রাধেচরণ সব শুনলেন। প্রফুল্ল আজকাল মাড়োয়ারীদের মত কথা বলে। তিনি মাড়োয়ারীদের ঘৃণা করেন। রাধেচরণ সেই কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যারা ফারসী শিখে মোঘল সরকারের কাজ করতেন এবং বাকি সময় পুজো ইত্যাদিতে কাটাতেন। ইদানিং কলকাতায়

মাড়োয়ারীদের এক নূতন মধ্যমবর্গ তৈরী হয়েছে যারা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করে, স্থানীয় লোক ও কোম্পানীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বড়লোক হয়ে চলেছে। এরা বাংলার নূতন বেনে সম্প্রদায়। জোতদার ও কৃষকের মধ্যস্থিত এই নব-পুঁজিপতি সম্প্রদায় ইংরেজদের মিত্র ও ডান হাত।

"লাট সাহেবের চাকরি?" ধনগোপাল উত্তেজিত। সে একটু কেশে নিয়ে বলল। তার দাড়ি ঈষৎ কাঁপছে। "লাট সাহেব!" সে আবার বলল…"আমাদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? আমাদের বাদশাহ এখনো দিল্লীতে—সে তোমার লাটসাহেবকে ঠিক পথে আনতে পারে।"

"তোমার বাদশাহ আজ অন্ধ, গোপাল দাদা!" প্রফুল্ল হাসিতে ফেটে পড়ল—"তোমার বাদশাহ প্রথমেই দেওয়ানী ক্লাইভের হাতে কেন তুলে দিল?" প্রফুল্ল বিষাদ হাসি হাসল।

দুই বুড়ো হাটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল। এই ছোঁড়াদের কিছু বোঝানো বৃথা। এরা বিশ্বাসই করবে না যে বাদশাহ স্বেচ্ছায় ক্লাইভের হাতে দেওয়ানী তুলে দেয়নি, ক্লাইভ কেড়ে নিয়েছে। এখনএই অভাগা বাংলার ছেলেদের কে কিভাবে বোঝাবে যে, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশ চিরদিন এরকম ছিল না। এই বাংলা হিন্দুস্থানের কৃষি-প্রধান সুবা ছিল। বাংলাকে 'হিন্দির তাজ' বলা হত। তখন ইংরাজেরা ভারতে আসর জমিয়ে বসে নি। দেশেব তৈরী জিনিসের ওপর কর ধার্য করা হত না। রাধেচরণের চোখের সামনে একটু একটু করে সব বদলেছে। কিছু দিন পূর্বে ঢাকার কালেকটর এখানে এসে দরবার করছিল। সে রাধেচরণকে বলেছিল যে আমরা তোমাদের নবাবদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এসব নূতন f ‌ ব করছি। মুসলমান নবাবরা তোমাদের পথে বসিয়েছে।

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ সাহেব। নবাবরা কখনো প্রজাকে এইভাবে শোষণ করেনি। আমার পূর্ব পুরুষরা চিরদিন নবাবদের সঙ্গে থেকে শাসন ব্যবস্থায় সাহায্য করেছে। আমি সব কিছু নিজের চোখে দেখেছি। আজ আমি গঙ্গার ধারে এক কুঁড়ে ঘরে থাকলে কি হবে!

আমি কি সব ভুলে গেছি? মিথ্যে কথা বোলো না সাহেব। তুমি…।" রাধেচরণের সর্বাঙ্গ রাগে থরথর করে কাঁপছিল। চাপরাশীরা তাকে বাইরে বের করে দিল। সেইদিন সেই দরবারে এক ইংরেজ মিশনারী উপস্থিত ছিল। সে যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিল। এই কথোপকথন শুনে নিরপেক্ষভাবে সে লিখল— "বাংলার হিন্দু, মুসলমান নবাবদের ঘৃণা করে। মুসলমানরা হিন্দুর রক্ত পিপাসু। দেশে একতা নেই। এই দেশকে একটা-দেশ বলে ভাবাই যায় না।"

রাধেচরণ নদীর ধারে বসে রইলেন। নৌকো তার সামনে দিয়ে চলেছে। নৌকোয় এক সুপুরুষ ইংরাজ বসে। তার উইগ ও তলোয়ার চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। মনসুর দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড় বাইছে।

রাধেচরণ চোখ বন্ধ করল। নবাব আলীবর্দী তখন মৃত্যু শয্যায়। যুবক সিরাজকে বলেছিলেন—"ইংরেজরা দেশের অর্থ ও মাটি লুট করতে এসেছে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী। এদের কেল্লা ও সৈন্য কোনোমতেই সংগ্রহ করতে দিও না। দেশ রসাতলে যাবে।"

সেই সময় চব্বিশ বছরের সিরাজ মুর্শিদাবাদে। ফিরিঙ্গিরা তাকে অপমানিত করবার জন্য কাশিমবাজারে ব্যবসা করতে দিত না। তারা কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের কর থেকে রেহাই দিয়েছিল কিন্তু নবাবের এলাকা থেকে আসা মালের ওপরে খুব বেশী রকম মাশুল ধার্য করত। কলকাতার পতনের পরও সিরাজ ইংরেজদের প্রতিজ্ঞাপত্রে বিশ্বাস করে তাদের ক্ষমা করেছিল। রাধেচরণের পিতা এই যুদ্ধে সিরাজের সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন। ইংরেজরা হুগলীতে মারামারি করল। সিরাজ তাদের লিখল—"তোমরা আমার প্রজার ওপর অত্যাচার করেছ। তোমরা নিজেকে খ্রীস্টান বল। এখনো যদি কথা দাও, তোমরা স্রেফ ব্যবসায়ীদের মত এদেশে থাকবে, তাহলে তোমাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।"

সিরাজ আরও লিখল—"মারাঠাদের বাইবেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু এরা কথার খেলাপ করেনি। কিন্তু তোমরা, যারা

খোদা আর যীশুর নাম করে শপথ নাও—প্রত্যেকবার সেই শপথ ভঙ্গ কর!"

এডমিরল ওয়াট্সন উত্তর দিয়েছিল—"তোমার দেশে আমি এমন আগুন ছড়াব যে গঙ্গার সমস্ত জল তা নেভাতে সক্ষম হবে না!" হঠাৎ মশালের আলোয় বুড়ীগঙ্গার জল ঝলমল করে উঠল।... সাহেবের নৌকো ঘাটে পৌঁছেছে। রাজা গিরীশচন্দ্র রায় ও তাঁর সাকরেদরা ঘাটে তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছেন। রাধেচরণ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা ওঠালো। তার চোখ আলো সহ্য করতে পারল না। সে উঠল, চাদর মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

তের

পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

ঢাকার কারখানায় শেয়াল ডাকছে। হিন্দুস্থানী তাঁতীদের হাড় ভারতের মাঠে-ময়দানে রোদে চক্ চক্ করছে। একদা ক্লাইভের লণ্ডনের চেয়েও সমৃদ্ধ মুর্শিদাবাদ আজ জনশূন্য। কলকাতা এখন ইংরেজদের ক্রীড়াভূমি। আলীপুর রোডে স্রিল হার্বাড এশ্‌লের প্রাসাদ সগর্বে দাঁড়িয়ে। পঞ্চাশ বছরের স্রিল হার্বাড এশ্‌লে; ধূর্ত, জন কোম্পানীর স্তম্ভ অবধের রাজার ইয়ার এখন শিকারী কুকুরকে "হ্যালো-হ্যালো" করবার পর সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোবার কথা ভাবছে। তার চিকিৎসক তাকে সাবধান করে দিয়েছে—সে যেন কম পরিশ্রম করে, মদ্যপান একদম কমিয়ে দেয় এবং নিয়মিত সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোয়। নিয়ম মেনে না চললে মৃত্যু অনিবার্য। চিকিৎসকের কথা শুনে তার হাসি পায়। সে অবশ্য বিশ্বাস করে, সে অত্যন্ত সাধারণ লোক। সাধারণ অথচ সফল, ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছবার পরই যাদের চারিপাশে বৈদ্য এবং চিকিৎসকরা ভিড় করে। সে দেখল কয়েকজন কর্মচারী তার দিকেই আসছে। নিজের চেহারায় সে বড় সাহেবের গাম্ভীর্য নিয়ে এল। পত্রবাহক গভর্ণমেণ্ট হাউস

থেকে আসছে। ত্রিল হার্বাড কিছু চিঠি লক্ষ্ণৌ পাঠাতে চায়। বাংলাদেশের অবস্থা ভাল নয়। বিদ্রোহী মৌলবীদের নেতৃত্বে উপদ্রব করছিল জেলার কিছু মুসলমান কৃষক। অবধের বাদশাহের কাছে এই কাগজপত্র পাঠানো প্রয়োজন। বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করবার জন্য তাকে নদীয়া যেতে হবে। নদীয়া···গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে আগত সরকারী চিঠিতে এই নাম পড়ে তার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। নাম এবং শব্দ বড় বিচিত্র বস্তু! প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে কোনো না কোনো জিনিসের সম্বন্ধ আছে। সারা পৃথিবী তাকে কোনো গল্প বা কাহিনী শোনাবার জন্য প্রস্তুত। নিজের গল্প সে কাকে শোনাবে?

চিঠিতে স্বাক্ষর করে সে বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আকাশে কালো মেঘ। রাস্তার ওপর দিয়ে একটা শব নিয়ে 'হরি বোল! হরি বোল!' ধ্বনি দিতে দিতে কয়েকজন কালো ও মৃতপ্রায় লোক শ্মশানের দিকে প্রায় ছুটে চলেছে।

ত্রিল একজনকে জিগ্যেস করল—

"কার শব নিয়ে যাচ্ছ?"

"ঢাকার রাধেচরণবাবুর।"

ত্রিল চমকে উঠল। সুজাতার বাবার নাম রাধেচরণ।

সুজাতা কে?

সংসারে হাজার-হাজার রাধেচরণ আছে। সুজাতার বাবাকে সে কখনো দেখেনি। শুনেছিল, নিজের ছেলেকে এক পাগলপ্রায় বৃদ্ধ গ্রাম থেকে দেখতে আসত মাঝে মাঝে।

ত্রিল টুপি খুলে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে রইল। শব বাহকরা আশ্চর্য হয়ে ভাবল, বাঙ্গালীদের লাথি-জুতো মারা যে লোকটার স্বভাব, সেই সাহেব একজন মৃত বাঙ্গালীকে সম্মান দেখাচ্ছে কেন?

বেচারা রাধেচরণবাবু! কিছুদিন বেঁচে থেকে তিনি যদি নিজের এই সম্মান দেখে যেতেন!

শবানুগামীরা এগিয়ে গেল। 'হরি বোল! হরি বোল!' ধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পাল্কী বাহক জিজ্ঞেস করল—"সাহেব,

কোনদিকে যাবেন ?”

ত্রিল বসে বলল—“যেদিকে ইচ্ছে, নিয়ে চল !”

সে জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। মৃত্যু কি, তাও সে জানে। পৃথিবীর সব রঙ্গ, সমস্ত রূপই তো তার সামনে! মানুষ কিভাবে বাঁচে, কিভাবে মরে সে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে। এই ধাঁধা কেন? একজন নেটিব কবি লিখেছিল—

গভীর নদী, গভীর এই জল, প্রচণ্ড এর স্রোত,
এই নদী পার হতে চাও তো
প্রথমে মাঝির সঙ্গে দেখা কর—

মাঝি কোথায়? কখন তার সঙ্গে দেখা করার সময়? তার দুঃখ কিসের? আত্মা থেকে থেকে হাহাকার করে কেন? সব আশা-আকাঙ্ক্ষাই তো পূর্ণ হয়েছে! জীবনের সব সাধই তো মিটেছে! কিন্তু এ জীবন কি দিতে পেরেছে? ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে দেখল। এই সুন্দর শহর, টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, সবই তার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে—মানুষ তাকে ভেংচি কাটছে। চৌমাথায় পাল্কী বাহকরা কাঁধ বদল করার জন্য পাল্কী রাখল। সামনে এক পর্তুগীজ মদের দোকান। হুগলীর ব্রিটিশ এবং ইটালীর নাবিকরা হই-হুল্লোড় জুড়ে দিয়েছে। এক মহিলা মাথায় কালো রংয়ের জাল লাগিয়ে মদের দোকানের ভেতরে গেল। ভেতরে কেউ সরবে হার্প বাজাচ্ছে।

“দাঁড়াও। এখানে দাঁড়াও!!”

ত্রিল পাল্কী থেকে নেমে সেই মহিলাটির পেছনে-পেছনে দৌড়াল। এই অত্যন্ত সাধারণ ইয়ুরেশিয়ান মদের দোকানে তাকে দেখলে লোকে হাসাহাসি করবে—সে কথাও তার মনে রইল না।

কাউন্টারের পেছনে এক বৃদ্ধ ইয়োরোপিয়ান বসে। সে ত্রিলকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কোনক্রমে তার মুখ দিয়ে বেরোল—“স্যার…স্যার…।” তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বেরল না।

ত্রিল একনজরে এই বৃদ্ধকে দেখল। সারা পৃথিবীর মদের দোকানের কাউন্টারে বসে থাকা মালিকদের কতো রহস্যময় মনে

হয়। এরা একই সম্প্রদায়ের। চোর, ডাকাত, বদমাস, আওয়ারা, বেশ্যাদের উদাস দুনিয়ায় এদের আনাগোনা।

মহিলাটি একটা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। দুজন ইংরেজ নাবিক দুটো অপূর্ব সুন্দরী ইয়ুরেশিয়ান মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। একটি মেয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। সেই মেয়েটির চেহারায় গ্রিল নিজের চোখ দেখতে পেল। সে চমকে উঠল। "কোথায় চলেছ গ্রিল সাহেব?" সেই মহিলাটি, যার পেছনে পেছনে গ্রিল ভেতরে এসেছিল—হঠাৎ তার সামনে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল। তার কানের দুল ভীষণভাবে দুলছে। দরজার চৌখাটে সে দাঁড়িয়ে গ্রিলকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। "গ্রিল সাহেব! নিজের মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে না! তুমি আমাকে কলকাতায় ডাকবে বলে ছিলে! গত পঁচিশ বছর ধরে আমি তোমার ডাকের আশায় বসে আছি! মেয়েটির বয়স যখন চার বছর, আমি তাকে কোলে করে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসি। তোমার লোকেরা আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। আমি কি করি! আমার একটা চিঠির উত্তরওতো তুমি দাওনি! তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমরা কিভাবে বেঁচে থাকি! দেখে নাও আমরা কি ভাবে বেঁচে থাকি।"

"সাহেব, তুমি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের বিরাট অফিসার। কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দাও আমার জন্য। শুনেছি নেটিব মেয়েদের তুমি অনেক সাহায্য কর। আমি তো এক রকম তোমার স্বজাতিই।"

গ্রিল ঘামছে মনে হচ্ছে, এক্ষুনি তার হৃদযন্ত্র থেমে যাবে এবং সে সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। সামনে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী চলে গেল। গাড়ীর মধ্যে 'ক্যালক্যাটা ক্রনিকল'-এর সাংবাদিক বসে। সাংবাদিক দেখে তার অবস্থা আরও শোচনীয়। তার চেহারা দেখে তার চাকর দৌড়ে এল—"সাহেব, আপনার শরীর ভাল নেই। বাড়ী চলুন।"

মারিয়া টেরেজা কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

"হুজুর বাড়ী যাবেন ?" বাহক জিগ্যেস করল।

ঘর ? বাড়ী ? তার বাড়ী কোথায় ? "না, বাগান বাড়ী চল।" সে রেগে বলল। বাগান বাড়ী পৌঁছে সে ভাববে, তার কী করণীয়। পাল্কী চলেছে।

"জলদি—আরও জলদি !"

ব্রিলের চোখের সামনে তার সারা জীবন ছবির মত ভেসে উঠছে। তার ভয় লাগছে। জীবন বেলুনের মত, সে নিজে তার মধ্যে বন্দী, একলা। তার চারপাশে রঙিন ছবি। জীবনের এই ছবিগুলো পীড়া দেয়—আনন্দ দেয়না। গভর্ণমেণ্ট হাউসের সঙ্গী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সী, এশিয়াটিক সোসাইটীর গবেষক, অবধের কবি ও শিল্পী, এমন কি লক্ষ্ণৌর চম্পাবাঈ এরা সকলে মিলেও তার আত্মার দুঃখ দূর করতে পারবে না।

তার আত্মার পীড়া কিসের জন্য ? মেয়েদের জন্য ? কখনো না। মেয়েরা কখনো তাকে বিচলিত করেনা। সফল, সন্তুষ্ট মানুষদের জীবনের একটা দিক মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। তাদের প্রেম, তাদের অসফলতা, কামনা, হর্ষ, বিষাদ—একটি মাত্র লেবেলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেই লেবেল "মেয়ে"। ব্রিল এশ্লে, যে প্রথমবার এক কবির দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীকে দেখেছে—সে এখন একজন কৃতি পুরুষ, কবি নয়। তার আত্মার পীড়ার আর একটা কারণ—সে কাউকে ভালবাসতে পারেনি—সেই দেশকেও না, যে সমস্ত সম্পদ তার পায়ে ঢেলে দিয়েছে ; সেই মেয়েদের কেউনা, যারা বিভিন্ন সময়ে তার সান্নিধ্যে এসেছে। ব্রিল এশ্লে এই পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করেছে ঠিকই কিন্তু পৃথিবীকে কিছুই দিতে পারেনি। সেই সময় যদি ধর্মের প্রাধান্য থাকত—সে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে তুলে ধরত। কিন্তু সেই সময় জগৎ বুদ্ধিবাদ, বিজ্ঞান ও ভৌতিক সুখের দিকে এগিয়েছে। চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের মহত্ব বেশী। জীবনের উদ্দেশ্য—আরও বেশী অর্থ, আরও ব্যবসা, শাসন, সত্তা, অধিকার ও উন্নতি।...গার্ডেন হাউসে পৌঁছে সে ডাক দেখল। কিছুক্ষণ ঘুমোলো। হুকোয় টান

দিল ও দ্বিতীয়বার অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। হৃদয় মরুভূমির মত। কিন্তু কর্তব্য, ন্যায় ও নিয়ম সেই ভগ্ন হৃদয়ের ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়ে বেশী যুক্তিসঙ্গত। কর্তব্য তাকে ডেকে চলেছিল— নদীয়া জেলার বিদ্রোহী কৃষকদের শায়েস্তা কর। হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা কানে কানে বলছিল--লক্ষ্ণৌ চলো! দরবারের রঙিন পরিবেশে সব দুঃখের অবসান ঘটাবে।

কোট পরে সে চৌরঙ্গীর দিকে রওনা হল। সেদিকেই তো তার অফিস।

চোদ্দ

নব্যযুবক বাঙ্গালী ক্লার্ক ফাইল থেকে মাথা উঠিয়ে তাকে দেখল। টেবিলের চারদিকে কাগজ ছড়িয়ে আছে। বাইরে বারান্দায় উড়িয়া কুলি ঘুমে ঢুলছে আর পাখা টানছে। স্ত্রিলকে দেখে সে সোজা হয়ে বসল এবং অধিক মনোযোগ দিয়ে পাখা টানতে শুরু করল।

"গুড আফটার নুন স্যার।" নব্যযুবক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"গুড আফটার নুন—তোমার নাম কি?"

"গৌতম নীলাম্বর দত্ত, স্যার।"

"তোমাকে আগে কখনো দেখিনি!"

"গতকাল আমাকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে এখানে ট্রান্সফার করা হয়েছে।"

"কতদিন ধরে কাজ করছ? তুমি তো ছেলেমানুষ!" স্ত্রিল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে কথা বলল। নেটিবদের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা কর্ণওয়ালিশ পছন্দ করতেন না। জন কোম্পানীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসার পর কর্ণওয়ালিশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন ইংরেজ এখন থেকে শাসক আর হিন্দুস্থানী শাসিত। ইংরেজ কখনো নেটিবদের বন্ধু হতে পারেনা। 'হেস্টিংস-বাহাদুরের' যুগ এখন স্বপ্ন। স্ত্রিল

'ওল্ড স্কুলের নবাব'। বাইজিদের গান শুনত। অবধ রেসিডেন্সীতে থাকতে থাকতে সে হিন্দুস্থানী জীবনের খুব কাছে চলে এসেছিল। তার কর্ণওয়ালিশের কথা মনে পড়ল—গুড ওল্ড কর্ণওয়ালিশ—যে গাজীপুরে পৌঁছে কলেরায় মারা গেছে। এতদিনে তার কবরে হাড়ও পচে গেছে। আবার মৃত্যুর অনুভূতি। সে ঘাবড়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে চোখ বন্ধ করল। তারপর আবার বাঙ্গালী ক্লার্কের ওপরে দৃষ্টি—"তুমি কোথায় লেখাপড়া করেছ?"

"সংস্কৃত কলেজ, বেনারস এবং এখানে"—কলকাতা কলেজে এফ, এ, পর্যন্ত পড়েছি। এখন বি, এ, পড়তে চাই।

"অত্যন্ত আনন্দের কথা" স্রিল সত্যিই খুশী হল—"অফিসের পর আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করবার চেষ্টা কোরো।"

কিছুদিন পর স্রিল সাহেব নীলাম্বর দত্তকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠালেন।

"বেড়াতে চাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কখনো শাহ-অবধের অমলদারী দেখেছ?"

"বেনারস ছাড়িয়ে কোথাও যাইনি।"

অত্যন্ত জরুরী কিছু কাগজ লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে পাঠাতে চাই। আমি নিজে যেতে পারব না—আমাকে টুরে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে সশস্ত্র দল যাবে। বাড়ী গিয়ে তৈরি হও—আর হ্যাঁ, অকলেশবাবুকে বল—বজরায় তোমার জন্য যেন কেবিনের ব্যবস্থা করে দেন।" স্রিল সাহেবের হুকুম।

"ইয়েস স্যার, থ্যাংক যু স্যার।" সে নিজের কামরায় ফিরে এল।

সাহেবদের নজর স্রিলের উপরে। ওল্ড স্রিল সত্যিই অদ্ভুত। নেটিবদের সঙ্গে অত্যধিক কঠোর ব্যবহারও করে আবার বন্ধুত্বও প্রকাশ করে। এখন এই বাঙ্গালী ছেলেটির সঙ্গে বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনা করবে।

কলকাতা থেকে বেনারস-গামী বজরা নোঙ্গর তোলে নি। বর্ষা কাল। মুঙ্গের থেকে পাটনা পর্যন্ত গঙ্গা বিস্তৃত। জিনিসপত্র বেঁধে গৌতম নীলাম্বর প্রস্তুত। বৃষ্টি থামবার অপেক্ষায়। মানিকতলায় তার ছোট্ট বাড়ী। একলা থাকে। মা-বাবা, ভাই বোন সবাই ক্ষেতে খামারে কাজ করে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাড়ীর পাশে গলিতে বর্ষার জল। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। গলি বর্ষার জলে ভরে গেছে। বাতাস বন্ধ। সে নিজের কামরায় চট বিছিয়ে, লণ্ঠনের আলোয় একটা মোটা ইংরেজি বই পড়ছে। মাঝে মাঝে ডিক্সনারী দেখছে। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল, কেউ এসেছে। মুখ তুলে দেখল, সাদা শাড়ী পরা এক ভদ্রমহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে। গৌতম তাড়াতাড়ি উঠে নমস্কার করে বলল—"ব্যাপার কি? তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাও মা?"

"তোমার সঙ্গে। তুমিই স্ক্রিল সাহেবের ক্লার্ক?"

"হ্যাঁ, আমিই।"

"আমি—আমি স্ত্রিল সাহেবের পত্নী।"

"আচ্ছা!" তার মনে পড়ল, অফিসে তাকে কে যেন বলেছিল, স্ত্রিল সাহেবের এক হিন্দু রক্ষিতা আছে এবং কিছুদিন হল, তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

"তোমাকে সাহেব খুব স্নেহ করেন। আমার একটা কাজ করে দেবে?"

"হ্যাঁ—নিশ্চয়।"

"চম্পাবাঈকে চেনো?"

"কে চম্পাবাঈ?"

"লক্ষ্ণৌ-এর প্রসিদ্ধ বাইজি। সাহেব যখনই লক্ষ্ণৌ যান চম্পা-বাইয়ের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করেন। এখন আমার দিকে ফিরেও তাকান না। সংসারে আমার আর কেউ নেই। এক বৃদ্ধ বাপ ছিল--মারা গেছে। ভাই নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকে। বৌদিরা উঠতে-বসতে কথা শোনায়—যাও ফিরিঙ্গী সাহেবের কাছে।" তার দুচোখে জল। এক মেয়ে আমার। দশ বছর বয়সে সাহেব তাকে

বিলেত পাঠিয়ে দিলেন, নিজের ছোট বোনের কাছে। বিলেত থেকে ফিরে এসে মেয়েটি আমাকে যেন চেনেই না। তার নাকি ভীষণ লজ্জা—তার মা কালো।"

গৌতম কি বলবে, বুঝতে পারল না। সে জানত, সাহেব একটি কন্যার পিতা।

"তোমার মেয়ের নাম কি ?"

"মারগারেট ইসাবেল—কিন্তু আমি তাকে বেলা বলে ডাকি।

"তুমি কি খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছ ?"

"না। কিন্তু বেলা খ্রীস্টান। সে আমার ধর্মকে অত্যন্ত হীন মনে করে। তুমি চম্পাকে বুঝিয়ে বোলো—সে যেন সাহেবের কথা ভুলে যায়। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে তো ? আমাকে বলবে তো, চম্পাকে তুমি কি বললে ?"

"নিশ্চয় দেখা করব মা !" গৌতম নীলাম্বর ভদ্রমহিলাকে পৌঁছাতে নীচে নেমে এল—"তোমার পালকী কোথায় ?"

"আমি হেঁটেই এসেছি। আমার জন্য চিন্তা কোরো না।" গলির আধো আলো অন্ধকারে তার সাদা শাড়ী ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

পনের

লক্ষ্ণৌ'র রুমী দরজায় ভোরবেলার নহবত এখনো বাজেনি। চৌক এবং নক্‌খাসে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। শ্রাবণ লক্ষ্ণৌকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত। আমীরদের বাগানবাড়ী সাজানো হচ্ছে। দাসীরা খোশগল্পে মগ্ন। রাস্তার ধারে দোকান বসে গেছে। তামাক এবং পানের দোকান সাজানো হচ্ছে। ময়দানে ফৌজী পল্টন প্যারেড করছে। শাহী মহলে তিলংগে, ঝিলংগে, হাব্‌শী সেপাহী, রাজপুত অধিকারী পাহারাদার পাহারায় দাঁড়িয়ে। রমনার জঙ্গলে পাখির কলরব। গোমতী নদী তীরে নৌকো বাঁধা; বজরাও দাঁড়িয়ে। শ্রাবণের ভেজা মেঘ; গোমতীর শান্ত জলে মেঘের প্রতিচ্ছবি।

চারিদিকে সবুজের সমারোহ। বাগানে দোলনা ঠাঙ্গানো। হায়াত-বখ্‌শ, টেড়ীকোটি, সিঙ্গাড়েওয়ালী কোঠি, খুর্শীদ মন্‌জিলের উপরে কালো মেঘ।

দুপুরের নহবত বাজল। কল-কারখানা থেকে লোক দুপুরের খাবার খেতে বেরোলো। ভাটিয়ারিনীরা ব্যস্ত হল। দেওয়ানখানায় দস্তর-খানা পাতা হল। বেগমরা খসখসের পরদার পেছনে চৌসর খেলতে বসল। সেবিকা ও বাঁদীরা পানদান খুলে বসল। মেয়েরা ওড়না রঙিন করতে চলল। উনুনে কড়াই চাপানো হল।

তৃতীয় প্রহরের নহবত। দিন শেষ হয়ে আসছে। রমনায় হরিণ ছুটোছুটি করছে। চিরৈয়া ঝিলে মেঘের ছায়া। মোতীমহলের ওপর বর্ষার হাল্কা ছিটে ফোঁটা।

তারপর চতুর্থ প্রহর। সূর্য ডুবছে। বাতাসে সুগন্ধ। সন্ধ্যার অবধ নববধূর মত সেজেছে। শহরে সুগন্ধের ছড়াছড়ি। মাটির সোঁদা গন্ধ, কনৌজের বেলফুল আর জৌনপুরের গোলাপের সুগন্ধ, মন্দির থেকে বাতাসে ভেসে আসা ধূপ-ধুনোর সুগন্ধ, বাদশাহী মহলে আতর-নদী থেকে ভেসে আসা সুবাস! গলি এবং ছোট রাস্তার পাশের বাড়ীর দরজা খুলল। গানের কলি ভেসে আসতে লাগল। সুন্দরী মেয়েরা, চালাক ব্যবসায়ী মহিলারা শ্রাবণ গীত গাইছে। গলির ছেলেরা বেত অথবা গুলি খেলায় ব্যস্ত। নদীর ধারে বসে থাকা যোগী একতারা বাজায়।···ব্যবসাদাররা ব্যস্ত হয়। ময়রা মিষ্টি বানায়। প্রত্যেকটি লোক খুশী।

ভাই সব কটা দিন আনন্দ করে নাও। সুখ ক্ষণস্থায়ী ক্ষণিকের শান্তি। ভাগ্য ভাল যে দু চারজন ভাল লোক এখানে এসে জুটেছে। কাল তোমার ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে! 'কুচনগারা সাসকা বাজত হ্যায় দিন রৈন।' শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরই রইবেন। সে অনেক দূরে বসে আছেন—বসে বসে তামাসা দেখাছেন। যে কোনো দিন তিনি আঙ্গুল উঠিয়ে বলতে পারেন এবার থাম, অনেক হয়েছে!!

হায় অসহায় মানুষ! তোমরা সবাই এক অদৃশ্য মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছো। মাকড়সাকে তোমরা চেনো না, কেন না এই

জালই তো অদৃশ্য। হায়…! লক্ষ্ণৌর পথে-ঘাটে আজ যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা সকলেই এক মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের মত এরাও বেঁচে থাকার শিল্পকে তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। এদের জীবনে আনন্দের বন্যা বইছে যেন। এই নাম, এই চেহারাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সুজাউদ্দৌলা, বহু বেগম, বেণী বাহাদুর, টিকেন রায়, এবং নিরীহ অনেক মানুষ—এদের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। এরা অপরকেও দুঃখ দেয় না—হাজার হাজার বছর ধরে এরা গোমতী নদীর ধারে বাস করছে। রামচন্দ্রের সময়ও এরা ছিল। সুজাউদ্দৌলার সময়ও এরা আছে। কৃষক আর যোগী, নদীর ধারে বসে থাকা সন্ন্যাসী! এরা সুজাউদ্দৌলার সৈন্য দলে ভর্তি হয়ে বক্সারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ, কৃষক, সন্ন্যাসী নিজের দেশের জন্য নবাবের হয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধেও লড়েছিল। সদাপ্রসন্ন এই রাখালরা আজীমাবাদ পৌঁছে ইংরেজদের বিরুদ্ধেও লড়েছে।

ইংরেজ সুজাউদ্দৌলার বিরাট সৈন্য শক্তির মোকাবিলা করতে পারেনি। তারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল। শর্ত পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য তারা রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা চিরাচরিতভাবে কথার খেলাপ করেছিল। সুজাউদ্দৌলা একটি মাত্র দুঃখ নিয়ে মারা গেল—সে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে পারেনি। সুজাউদ্দৌলা যে মহাদজী সিন্ধিয়ার পাগড়ী-বদল ভাই ছিল। এইনাম সেই কাহিনীর যা ভোর হতে হতে শেষ হয়ে যায়।

লক্ষ্ণৌ পরীর মত সেজেছে। পরিচিত গলি, পথ, গঞ্জ, বাগান, প্রাসাদ ঝলমল করছে। এদিকে কেল্লা, মচ্ছী ভবন—ওদিকে মওয়ালী খাঁ'র ধর্মশালা। আসিফউদ্দৌলার প্রিয় বান্ধব রাজা ঝাউলালের পুল একধারে।

দাঁড়াও পথিক! এ কি সেই আসিফউদ্দৌলা যাকে স্মরণ করে হিন্দু দোকানদাররা নিজের দোকানের ঝাঁপি তোলে? 'ঈশ্বর যাকে কিছু না দিতে পারে—তাকে দেন আসিফউদ্দৌলা!!'

অযোধ্যা আর বেনারসের সঙ্গীতের সংরক্ষক এই নগর। এখানকার

ভৈরবী সারা দেশে প্রসিদ্ধ। ব্রজের রাসধারী, রাসলীলার আয়োজন করে। ব্রাহ্মণ নর্তক পায়ে একটা নূপুর পরে নাচছে এবং পরিবেশ মৃত্যুর নূপুর বাজছে। গত সত্তর আশী বছর ধরে লক্ষ্ণৌ আর ফৈজাবাদের মঞ্চে এই নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। বাইরের লোক এর মাধুর্য গ্রহণ করতে অক্ষম। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ঠাকুর ইমাম বক্স আর লালা হুসেন বক্স, মির্জা মেঢ়ু আর নবাব কম্মন, ইমাম মেহরী আর মির্জা জঙ্গলী, বাঁদী সুখবচন ও নবাব বাসন্তী বেগম— এরা সকলে মিলে এখানে এক পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেছে। বাতাসা আর থালের ওপর নাচনেওয়ালা, কথক নৃত্য শিল্পী, কাশ্মীরী ভাঁড়, জলতরঙ্গ বাদক, বীণা বাদক, তবলচী, বাজপেয়ী, উর্দু কবি শায়ের, গল্পবাজ, কায়স্থ, সৈন্য, চণ্ডবাজ, বহুরূপী, বিদ্বান ও শিল্পী— এদের সকলেরই জীবন যেন একই ধারায় প্রবাহিত। বীররস ও শৃঙ্গাররস একই ধারায় প্রবাহিত। আসল রোম্যান্টিক সামাজিক জীবন এখানেই।

লক্ষ্ণৌ থেকে সত্তর মাইল দূরে ফৈজাবাদ রামের নগর অযোধ্যা। সুজাউদ্দোলা এই নগরকে দিল্লীর সমকক্ষ করে তুলেছিল। গোলাপ বাড়ী ঘাঘরা ঘাট ও মোঘলদের সময়ের বড় বড় মসজিদ ফৈজাবাদেই। দিল্লীতে এখন ছোট ছোট মোঘলরা বসে আছে॰ এরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে প্রাণ-ভয়ে। বড়ই হাস্যাস্পদ এদের জীবন।

এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। ঠাকুর আর নবাব, জমিদারী রক্ষার জন্য দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। জমিদারের সিপাহী হিন্দু আর মুসলমান প্রজাকে সমান ভাবেই পেটায়।

ধার্মিক ভেদাভেদ প্রজাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। মহরম শান্ত, সংযত পরিবেশে পালন করা হয়। মসজিদের সামনে বাজনা বাজে না। হিন্দু তাজিয়া কাঁধে নিয়ে বেরোয়, মুসলমানরা দেওয়ালী উৎসবে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। নবাব-বহু-বেগমরা প্রতি বছর দোল পূর্ণিমায় ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌয়ে আসে। অগুণতি হিন্দু রাজা সারা রাজ্যে মসজিদ আর ইমামবাড়া নির্মাণ করেছে। মিস্টার এশ্লের বন্ধু বিশপ হেবর, যে এই দেশে ঘুরে ঘুরে যাত্রা বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করছে —লিখছে, এই দেশে হিন্দু আর মুসলমানরা এক অপরের দুশমন।

ওয়েস্ট মিনিস্টারে আমাদের সরকারের আশু কর্তব্য—এই জঙ্গলী জাতিকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করবার জন্য শীঘ্র অনেক বাইবেল আর অনেক বন্দুক পাঠানো।

লক্ষ্ণৌবাসীরা জানেনা যে বিলেত থেকে বন্দুক বোঝাই জাহাজ কলকাত্তা বন্দরে আসছে। আগা মীর শাহ জমানর প্রধানমন্ত্রী। নগর শান্ত। এটা আবুল-মুজফর মোয়জুদ্দীন শাহ জমান গাজীউদ্দীন হায়দারের রাজধানী।

বাজারে ভিড়। দোকানীরা শায়েরি (কাব্যজ ভাষায়) কার লোক ডেকে চলেছে। প্রচণ্ড বিক্রি, কুটীর এবং প্রাসাদে সমান ভাবে অট্টহাসি। এত সৌন্দর্য এত শান্তি কত দিন টিকতে পারে ?

সৌন্দর্য কয়েক মুহূর্তের ! শাক্যমুনি গৌতম সিদ্ধার্থ বলেছিল—জীবন নশ্বর ! নশ্বরতা থেকে মুক্তি পাও ! দুঃখ থেকে মুক্তি পাও ! ভুলে যেও না যে রামচন্দ্রের অযোধ্যা, প্রসেনজিৎ-এর শ্রাবস্তী, চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্র, হুসেন শর্কীর জৌনপুর এবং আলাউদ্দীন হুসেনের গৌড়ও সৌন্দর্যের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ভুলে যেও না, সব সৌন্দর্যেই ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে থাকে।

পথ দিয়ে একটি চমৎকার পালকী চলেছে। পাশে পাশে চঞ্চল দাসীরা পর্দা ধরে ছুটে চলেছে। কাহারদের বেশ-ভূষা এক রকমের। তাদের পাগড়ীতে সোনালী মাছ আঁকা। পথচারীদের নজর পালকীর দিকে। পালকীতে সেই সময়ের সবচেয়ে রূপবতী মেয়ে চম্পা বসে। সময় বড়ই বিচিত্র ! সময়, সৌন্দর্য আর মৃত্যু !

বাগানে মেলা বসেছে। ইংরেজ রেসিডেণ্ট বাদশাহের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে আর বসে বসে হাতীর লড়াই দেখছে। দরবারে কথক নৃত্য চলছে। আমের কুঞ্জে মলহার উড়ছে। শ্মশানে যারা এই হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পেয়েছে তাদের চিতা জ্বলছে। বিদ্বান ও বিচারকদের জলসায় বাদ-বিবাদ চলছে। নক্‌খাসে পেশাদার গল্পকার আসর জমিয়ে রেখেছে। ভাঙ্গখোররা ভাঙ্গের শরবৎ গুলছে। সুর শৃঙ্গার, মঞ্জিরা আর পাখোয়াজের ছন্দে সব শব্দ ডুবে যাচ্ছে। কবরস্থানে কবর খোঁড়া হচ্ছে। নশ্বর ! নশ্বর ! সব কিছুই নশ্বর !

কালকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। মানুষ তাকে বেঁধে রাখতে চায় কিন্তু কাল সব বন্ধন ছিঁড়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে!

এরপর রুমী দরজায় সূর্যাস্তের নহবত বাজবে।

চার প্রহর দিন কেটে গেছে। চার প্রহর রাত কেটে যাবে। প্রত্যেক প্রহর আটটি ভাগে বিভক্ত। মানুষের মিছিল প্রত্যেক প্রহরে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

কাল মৃত্যু।

ষোল

আসিফী যুগের তৈরি রুমী দরজায় নাকাড়া বাজল। গৌতম নীলাম্বর শুনল, এগিয়ে এল। তার বাহন তখন শহরের দরজায়। সিপাহীকে পরোওয়ানা দেখাল। অবধের বাদশাহের সিপাহী জিজ্ঞেস করল—"মশায়, কোথায় চলেছেন?"

"রেসিডেন্সী।"

সিপাহী এক নজরে তাকে দেখে নিল—"ফিরিঙ্গী সরকারের সঙ্গে মশায়ের সম্পর্ক বুঝি?"

"হ্যাঁ!" গৌতম অপ্রস্তুত।

"হ্যাঁ মিঁয়া।" দ্বিতীয় সিপাহী বলল—"খোদা বড়ই মেহেরবান। কোনো না কোনো উপায়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।"

তার কথা শুনে প্রথম সিপাহী একটি শের (উর্দু কবিতা) শোনাল তারপর আগ্রহ নিয়ে গৌতমের দিকে প্রশংসা পাবার জন্য তাকাল।

গৌতম নীলাম্বর ছোটবেলায় ফারসী পড়েছিল কিন্তু এদের উর্দু বুঝতে পারল না। গৌতম প্রথমবার দেখল এ-দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে নেটিভ রাজার শাসন চলছে। সে খুব খুশী। পালকী এগিয়ে চলল।

উপনগর। পথের ধারে কিছু আহীর ভোরের গান গাইছে।

বটগাছের নীচে কাঠ জ্বলছে। রাস্তার ধারে এক বুড়ো যোগী বসে। পিছন দিকে ভবানী মঠ। বিদেশে মায়ের দর্শন পেয়ে সে ভীষণ শক্তি পেল।

রেসিডেন্সী পৌঁছে সে খবর পেল, সাহেব নবাব কামাল রজা বাহাদুরের কাছে নেমতন্ন খেতে গেছে। অবশ্য সরকারের সূচনা বিভাগকে গৌতমের আগমনের খবর জানিয়ে দেওয়া হল। হরকরা গোলাগঞ্জে নবাব কামাল রজা বাহাদুরের বাড়ীর দিকে ছুটল।

নবাব আবুল মনসুর কামালউদ্দীন অলী রজা বাহাদুর মুসরতগঞ্জে আহার সেরে রেসিডেন্সীর সঙ্গে চৌসর খেলা খেলছিলেন। ইনি শহরের এক উচ্চ ঘরাণার সন্তান। কল্যাণপুর আর সন্দীলে বিরাট এস্টেট। রূপবান এবং গলার স্বর মধুর। নগরের বাঈজিরা তাঁর প্রতি আসক্ত। ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। এখন পর্যন্ত অগুনতি মেয়েদের সঙ্গে অস্থায়ী বিয়ে করেছেন। ইদানিং তার চম্পাজানের প্রতি আসক্তি। কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে কলকাতার গ্রিল সাহেবের মত এই রেসিডেন্সীও চম্পাকে চায়। রেসিডেন্ট সাহেব নবাব সাহেবের চালের উত্তর দিতে যাবেন, এমন সময় চোবদার খবর দিল—কলকাতা গভর্ণমেণ্ট থেকে কাগজপত্র নিয়ে এক বাঙ্গালী বাবু এসেছেন—বেলীগার্ডে অপেক্ষা করছেন।

আসর ভেঙ্গে গেল। এক্ষুনি চম্পা আসবে। রেসিডেন্ট সাহেব অত্যন্ত রেগে গেলেন। লর্ড আমহার্স্ট কলকাতায় গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসেছে আর উৎপাত শুরু হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহে দু'তিন বার করে কলকাতা থেকে এখানে লোক আসছে। হৃদয় চম্পার নাচের দিকে কিন্তু কর্তব্য সাহেবকে বেলী গার্ডে যেতে বাধ্য করল।

"এখানে চম্পাবাঈ কোথায় থাকে?" দ্বিতীয় দিন গৌতম নীলাম্বর রেসিডেন্সীর মুন্সীকে জিজ্ঞেস করল। মুন্সী হরিশংকর রহস্যময় হাসি হাসলেন। বাঙ্গালী বাবুকে অত্যন্ত হৃদয়বান মনে হচ্ছে!

"আপনিও চম্পাবাঈয়ের কাছে যাবেন?"

"হ্যাঁ!" গৌতমের চোখ মুখ লজ্জায় লাল। গৌতমের সলজ্জ ভাব দেখে হরিশংকর আশ্চর্য হলেন কেননা তাঁর সমাজে বাঈজির

স্থান অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত। বাঈজি ছাড়া সভ্য সমাজ অপূর্ণ। হরিশংকর খবর বাহকের মারফৎ চম্পাকে বলে পাঠালেন যে ব্রিল সাহেবের মুন্সী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। চম্পা বলে পাঠাল—"তার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষায় রইলাম।"

সন্ধ্যেবেলায় যখন বাতাস খসখসের সুগন্ধে ভরপুর, মাটিতে গোলাপ জলের সুবাস, চকবাজার আলোয় ঝলমল, তখন গৌতম নীলাম্বর দত্ত'র বাহন চম্পাজানের সবুজ, তিনতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ফটকে সুবেশ পাহারাদার। গৌতম বাহন থেকে নেমে, কাঁধে শাল জড়িয়ে, সসঙ্কোচে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। হল ঘরে অনেক লোকের ভিড়। মেঝেতে ফরাস পাতা। ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। ঝাড় লণ্ঠনের রঙ-বে-রঙের কাঁচ বসানো। চারদিকে বিরাট-বিরাট আয়না। চকের দিকের জানলায় গোলাপ জড়ানো। আয়নায় গৌতম অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি দেখল। সে আগে কখনো এদের দেখেনি। এরা কারা? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এই মোহময় পরিবেশে তারা কতক্ষণ থাকবে? কি চমৎকার এদের পরিধান! শরবতী কাপড়ের জামা, গুলবদন এবং মশরুর (এক প্রকারের কাপড়) পায়জামা, চাদর এবং ছুঁচলো রঙিন টুপি! এরা শাল গায়ে দিয়ে পাশ বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে! অত্যন্ত সংযত, ভদ্র ও শিষ্ট ভাবে এরা নীচু স্বরে কথা বলছে। এক কোণায় রাজা শিবকুমারের সঙ্গে বক্কার কোনো শের নিয়ে আলোচনা চলছে। অন্য দিকে কোনো সজ্জন ব্যক্তি সঙ্গীত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে। নীলাম্বর দত্ত সলজ্জ ভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরণে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিধান। মাথায় টুপি। কিন্তু তার চেহারায় এমন কিছু ছিল যা দেখেই মনে হচ্ছিল সে বিদেশী। মুখ্য স্থানে নবাব কম্মন বসেছিলেন। তিনি তাকে ডেকে বসালেন এবং কুশলবার্তার আদান-প্রদান করলেন।

আমারও কলকাত্তা যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু মাশা-আল্লাহ, বড় কঠিন যাত্রা।" তিনি বললেন। তিনি গড়গড়া টেনে যাচ্ছিলেন, তাঁর সুন্দর চেহারায় ফানুসের আলো লুকোচুরি খেলছিল।

"বাংলার জমিদারদেরও জবাব নেই। বাংলাদেশে অনেক হৃদয়বান অভিজাত ধনী আছেন। মশায়ের এস্টেট বাংলার কোন দিকে ?

"আমার কোনো এস্টেট নেই। আমি চাকরি করি।"

"চাকরি !"

নীলাম্বর আবার অস্বস্তি অনুভব করল।" আমি কোম্পানীর—সরকারে চাকরি করি।

"চমৎকার !" নবাব কামাল প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন।

"তাহলে নিশ্চয় ইংরিজি পড়েছেন !" অন্য কে একজন প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু আধটু ইংরিজি জানি।"

"আচ্ছা ! চিঠি পড়তে পারেন ?"

নীলাম্বর মিষ্টি হাসি হাসল। "আজ্ঞে হ্যাঁ। এতক্ষণ পরে সে আশ্বস্ত হল। এরা বড়ই সরল সহজ লোক। ভয়ের কিছু নেই কিন্তু যে পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় এরাও সেই পৃথিবীতে থাকে। অথচ তার মধ্যে আর এদের মধ্যে কত তফাৎ।

এতক্ষণে বাদ্যযন্ত্র সুরে বাঁধা হয়েছে। সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে—চাঁপা ফুলের মত গায়ের রং, নাকে হীরের নথ, চোস্ত পায়জামা পরে, সারা শরীর প্রায় গয়নায় ঢেকে আসরের মাঝখানে এল এবং গৌতমকে মোহময় ভঙ্গীতে ঝুকে সেলাম জানাল। তারপর সে আসিফউদ্দৌল্লার গজল শুরু করল—

বুতোঁ কী গলি মে শবো রোজ 'আসিফ'
তমাশা খুদাই কা হম দেখতে হ্যায়।"

(পুতুলের গলিতে আসিফ প্রতি দিনই ঈশ্বরের সৃষ্টি করা তামাশা দেখে চলেছে।)

শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তার ন শুনছে। গৌতম অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

কলকাতার ইংরেজী শেখা বাঙ্গালী ক্লার্ক লক্ষ্ণৌ'র মোহে জড়িয়ে পড়ল। বৃষ্টির জন্য কলকাতার পথ বন্ধ। জন্মাষ্টমী এল। কৃষ্ণ-লীলা-পালা মঞ্চস্থ হল। চম্পা রাধা সাজল। গৌতম চম্পাকে

মেলায় দেখল, বাগানে দেখল, গোমতী নদী তীরে চম্পার সঙ্গে তার দেখা হল, হিজ ম্যাজেস্টি শাহে-জমন গাজীউদ্দীন হায়দারের দর-বারেও চম্পা। বজরার উপরেও চম্পা বসে। চারিদিকে চম্পা।

সুজাতা দেবীর কাজ সে ভুলে গেল।

গৌতম নীলাম্বর অনিদ্রায় রাত কাটায়। দিন নানা কাজে কেটে যায় কিন্তু রাত যেন কাটতে চায় না।

রাত—চম্পার রাজধানী। এই রাত্রির উপর গৌতম নীলাম্বরের দখল নেই। গৌতম নীলাম্বরের জীবনে বেশ্যাদের কোনো স্থান নেই। বেশ্যারা ঘৃণ্য। সে আবার ভাবে নারী দেবী—তাদের বেশ্যার জীবন ত্যাগ করা উচিত। এটা অন্যায়। কখনো ভাবে নারীর জন্ম দুঃখ সহ্য করবার জন্যই। বাল্য বিধবারা সারা জীবন দুঃখ পায়। অনাথ মেয়েদের সারা জীবন দুঃখের। বিধবারা, যারা স্বামীর চিতায় সতী হয়ে জ্বলে মরে নিজেকে উৎসর্গ করে—তাদের জীবনও ত্যাগ এবং বলিদানের। কিন্তু চম্পাকে দেখ! নিজে না জ্বলে অন্য লোককে জ্বালিয়ে মারে।

'ন স্ত্রী স্বতন্ত্রম্।' মনু মহারাজ লিখেছেন, নারী স্বতন্ত্র নয়—এটা ঠিক। রামায়ণের ষষ্ঠকাণ্ডে এও লেখা আছে যে বিপদের সময় বিয়ের সময় এবং আরাধনা করার সময় যদি নারী বাইরে বেরিয়ে আসে, তাহলে আপত্তি করা উচিত নয়। এও লেখা আছে নারী যদি বেদ পড়ে—অনিষ্ট হতে পারে।

জমিদার সমাজে নারী তখনই স্বতন্ত্র যখন সে বাজারে রূপের বাহার ছড়িয়ে বসে। চম্পাবাঈ এই সমাজেই মানুষ। গৌতম চম্পাবাঈয়ের জীবনযাত্রা বুঝতে পারবে না। কেননা সে বাংলা দেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব বাংলা দেশে মাত্র কিছুদিন হল হয়েছে। তারা জমিদারী সমাজ-ব্যবস্থা ত্যাগ করেছে। জীবনের মূল্যায়ন তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করছে এবং এই শ্রেণী সহজভাবেই নৈতিকতার পূজারী।

মুন্সী হরিশংকরের সঙ্গে একদিন সে নদী পার করে রমনা যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজর এক বজরার ওপরে পড়ল। সোনালী বজরাটি

আস্তে-আস্তে জলে ভেসে চলেছিল।

"সেলাম কম্পানী বাহাদুর।" খুব মিষ্টি, মধুর আওয়াজ সে ঘুরে দেখল। চম্পা হাসছে। সে সেই বজরায় বসে। গৌতম একটু ঘাবড়ে গেল। চম্পা প্রাণখুলে হাসল।

লক্ষ্ণৌর আদব কায়দার সঙ্গে পরিচিত থাকলে সে বলত—'হুজুর, আমার প্রতি বিশেষভাবে মেহেরবান'। কিন্তু সে সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সামনে আগা ও মীরের বজরা। পেছনে-পেছনে আরও কয়েকটি সুন্দর সাজানো নৌকোয় আমীর, মন্ত্রী, জমিদার ও শহরের প্রসিদ্ধ বেশ্যারা রমনার দিকে চলেছে। চম্পার বজরা আরও কাছে এল।

"আমার নৌকায় চলে আসুন।" চম্পা হাসল।

"দুজনে এক সঙ্গেই ডুবতে চান!" হরিশংকরের টিপ্পনী। তারপর হরিশংকর ও চম্পার রসিকতা চলল। ঘাটে সবাই নামল। চম্পার পাশে হেঁটে যেতে-যেতে গৌতম মনে মনে স্থির করল—সুজাতা দেবী যে দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করে অন্ততঃ নিজের বিবেকের দংশন থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। গৌতম সাহস করে জিগ্যেস করল—"তুমি গ্রিল সাহেবকে চেনো?"

চম্পা সালোয়ার সামলে তখন সিঁড়ি ভাঙ্গছে!

চম্পা নিরুত্তর।

"চম্পাবাঈ, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"হ্যাঁ চিনি। তোমার তাতে কি?"

"তাঁর স্ত্রী কলকাতায় থাকেন।" সে আশা করেছিল, একথা শুনে চম্পা ঘাবড়ে যাবে। তার সুন্দর মুখে অনুশোচনার ছায়া পড়বে। কিন্তু সে সহজভাবে উত্তর দিল—"তাই নাকি? আমার কাছে যারা আসে তাদের তিন-চারটে বৌ বাড়ীতে থাকে।"

"তাঁদের একটি মেয়েও আছে।" গৌতম দৃঢ়ভাবে বলল।

"বৌ থাকলেই ছেলে-মেয়ে থাকবে! নাতি নাতনীও থাকতে পারে! তুমি তোমার মতলব বল।"

"তুমি গ্রিল সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ কর। অর্থাৎ এইবার

তিনি যখন আসবেন তুমি দেখা করবে না। তিনি সম্ভবত রেসিডেণ্ট হয়ে এখানে আসবেন।"

চম্পা চলতে-চলতে থমকে দাঁড়াল।

"বড় অদ্ভুত লোক আপনি মশায়। হজরত—আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন নাকি।"

নীলাম্বরের মাথা ঘুরতে লাগল। অভদ্রতার একটা সীমা আছে। একবার ভাবল, সে চলে যাবে। কিন্তু যেতে পারল না। যমনার ধারে ব্যাণ্ড বাজছে। বাদশাহ এবং দরবারের অন্যান্য প্রতিনিধি চেয়ারে বসে পড়েছেন। রেসিডেণ্টও আসন গ্রহণ করেছেন। এবার লড়াই শুরু হবে। সে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফিরবার সময় নবাব কম্মন ও রেসিডেণ্ট সাহাবের পেছনে-পেছনে সে ঘাট পর্যন্ত এল। বজরায় চম্পা বসে। সে আর চম্পা একত্র। চম্পা একদৃষ্টে তাকে দেখছে। অত্যন্ত মোহময় তার দৃষ্টি।

"তোমাকেই বলছি গো! শোনো", সে হঠাৎ বলল, "গ্রিল সাহেবকে হাজারবার ছেড়ে দেব কিন্তু আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেও না! তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে!" চম্পার সুরেলা কণ্ঠস্বর।

গৌতম মৌন।

চম্পা আবার কথা বলল—"আমি আজ পর্যন্ত কাউকে এমন কথা বলিনি। গর্ব কোরেনা—নিজেকে নিয়ে এত গর্ব ভাল নয়। চিরদিন সুসময় থাকে না।" নৌকো ঘাটে পৌঁছে গেল। চম্পা ভুরু কুঁচকে, কপট রোষে, হাসতে হাসতে বলল—

"মশায়! তুমি কথা পর্যন্ত বলতে পারনা আর আমার প্রেমে পড়েছ! ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা।" নীলাম্বর বজরা থেকে চুপচাপ নামল। চম্পা পাল্কীর দিকে এগোতে-এগোতে বলল—"আমাদের বাড়ীতে আসবে তো?"

"না।" নীলাম্বরের সংক্ষিপ্ত উত্তর। সে তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভেতরে গিয়ে বসল। এরপর তিনদিন ক্রমাগত গৌতম অনিদ্রায় ভুগল। চম্পা অনেকবার তাকে ডেকে পাঠালো। সে সাড়া দিল

না। মেয়েটি হঠাৎ তাকে নিয়ে কেন মেতে উঠেছে ? নারীর চরিত্র বোঝা বড় মুস্কিল। বড়লোক, জমিদার, রাজা-নবাবদের নিয়ে চম্পার কারবার। আমাকে তার কেন ভালো লাগল ? মুন্সী হরিশংকর ফাইলের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে বলল—"তুমি চম্পার সাথে দেখা করছ না কেন ?" নীলাম্বর অবধের এই লালা-ভাইকে বোঝাতে পারল না যে সে কেন চম্পার সঙ্গে দেখা করছে না।

"ঈশ্বর নারীকে আমাদের আনন্দ দান করবার জন্যই তো সৃষ্টি করেছেন ?" হরিশংকর আবার বলল। আশ্চর্য হয়ে নীলাম্বর তাকে দেখল। "নারী ঈশ্বরের পবিত্রতম সৃষ্টি ! তুমি একে স্রেফ আনন্দের সামগ্রী বলে মনে করছ কেন ?" গৌতমের উত্তর।

এলাহাবাদ থেকে বজরা কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত। গৌতমকে ফিরে যেতে হবে। সে কাগজপত্র সামলে নিল। গৌতমের বাহন শহরের বাইরে চলেছে। সে জিগ্যেস করল—"এই পথ কোনদিকে যায় ?"

"নক্‌খাস্—খোদাবন্দ !"

"গাড়ী সেইদিকে ঘোরাও।"

"বহুত আচ্ছা—খোদাবন্দ !"

বাহন চম্পার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। গৌতম সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠল। চম্পা বারান্দায় বসে ছিল। গৌতমকে দেখে সে অবাক্।

"তুমি এসেছ ?"

"না, আমি চলে যাচ্ছি।"

"একটু দাঁড়াও। শরবত আনাব।" সসংকোচে চম্পা বলল—"ব্রাহ্মণের দোকান থেকে মিষ্টি আনতে বলব ?"

"প্রয়োজন নেই।"

"আমি জানি।"

"আমি—আমি তোমাকে 'খোদা হাফিজ' বলতে এসেছি।

'খোদা হাফিজ'।

সে দরজায় অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের শহরের নিয়ম, শুভেচ্ছা জানাবার সময় বলা হয়—হোসেনের দুঃখ ছাড়া খোদা তোমাকে যেন আর কোনো দুঃখ না দেন।" তুমি হোসেনের দুঃখ বুঝবে না। দুঃখ কি, হয়ত তুমি জান না।"

"শোনো চম্পা" নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলল—"তোমার জীবন এত বেশী রঙিন যে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে। আমার তোমার সব সম্পর্কই অর্থহীন।"

"শোনো! চম্পাকে সে বোঝাবার চেষ্টা করল—"আমাকে তোমার ভাল লাগার কারণ জান? তোমাকে সবসময় যারা ঘিরে আছে—আমি তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র, পৃথক। নতুন জিনিস সকলেরই ভাল লাগে। আচ্ছা, আমি চলি।"

"হায় আল্লা। মেজাজ যেন সপ্তমে চড়া! মনে হচ্ছে রাজা ঝাউলালের সিংহাসনে আপনিই বসতে চলেছেন।" চম্পার ঠোঁটে হাসি।

শহরের বুকে অন্ধকার নেমে এল। ক্রমশঃ রঙিন ফানুস, প্রদীপ জ্বলে উঠল।···নীচে রাস্তায় কোনো বরযাত্রী চলেছে। মশাল জ্বলছে। ভিড়। বরযাত্রীর সঙ্গে ছেলেপক্ষ পণ নিয়ে চলেছে; চলতে চলতে ছেলেরা নাচছে। একদিকে ছেলেরা কসরৎ দেখাচ্ছে। একটা তখতায় নাচ হচ্ছে। রৌশনচৌকি বাজছে। মশালের আলোয় চম্পার দোপট্টা ঝলমলিয়ে উঠল। চম্পা জানালার আরও কাছে সরে এল। মেয়েরা সোহাগ গাইতে-গাইতে বরযাত্রীর সঙ্গে চলেছে। "কে জানে কোন্ ভাগ্যবতীর বরযাত্রী!" সে বলল। নীলাম্বর তাকে দেখল। সে বলে চলেছে—"সেই ভাগ্যবতীর সিঁথিতে সিঁদুর হবে, পায়ে মেহেদী, নাকে সোহাগের নথ।" সে নিজের শূন্য সীমন্তে হাত রাখল। হীরে এবং চুণী সমস্ত আলো করে আছে কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর নেই। মেয়েটি আবার নাটক শুরু করেছে—গৌতম চিন্তিত হল।

"মানুষ এত নির্দয় কেন?" চম্পার প্রশ্ন।

"যুগ-যুগ ধরে পুরুষ এবং নারী, এক অপরকে নির্দয় বলেছে।

"ভোর হতে-হতে তুমি লক্ষ্ণৌ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে।"

"হ্যাঁ।"

নীলাম্বর জানালা দিয়ে নীচে দেখল। পুরো শহর কোনো একটা মেলায় চলেছে। গলিতে ষণ্ডামার্কা জোয়ানরা গোঁফে তা দিয়ে বেড়াচ্ছে। নানারকম পেশাদার মহিলারা—চুনওয়ালী, হাবশী মহিলা, মজলিস জমানো মেয়েরা এক-একটি দল বেঁধে চলেছে। সুন্দর ছেলেরা তলোয়ার নাচাচ্ছে। মদখোর, চণ্ডুখোর, চরসখোর নিজ-নিজ জায়গায় চলেছে। পৃথিবী কত মোহময়। এই দুনিয়াকেই ভর্তৃহরি রঙ্গভূমি বলেছিল।

এই রঙ্গভূমিতেই আর একটা নাটক হচ্ছে—চম্পা ও গৌতম নীলাম্বর যার পাত্র। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। নীচে বাহন তারই প্রতীক্ষায়।

···মিয়াঁ পালাও। তাড়াতাড়ি পালাও। সোজা কলকাতার পথ দেখ। তুমি তোমার পথ স্থির করতে পারছ না আমি দেখছি।

কাগজপত্র গুছিয়ে সোজা সে নীচে নেমে এল। একজোড়া ব্যাকুল নয়ন তার দিকেই তাকিয়ে ছিল, ফিরেও দেখল না।

ভিড় সরিয়ে তার বাহন আগা মীর-এর প্রাসাদ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। একটু সরুণ মেহেরবান! বেঁচে চলুন মশাই! ডাক দিতে দিতে যুবক কোরবান শহরের বাইরে পৌঁছে দিল তাকে। জাম গাছের নীচে কয়েকজন সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছে। ভবানী মন্দিরের সামনে ধূপ জ্বলছে। নীলাম্বর গাড়ী থেকে নীচে নেমে এল। যোগমায়ার দর্শন করে সে নিজেকে ধন্য মনে করল। মা কালীরূপই তার জানা। সামনে মহামায়ার মূর্তি। "মা, তোমার জগৎ আমি দেখলাম। ঠিক এইভাবে তুমি তোমার সন্তানকে রক্ষা করে যেও।" সে আস্তে আস্তে বলল।

"এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছ?" এক যোগীর প্রশ্ন।

"তোমাদের এই শহর মরীচিকার মত। মরীচিকার সামনে অপেক্ষা করা বৃথা।" নীলাম্বর সংকেতে লক্ষ্ণৌর আলো দেখাল। দূর মচ্ছীভবনে চতুর্থ প্রহর ধ্বনিত হল। বৈরাগী তাকে লক্ষ্য করল—

মরীচিকার কি জান ?"

"বাবা !" নীলাম্বর থেমে থেমে বলল—"যোগমায়া দশ বাহু দিয়ে আমাকে টানতে চেয়েছিল কিন্তু দেখ আমি অক্ষত ভাবে ফিরে এসেছি।"

"আমাদের মধ্যে কেউ অক্ষত নয়। আমরা সবাই মাটির খেলনার মত। সব সময়ই ভাঙতে পারি। নিজের শক্তি নিয়ে গর্ব কোরো না।" বৈরাগী একটু মাটি হাতে নিয়ে শুঁকল।

"শোনো, এখানকার মাটি সঙ্গে নিয়ে যাও। কটকে যোগমায়ার মন্দিরে এখানকার মাটি উৎসর্গ কোরো।" গৌতম সসঙ্কোচে মাটি নিয়ে নিল।

"নাও! এটা লক্ষ্ণৌ-এর মাটি। লক্ষ্ণৌ জাদুকর শহর। শহর ত্যাগ করলেই এর কথা ভীষণ ভাবে মনে পড়বে।"

যোগী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলছিল।

নীলাম্বর কৌতূহলী হল, "বাবা, তুমি বৈরাগী কেন হলে ?"

"তুমি—তুমি আমাকে চেনো ?"

"না। আমি কাউকে চিনি না।"

"হ্যাঁ, চেনা অত্যন্ত মুশকিল ; যারা চেনে তাদেরকে কে চিনবে ?" নীলাম্বরের মনে হল, সন্ন্যাসী অত্যন্ত জ্ঞানী। সে উপনিষদে এ সব পড়েছে।

'বাবা আমি জানতে পারি, তুমি কে ?"

"কি ব্যাপার ? তুমি ফিরিঙ্গি সরকারের চর নাকি ?"

"আমি···আমি চর নই।" গৌতম আহত হল।

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

"তাহলে শোনো ! আমি রাজা বেণী বাহাদুরের ছেলে। রাজা বেণী বাহাদুরের নাম শুনেছ তো ? তিনি মির্জা জমালউদ্দীন হায়দর নবাব শুজাদ্দৌলার নায়েব ছিলেন। তিনি জনাবে আলী এবং আলীজার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। গঙ্গার এক দিকে আমার বাহাদুর পিতা আর

বেনারসের রাজা বলবন্ত সিং আর গোসাই হিম্মত বাহাদুর আর অন্য দিকে ফিরিঙ্গি সৈন্য। ফিরিঙ্গিরা আমার পিতার সৈন্যের উপর আচমকা হামলা করেছিল। সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে গেল। আমার পিতা ঘোড়ায় বসে প্রত্যেকটি সৈন্যকে ডাকলেন—"থামো তোমরা! পালাচ্ছ কোথায়?" জনাবে আলী চেঁচালেন—তোমরা নিজেকে মোগল বল অথচ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছ?" কিন্তু আমাদের সৈন্য দুর্গাবতী নদী পার হয়ে পালাতে ব্যস্ত। হাজার হাজার সৈন্য ডুবে মরল। হিন্দুস্তানের ভাগ্যে দুর্দিন লেখা ছিল।" সে দম নেবার জন্য একটু সময় নিল—"তোমার ফিরিঙ্গি সরকারের ধূর্ত চোখ সব কিছু লক্ষ্য করল। তারা বুঝতে পারল, হিন্দুস্তানীদের মধ্যে ঐক্য নেই। একে অপরের চুকলি করতে ব্যস্ত। একে অপরের বিরুদ্ধে বাদশাহকে পরোয়ানা লিখে দিল্লী পাঠাচ্ছে এবং সেই আবার কলকাতায় কম্পানীর খোশামদ করে চলেছে। বিচিত্র দেশের অবস্থা! কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আমার পিতা জনাবে আলীর সবচেয়ে বিশ্বাসী সেবক ছিলেন, কিন্তু দুশমনদের প্ররোচনায় বাধ্য হয়ে তিনিও তাকে নেমকহারাম বললেন।'

"আশ্চর্য!"

"জনাবে আলী মুঁড়িয়াবন ছাওনিতে আমার পিতার তাঁবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর বললেন—'রাজা, তুমিও আমার সঙ্গে শিকার করতে চল।' তিনি বললেন—গোলাম হুজুরের কৃপায় অনেক শিকার করেছে। জনাব আলী বললেন—'আজকের শিকার চিরদিন মনে রাখবার মত।' তিনি আমার বাবাকে নিজের শকটে বসিয়ে নিজের লস্করের দিকে নিয়ে গেলেন। বাবা বুঝতে পারলেন —তাঁকে ধরবার জন্য জাল পাতা হয়েছে। কিন্তু তিনি কিই বা করতে পারতেন! জনাবে আলীর ইশারায় বাবার দুচোখ অন্ধ করে দেওয়া হল। তাঁর এলাকা সরকার কেড়ে নিল। তেরশ' ঘোড়া, আঠারটা হাতী, এবং সম্পূর্ণ এক তোপখানা ছাড়া আমার বাবা বিরাট জমিদারীর মালিক ছিলেন—আমি আজ এই মৃগচর্মের মালিক।"

সন্ন্যাসী চুপ করে গেল।

নীলাম্বর এ গল্প শুনে বিস্মিত হল। যোগী আবার বলল—মৃগ-মরীচিকা কি তা আমি জেনেছি। তুমি কি করে এ সব জানবে! তুমি যে গোলকধাঁধায় আছ—সেখানেই থাকবে। আমি এ সবের ধার ধারি না। রাজত্ব গড়া-ভাঙ্গা, কম্পানীর অনুরাগ-বিদ্বেষ, বাদশাহী মসনদের ক্রোধে—কোনো কিছুরই পরোয়া করি না। আমার বাবার চোখ নষ্ট করা হয়েছিল—আমার চোখ নষ্ট করার ক্ষমতা কার আছে? ঈশ্বর ছাড়া আর কে আমাকে অন্ধ করতে পারে? যাও তোমার দেরী হয়ে গেল। যোগমায়ার মন্দিরে যাও, অসংখ্য দরজা দেখতে পাবে—একটা দরজার পর আরেকটা দরজা, তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা গোলোকধাঁধা! তুমি ভাবছ গোলোকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসেছ? কত ভুল ধারণা তোমার! যাও।

নীলাম্বর মাটি কুড়িয়ে নিজের বাহনের দিকে চলল। বাহন সীতাপুরের পথে পাড়ি দিল।

পুলের কাছাকাছি এসে বাহন থেমে গেল। চালক নেমে এল। এক ইংরেজ সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে, এক পথচারীকে বেত্রাঘাত করছিল।

এদিকে মুঁড়িয়াবন ছাওনি। চারিদিকে ইংরেজদের কুঠী, মেস ও গির্জাঘর।

গোরা সৈন্য লোকটাকে বেত্রাঘাত করে ঘোড়ায় বসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

"শালা! আমাদের খেয়ে আমাদেরই শেষ করতে চলেছ?" গঙ্গাদীন নামক চালক রেগে বলল—"শাহে জমানের সময়ও এই অত্যাচার!" সে বক্‌বক্‌ করে চলল। গৌতম নীলাম্বর নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। রাত্রে সে টিকেত রায়ের ধর্মশালায় আশ্রয় নিল। গঙ্গাদীন বক্‌বক্‌ করে চলেছে। নীলাম্বরের সঙ্গে বাহন থেকে রেসিডেন্সির সেপাহী ও হরকরাও নামল। তাদের দেখে ধর্মশালায় কানাঘুষো শুরু হল—"বাঙ্গালী বাবু! কলকাতা

চলেছেন। ইংরিজি জানেন। এঁকে জিগ্যেস কর, কম্পানী আমাদের কাঁধের ওপর থেকে খাজনার ভার কবে তুলবে? ...শুনেছি লণ্ডনে ভারতের জন্য নতুন নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।...বাংলা ও বিহারে একই নিয়ম চলে না কেন?—এ বাবু সাহেব, খাজনা কম করিয়ে দাও...আমরা মরে গেলাম।" বারান্দায় গৌতমের চারিপাশে ভিড়। এরা সবাই কৃষক, নিজের নিজের ফরিয়াদ নিয়ে রাজধানী চলেছে। এক বুড়ো জমিদার লাঠিতে ভর দিয়ে নীলাম্বরের কাছে এল—"কোথা থেকে এসেছ?"

"বাংলাদেশ থেকে।"

"তা হলে তো আমাদের অতিথি। আমার বাড়ী চল, তোমার সেবা করব।"

গৌতম অভিভূত হয়ে গেল। এরা সবাই কত সরল, কত ভালো!

"ভাইয়া।" বুড়ো চারিদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—"তোমার ইংরেজ সরকারকে বলো, আমাদের ওপরে যেন আর অত্যাচার না করে।"

গৌতম মৌন।

"লক্ষ্ণৌ থেকে আসছ তো?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে আমাদের বাদশাহের দর্শন করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের বাদশাহকে কম্পানী বাহাদুর টাকার জন্য বিরক্ত করছে?"

"জানিনা।"

"তুমি সব জান বাঙ্গালীবাবু!" বুড়ো উত্তেজিত—"কম্পানী বাহাদুর নিজের কথার খেলাপ করেছে। আমাদের বাদশাহকে তারা কথা দিয়েছিল...বক্সারের যুদ্ধে হেরে যাবার পর..."

আবার বক্সার! আবার জনাবে আলী! বুড়ো নীলাম্বরকে দেখল—"জানি তোমার এসব কথা ভাল লাগবে না কিন্তু আমরা

ক্ষত-বিক্ষত! কম্পানী আমাদের দেশের সর্বনাশ করেছে।... তুমি জান, বক্সারের হার স্বীকার করার পর জনাবে আলী ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তি অনুসারে ইংরেজরা পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য কোনমতেই রাখতে পারে না। কিন্তু এখন মণ্ডিয়ানা ছাওনি দেখ। আসিফউদ্দৌলা বৈকুণ্ঠবাসী কলকাতায় লিখেছিল—ইংরেজ সৈন্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের খাবার তারাই খাচ্ছে। ঘরের লোকেরা খেতে পাচ্ছে না। খেত খামার আজ মরুভূমি! আর কতদিন তোমরা আমার গলায় ছুরি চালাবে?' ভাই আমরা আজ সর্বস্ব খোয়াতে বসেছি। আমাদের দুঃখ কবে শেষ হবে? মুনরো যখন আক্রমণ করেছিল, আমাদের সৈন্য 'ইয়া হোসেন। ইয়া হোসেন!' বলতে বলতে কাঁদছিল আর যুদ্ধ করে চলেছিল। আমরা আমাদের দেশের জন্য এইভাবে যুদ্ধ করেছি। লাভ কি? আজ আমাদের কাছে খাজনা দেবারও পয়সা নেই।" বুড়ো চুপ হয়ে গেল।

প্রদীপ শিখা কেঁপে উঠল। গৌতম নড়েচড়ে বসল।

সতেরো

কলকাতা ফিরে এসে গৌতম আবার নিজের পরিচিত জগতে হারিয়ে গেল। অফিস, বই, ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্র এবং ভাষণ। সুজাতা দেবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে ধর্মতলা গিয়ে জানতে পারল, তিনি মারা গেছেন। বর্ষার সময় তিনি পায়ে হেঁটে কালীঘাটে যাচ্ছিলেন, সাপের কামড়ে পথেই মারা গেলেন।...গ্রিল সাহেব তখন কোথাও টুরে গিয়েছেন।

নীলাম্বর বারান্দায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসল। ল্যাম্প জ্বালাল ও ইংরেজী শব্দকোষের পাতা উল্টে চলল।

তার আর ভাল লাগে না। চাকরি ভাল লাগেনা। মাণিকতলা

থেকে কিছু দূরে একটা চমৎকার বাগান বাড়ী। সেখানে প্রায়ই অনেক নবযুবক আসত। এখানে রামমোহনবাবু থাকতেন।

একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সে রামমোহনবাবুর ভাষণ শুনতে গেল। তাঁর কথা শুনে ধর্ম সম্বন্ধে তার মনে সংশয় দেখা দিল। সে কালীঘাট যাওয়া বন্ধ করল। বাড়ীতে বসে-বসে সে ভাবত।··· শ্রীরামপুরের ক্রীশ্চান ঠিক বলে? রামমোহনবাবুর পথই কি ঠিক? কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, কে বলতে পারে? সে কি এসব ভাবতে-ভাবতে বিরক্ত হয়ে স্থির করল যতক্ষণ নিজে পড়াশুনা করে এসব বিস্তারিতভাবে জেনে না নেবে ততক্ষণ ভাবনাচিন্তা ত্যাগ করবে। কম্পানী বাহাদুরের চাকরি ছেড়ে সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। এই কলেজেই শহরের অভিজাত ধনী প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথও পড়ত। তারা দুজনেই ক্লাসের শেষে পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করত, আত্মা ও পরমাত্মা নিয়ে বিচার বিনিময় করত। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে সুফী সম্প্রদায়ের কিছু বিশেষত্ব ছিল। নীলাম্বরের ভাল লাগত। সন্ধ্যেবেলা তারা রামমোহন রায়ের বাড়ী গিয়ে বিদ্বান ও দার্শনিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করত; অথবা একেশ্বরবাদী ভজন গাইত অথবা নীলাম্বর দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে হাফিজের ফারসী গজল শুনত।

যে বছর নীলাম্বর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল সেই বছর থেকে সে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী কার্যকর্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সেই সময়ই সে একদিন কাগজে পড়ল—ম্রিল হার্বাড এশলে মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর মেমসাহেব, যাঁকে তিনি মাত্র তিন বছর আগে বিয়ে করেছিলেন—নিজের দু'বছরের ছেলেকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে ছিলেন।

ম্রিল বিহারের এক অখ্যাত ডাকবাংলায় মারা গেল। কোথাও ঘুরে এসে সে আরামচেয়ারে শুয়েছিল। সেই সময় হরকরা তার কুরূপা, রাগী ও বদমেজাজী স্ত্রীর চিঠি তার হাতে দিল। চিঠিতে দার্জিলিং সোসাইটির খবর লেখা। চিঠি পড়ে ম্রিল খবরের কাগজের দিকে হাত বাড়াতে-বাড়াতে বুঝতে পারল, তার সময় হয়ে

এসেছে। মৃত্যু তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সে চাকর ও পেয়াদাদের ডাকতে চাইল, পারল না। পরমুহূর্তে সব শেষ।

কলকাতার সংবাদপত্রে তার বিষয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। জীবনের চল্লিশটি বছর সে বাংলাদেশে কাটিয়ে ছিল। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে বিশেষ সভা ডাকল। কলেজে শোক সভা হল। তার পনের দিন পর লোক তাকে ভুলে গেল।

মাদ্রাজের চীফ জাস্টিসের ছোটবোন—লেডী এশ্‌লে—যিনি মদ খেতে খুব ভালবাসতেন, জিনিসপত্র নিয়ে ইংলেণ্ড চলে গেলেন। মরবার সময় স্রিল কোটিপতি। তার টাকা 'সিটি'তেও খাটানো হত, কলকাতায়ও।

বড় হয়ে তার ছেলে স্রিল এডবিন ডেরিক এশ্‌লে নিজের বাবার পুঁজি নিয়ে বিরাট ব্যবসা শুরু করল···ব্রিটেনের সাম্রাজ্য এখন সারা বিশ্বে। বর্মায় টিনের ব্যবসা, মালয়ে রবারের জঙ্গল এবং চীনে আফিমের কারবার।

১৮৫৭-র পরে হিন্দুস্তান ভিক্টোরিয়া এম্পায়ারে যুক্ত হল। পূর্বদেশ এখন স্বর্গীয় স্রিল হার্বাড এশ্‌লের পুত্র লর্ড স্রিল ডেরিক এডবিন এশ্‌লের অধীনে।

আঠার

প্রফেসর গৌতম নীলাম্বর দত্ত ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমে বাসায় পা দিয়েছেন কি মালী খবর দিল—মেটিয়াব্রুজের নবাব সাহেব এতক্ষণ তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন, এক্ষুনি ফিরেছেন।

···নীলাম্বর দত্ত বাইরে এলেন, চারিদিক তাকালেন। সামনে এক বৃদ্ধ শ্বেত বস্ত্র পরে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে রাস্তার ধার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নীলাম্বর দত্ত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

বৃদ্ধের মুখে খুশীর ঝলক দেখা গেল। "আহা! মিঁয়া নীলাম্বর দত্ত সাহেব!"

"ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

"ব্যাপার কি নবাব সাহেব, ভালো তো? অবশ্য আপনার সঙ্গে সময় করে দেখাও করতে পারি না। আসুন, একটু বসবেন চলুন আমার বাড়ীতে। আমার নাতনী স্কুলের বোর্ডিং হাউস থেকে বাড়ী এসেছে। তাকে দেখে যান।" নবাব সাহেবের হাত ধরে তিনি তাঁকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলেন।

"আচ্ছা মিয়াঁ!" নবাব সাহেব ড্রইংরুমের সোফায় বসতে-বসতে বললেন—"তোমাকে দেখেছি। তোমার ছেলে-মেয়েদেরও দেখব। জানিনা, আবার এই শরীর নিয়ে ফিরে আসতে পারব কি না।"

"কেন? কোথায় চলেছেন? লক্ষ্ণৌ?"

"কর্বালা-এ-মুয়ল্লা চললাম। খোদা যেন ওখানকার মাটিতেই আমাকে বিশ্রাম দেন। এখানে আর কিই-বা আছে!" তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল। পকেট থেকে রুমাল বের করে তিনি চোখ মুছলেন।

নীলাম্বর দত্ত তাঁকে সশ্রদ্ধ নেত্রে দেখলেন। চাকর চা নিয়ে এল। ড্রইংরুম সমকালীন ভিক্টোরিয়ান প্রথায় সাজানো। দেওয়ালে অসংখ্য ছবি। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ফটোগ্রাফ। দরজায় মোতির পর্দা। পাশের ঘর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে।

পিয়ানোর সুর খুব উদাস-উদাস মনে হল নীলাম্বর দত্তের। তিনি ডাকলেন—"নীলিমা, বাজনা বন্ধ করে এদিকে এস। মেটিয়াব্রুজ থেকে তোমার জ্যাঠামশায় এসেছেন।"

পনেরো বছরের একটি মেয়ে এল।

"আমার নাতনি—নীলিমা। আপনি একে এখনো দেখেননি স্কুলের বোর্ডিং হাউসেই থাকে।" তিনি ধোঁয়াটে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন—পনের বছরের নীলিমা বিয়ে করে ছেলেমেয়ে মানুষ না করে ইংরিজি পড়ছে আর অরগ্যান বাজাচ্ছে।

নবাব কম্মন জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন—আলোর

ঝলমল কলকাতা ! নীলাম্বর দত্ত এদিক ওদিক কার কথা বললেন। দুজনের কাছেই এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা যেতে পারে। নবাব কম্মন অতীত স্মরণ করছেন। নীলাম্বর দত্তের কাছে অতীত অর্থহীন। ভবিষ্যত তার সামনে। ভদ্রতার খাতিরে দুজনেই দুজনের সঙ্গে দেখা করেন। লক্ষ্ণৌ আর সেই লক্ষ্ণৌ রইল না; মেটিয়াব্রুজে আরেকটা লক্ষ্ণৌ গড়া হল। সেই সময় নবাব কম্মন, যিনি সুলতানে আলমের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন; নীলাম্বর দত্তকে ডেকে পাঠালেন। নীলাম্বর তখন কলকাতার নামকরা সাংবাদিক। বছরে দু-একবার সে নবাব সাহেবের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করত। রাজা সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে যখন সঙ্গীতের নবজাগরণ শুরু হল আর সারা দেশের সঙ্গীতজ্ঞ কলকাতায় আসতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় নীলাম্বর প্রায়ই নবাব কম্মনকে নতুন সঙ্গীত গোষ্ঠীতে আমন্ত্রণ জানাতেন।

ল্যাম্প জ্বলে উঠল। নীলাম্বর দত্তের বাড়ীর ওপর তলায় তাঁর ছেলে মনোরঞ্জন দত্ত ও তার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠিরা ইংরেজি নাটকের রিহর্সাল দিচ্ছে। মনোরঞ্জনের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক নতুন নাটক লিখেছে। হাসি ঠাট্টায় আসর জমে উঠেছে। ক্যাম্বেল মেডিকল স্কুলের এক ছেলে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

মনোরঞ্জন তরুলতার নূতন ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করছে। হারমোনিয়ামের সুর, ছেলেদের হাসি, নাটকের সংলাপ, এ ঘরে ভেসে আসছে।

নবাব সাহেব দাড়িতে আঙুল চালাচ্ছেন। এ এক নূতন জগৎ ! অন্য যুগ ! ১৮৭১ সাল। পৃথিবী বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, নবাব কামাল রেজার পৃথিবী। নীলাম্বর দত্ত ও তাঁর সমবয়স্ক। কিন্তু গৌতম নীলাম্বরের পৃথিবী এখন যৌবনে সবে মাত্র পা দিয়েছে। সহসা নবাব কম্মন যেন অনুভব করলেন গৌতমের এই পৃথিবীতে তাঁর স্থান নেই। রাজবাটীর আধুনিক ড্রইং রুমে বসে বসে তাঁর নিজেকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ মনে হল।

"নবাব সাহেব। মনোরঞ্জন লক্ষ্ণৌ এর ক্যানিং কলেজ আইন

শাস্ত্রের লেকচারার নিযুক্ত হয়েছে।"—গৌতম নীলাম্বরের কথা তাঁর কানে এল। মনে হল কথাগুলো যেন অন্য কোনো জগৎ থেকে এসেছে। "আচ্ছা! মাশা আল্লা!" তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—"খুব ভালো কথা। তাঁর উন্নতি কামনা করি।" তিনি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। নীলাম্বর দত্তকে খোদা হাফিজ বলে মাটিয়াব্রুজ চলে গেলেন।

রাত গভীর। নবাব কম্মনের প্রস্থানের পর নীলাম্বর দত্ত ড্রইং-রুমে পায়চারি করে বেড়ালেন। আলমারী থেকে একটা বই টেনে পাতা উলটালেন। বইয়ে মন বসল না। বুক র‍্যাকে ঠাসা বই। ফাইল, আইনের পত্রিকা, কমিটির রিপোর্ট। চারিদিকে সমস্যা। সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছেন—নীলাম্বর দত্তর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বাইরে পথে ল্যাম্প টিম টিম করছে। হঠাৎ নগরীর রাণী কলকাতাকে অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হল। তিনি বাইরে বারান্দায় এলেন। এমনি রাতেই দুঃখী আত্মারা চলাফেরা করে। বারান্দায় কলা ও পাম গাছের পাতা স্থির। পাকা ইঁদারার একধারে একটি কুকুর ল্যাজ গুটিয়ে বসে আছে, তিনি বারান্দা থেকে নামলেন লনে পায়চারি করতে লাগলেন। চাঁদ ঠিক "দত্ত হাউসের" সামনে। চাঁদের আলো ইঁদারার জলে। আলোয়—আলোয় পূর্ণিমা! সেই রাতে চাঁদ তাঁকে অনেক গল্প শোনাল।

সেই রাতে মাণিকতলা থেকে ফিরে এসে নবাব অবুল মনসুর কমালউদ্দীন আলী রাজা বাহাদুর গার্ডেনরীচে পৌঁছলেন যেখানে মাটিয়াব্রুজে তাঁর বাড়ী। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবলেন—মানুষ একবারই পৃথিবীতে আসে তা[illegible]য়ে শেষ হয়ে যায়। বেঁচে থাকার জন্য একটিমাত্র জীবন মানুষ [illegible]য়। তারপর মরে যায়। আবার কখনো এই পৃথিবী দেখতে পায় না। শাহেন্‌জমন গাজীউদ্দীন হায়দার মারা গেলেন, মারা গেলেন হায়দার ও মোহম্মদ আলী শাহ, আজমঙ্গ আলী শাহ। নবাব কম্মনের চোখের সামনে দিয়ে এরা এক এক করে চলে গেলেন। এরা সবাই অবধপুরীর রাজা ছিলেন।

মৃত্যু নির্দয় ভাবে এদের কেড়ে নিল। পাশের 'রাধা মন্‌জিলে' সুলতানে-আলম ওয়াজিদ আলী শাহ্ 'ইন্দ্রসভা'র আয়োজন করছেন। বেচারা সুলতান! 'ইন্দ্রসভা'র আয়োজন করে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—তিনি এখনো লক্ষ্ণৌর কেশরবাগেই আছেন—তিনিও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বাদশাহী মসনদ হোক আর শরশয্যা হোক, সুদিন হোক আর দুর্দিন হোক—মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর পর কি হয় কে জানে! এ সব ভাবতে-ভাবতে নবাব কম্মন অত্যন্ত ভীত হলেন। বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে তিনি ডাক দিতে চাইলেন। আলী আর হোসেন আর আব্বাস আলমদারকে ডাকতে চাইলেন। কিন্তু কণ্ঠ থেকে কোন স্বর বেরোলো না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। পালঙ্ক থেকে উঠতে চাইলেন নবাব কম্মন, পারলেন না।

কর্বলা-এ মুঅল্লা'র যাত্রী নবাব অবুল মনসুর কামালউদ্দীন আলী রাজা বাহাদুর, জীবনের শেষ পথের পথিক হলেন।

উনিশ

নবাব সফদরজংগ থেকে সুলতানে আলম পর্যন্ত—নয় জন রাজা অবধপুরী গদীতে বসেছিলেন। সুলতানে আলমের সময় সলীমন সাহেব এলেন। সফদরজংগ নিজের বাহুবলে নিজের রাজত্বের গোড়া পত্তন করেছিলেন। দিল্লীর পতনের পর হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বৈভবশালী রাজত্ব তিনিই গড়েছিলেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজা লুই চতুর্দশের চেয়েও পরাক্রমশালী। সলীমন সাহেব সম্ভবত এঁদের সকলের চেয়ে পরাক্রমশালী। একটি মাত্র ফুঁ দিয়ে তিনি এই নগরীর সমস্ত বৈভব নিভিয়ে দিলেন। হ্যাভ্‌লক জিতলেন, সুলতানে-আলম হারলেন। ইন্দ্রপুরী লক্ষ্ণৌ মরুভূমি হল। কেশরবাগের নাচের মজলিসে নাচ, এশবাগের মেলা মহরম ও রামলীলার উৎসব নিমেষে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। দিলখুশা মহল জনশূন্য। হজরত

গঞ্জ-এ এখন ইংরিজি বইয়ের দোকান, আমীনাবাদে কলেজ আর স্কুল। সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার জালের মত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। অযোধ্যার রামচন্দ্রের ঐতিহ্য মাটিতে মিশে গেছে। ভোর হল, চোখ খুলবার পর দেখা গেল, এ সমস্ত যেন ওমর খৈয়ামের যাতু ছিল। অদৃশ্য কোনো মহাশক্তি যেন যাত্ন বলে সব তছনছ করে দিল। অন্তিম দৃশ্য শুরু হবার আগেই ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রপতন ঘটল।

প্রফেসর নীলাম্বর দত্ত কলকাতা থেকে নিজের ছেলেকে দেখতে লক্ষ্মৌ এসেছিলেন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফিটনে বসে যখন শহরের দিকে এগোলেন, মনে হল, এ লক্ষ্মৌকে তিনি যেন চেনেন না। আটচল্লিশ বছর আগে ১৮২৩ সালে তিনি শেষবার লক্ষ্মৌ এসেছিলেন। সে লক্ষ্মৌ ছিল শাহী মসনদের লক্ষ্মৌ। আজকের লক্ষ্মৌ ইংরেজের লক্ষ্মৌ। এখন কোতওয়ালের যায়গায় ইংরেজ ডেপুটি কমিশনের শাসন। ডেপুটি কমিশনার সয়াদত্ত আলী খাঁর কুঠী 'মুরবখ্‌শ'-এ থাকেন। বেচারা সয়াদত্ত আলী খাঁর 'হয়াতবখ্‌শ' কুঠী এখন ব্যাংক হাউস। কেশরবাগে এখন ক্যানিং কলেজ যেখানে কলকাতার মনোরঞ্জন দত্ত আইনের অধ্যাপক। শহরের গলি, পাড়া যেখানে ছিল, যেমন ছিল, তেমনই আছে—শুধু সময় বদলেছে। সময় কোটিপতিকে ভিখিরি করেছে, গরীব বড়লোক হয়েছে। বিদ্রোহীরা ফাঁসির মঞ্চে উঠছে, স্বামী ভক্তরা অর্থ ও সম্মান পেয়েছে। আখতর পিয়া ওয়াজিদ আলী শাহ স্বর্গে। তাঁর জন্য অনেক অশ্রু এখন ঝরেছে—ঝরছে। হায় অবধপুরী। স্বয়ং রামচন্দ্রের ভাগ্যেও বনবাস জুটেছিল—এই অবধপুরী থেকেই।

ফিটন শহরের দিকে চলেছে। কোচওয়ান নীলাম্বর দত্তকে বলল—"বাবু সাহেব, পেছনে সইস বসে আছে, তাকে উপরে ডেকে নিই? সইস বৃদ্ধ—পড়ে মরে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ ডেকে নাও।" একজন বৃদ্ধ লাফিয়ে কোচবাক্সে উঠে বসল।

"বাবু সাহেব, কলকাতা থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও ভাবছি, কলকাতা চলে যাই। এখানে আর ভাল লাগে না।" যুবক বলল।

"কে হে?" বৃদ্ধ সইস যুবককে জিগ্যেস করল।

"কলকাতার বাবু!" যুবক চেঁচিয়ে বলল। তার নাম শম্ভু।

"কলকাতা··· !" বৃদ্ধ গঙ্গাদীন কানে কম শোনে। ঘুরে বাঙ্গালী বাবুকে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টি ধোঁয়াটে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝতে পারলেন না?" শম্ভু বলল।

পরমুহূর্তেই গঙ্গাদীনের কাতর ভাবে নীলাম্বর দত্তের কাছে প্রার্থনা —"বাবু সাহেব! আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিন। ওখানে আমাদের বাদশাহ থাকেন।"

যুবক হেসে উঠল—"হুজুর, বাবার কথায় কান দেবেন না।"

ট্রেন থেকে কোনো যাত্রী স্টেশনে নামলেই ইনি বলেন—"মুসাফির মিঁয়া, তুমি কলকাতা থেকে আসছ, আমাকেও কলকাতা পাঠিয়ে দাও! আরে আমাদের বাদশাহ স্বয়ং কলকাতায় দুঃখ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন আর তার ওপর ইনি গিয়ে তাঁর কাঁধের বোঝা হবেন।"

নীলাম্বর দত্ত কোনো কথা বললেন না। ফিটন এখন আমীনাবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে।

"সরকার আগে কখনো লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

"অনেক দিন আগে। তোমার জন্মও হয়নি তখন। গাজী-উদ্দীন হায়দারের সময়।"

"বাবা!" কোচওয়ান আবার বৃদ্ধ সইসের কানে চেঁচিয়ে বলল—"বাবু সাহেব তোমার গাজীউদ্দীন হায়দারের সময় এখানে এসেছিলেন।"

কোচওয়ান নীলাম্বর দত্তকে বলল—"বাবা বলেন যে তিনি গাজীউদ্দীন হায়দারের চোবদার ছিলেন। সুলতানে আলমও এঁকে খুব ভালবাসতেন।

"খোদাবন্দ!" গঙ্গাদীন বলল—"সুলতানে আলমকে আপনারা

দেখেছেন ? ভাল আছেন তিনি ?" তারপর বৃদ্ধ সইস শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

নীলাম্বর দত্ত কি বলবেন, বুঝতে পারলেন না। এদের ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁকে মুগ্ধ করল। ফিটন এখন আমীনাবাদের দিকে চলেছে।

হঠাৎ কোচওয়ান চেঁচিয়ে উঠল—"আরে···ও, বুড়ী! সর সামনে থেকে! প্রাণে মরতে চাস নাকি ?" সে লাগাম টেনে ফিটন থামিয়ে দিল। এক বৃদ্ধা, প্রায় জীর্ণ বেশে তার সামনে এসে দাঁড়াল এবং হাত মেলে ধরল—"জনাব আমীর! যুগ-যুগ ধরে রাজত্ব কর! হোসেনের দুঃখ ছাড়া, খোদা তোমাকে যেন আর কোনো দুঃখ না দেন।"

নীলাম্বর দত্ত ফিটনে বসে বসে ভাবছিলেন—"লক্ষ্ণৌ কি এখন বৃদ্ধদের শহরে পরিণত হয়েছে? এখানকার যুবকরা কোথায় গেলেন ?"

বৃদ্ধা সেই ভাবে চোখ বন্ধ করে বলে চলল—"হোসেনের দুঃখ ছাড়া, খোদা তোমাকে যেন আর কোনো দুঃখ না দেন।"

গৌতম নীলাম্বর চমকে উঠলেন।

গলার স্বর চেনা। খুব ভালো-ভালো কথা শুনেছিলেন তিনি এই কণ্ঠস্বরেই। রাগ ও রাগিনী—হাসির ফুলঝুরি—এই ধ্বনির মাধ্যমেই তাঁর কাছে এসেছিল।

তিনি তাড়াতাড়ি চশমা ঠিক করে ফিটনের বাইরে তাকালেন। কিন্তু কোথায় সেই সুন্দর ছন্দময় মধুর স্বরের অধিকারিণী! তার যায়গায় এক বৃদ্ধা ভিখিরি দাঁড়িয়ে।

"একে কিছু দেবেন না খোদাবন্দ!" শম্ভু কোচ বাক্স থেকে একটু ঝুঁকে আস্তে-আস্তে বলল—"কোকেন খাওয়া এর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যা পায়, তা দিয়ে কোকেন কিনে খায়।"

নীলাম্বর দত্ত পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ভিখিরি হাতে রাখল।

ভিখারিনী চোখ কুঁচকে ফিটনে বসা বাঙ্গালী বাবুকে দেখল—লম্বা, শ্বেত দাড়ি, শ্বেত ধুতি, দামী শালে শরীর ঢাকা, পায়ের ওপরে

পা রেখে বসে আছেন।

গৌতম নীলাম্বর ভিখারিনীকে চিনতে পারল। তাঁর সামনে চম্পা দাঁড়িয়ে।

হাতের মুঠোয় টাকাটা নিয়ে বৃদ্ধা তাঁকে দেখল। তার পর যন্ত্রবৎ, অনেকবার বলা কথাগুলো আরেকবার বলল—"হুজুর! গরীবের ঈশ্বর! আপনি যেন আপনার নাতি-নাতনীদের ঐশ্বর্য দেখে যেতে পারেন। যুদ্ধে আমার এই অবস্থা হয়েছে।...আমি ভিখিরি নই।...একদিন আমার দরজায় হাতী বাঁধা থাকত। এখন এক মুঠো খাবারও জোটে না! আল্লা আপনাকে... !" শম্ভু চাবুক চালাল। ফিটন এগিয়ে চলল। শম্ভু হাসতে-হাসতে বলল—বুড়ীর কথা শুনলেন হুজুর! দরজায় হাতী বাঁধা থাকত! যাকে দেখে তাকেই একথা বলে—আমি দেওয়ান ছিলাম, আমি মন্ত্রী ছিলাম। "যত্ত সব! বাবাকেই ধরুন না, বলে—যুদ্ধের আগে আমি বাদশাহের চোবদার ছিলাম। এখন সইস।"

চম্পা রুপোর টাকা হাতে পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর এক অন্ধকার গলিতে ঢুকে গেল। সেখানে কোকেন বিক্রি হয়।

আমীনাবাদের চৌমাথা ছেড়ে যখন ফিটন এগিয়ে চলেছিল, নীলাম্বর দত্ত একবার পেছনে ফিরে দেখল। চম্পা রাস্তার ধারে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় টাকাটা উল্টে-পাল্টে দেখছে। সে সম্ভবত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চুল রূপোর মত চক্‌চক্ করছে। চেহারায় অনেক রেখা। জামা কাপড় শতচ্ছিন্ন।

তিনি ফিটনে হেলান দিয়ে বসলেন। তাঁর চোখ আপনা-আপনিই বুজে এল।

গৌতম নীলাম্বর আজ স্বচক্ষে বৈশালীর আম্রপালীকে দেখলেন।

গোমতী নদীর ধারে, সিল্লাড়াওয়ালীর কুঠি। বাবু মনোরঞ্জন দত্ত সেই কুঠি ভাড়া নিয়েছেন।

সেদিন রাত্রে মনোরঞ্জন যখন ঘুমোতে গেলেন আর বাড়ীর শেষ আলোটিও যখন নিভে গেল, নীলাম্বর দত্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বারান্দার সিঁড়ি গোমতীর জলে এসে নেমেছে। সামনে গোমতী নদী। শীতল রাত। তাঁর ঘুম এল না তিনি গোমতীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর পেছনে ভূতের জলুস চলেছে। সামনে পরীরা নাচছে। কিছু দূরে, পুলের ধারে নৌকো বাঁধা। চণ্ডীমন্দির এখান থেকে দেখা যায়। তাঁর পেছনে-পেছনে যে ভূতরা নাচতে-নাচতে আসছে, তিনি তাদের সবাইকে চেনেন।

অবধের বাদশাহরা···সয়াদত আলী খাঁ আর জন বেলী, নাসিরুদ্দীন হায়দার আর তার বিলিতি নাপিত, কুদসিয়া মহল ও বৃদ্ধ মোহম্মদ আলী শাহ, ম্রিল হার্বাড এশলে আর সুজাতা, লর্ড ম্যাকলে ও বিশপ হায়বর—ইংরেজ ভূতরা তাঁর পরিচিত। এদের জীবনকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। এদের উত্থান ও পতন—সব তাঁর দেখা। আর কি দেখবেন তিনি? নদী বয়ে চলেছে। নদীর ধারে বাড়ী। বাড়ীতে মানুষ শুয়ে আছে। নদীর ধারে পাথর ছড়ানো। সময়ও বয়ে চলেছে—সময় পাথরে জমে আছে। শ্মশানে চিতা জ্বলছে। কে জানে আজ রাতে কারা মারা গেল!

নীলাম্বর দত্ত এগিয়ে চললেন।

সামনে শ্মশান। শ্মশানে কালী নাচছে—কালী যিনি সৃষ্টির ধ্বংস হলে তাকে আত্মসাৎ করেন। যে ইন্দ্রজিৎ, সমস্ত কামনা-বাসনা জয় করে তাঁর সত্তায় লীন হতে পারে; কেবল সেই নির্ভয়ে তাঁর আরাধনা করতে পারে।

শ্মশান-এখানে কামনা-বাসনা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এবং, কালী যে বুদ্ধি ও বাক্‌চেতনার উর্ধ্বে, সমস্ত প্রাণী জগৎকে বিনাশের রূপ দেয়, শূন্যকে পূর্ণ করে-পূর্ণ যাহা শান্তি এবং প্রকাশ।

কালী—যার পরিণাম সমাধি—তিনি বিস্তৃত কেননা তিনি অসীম, মহাশক্তি। মায়ার উর্ধ্বে কেননা স্বয়ং মায়া হয়ে তিনি সংসার সৃষ্টি করেন।

শ্মশানে কালী শিবের শ্বেত শরীরের উপর দাঁড়িয়ে। ধুঁয়া এবং অগ্নি শিখার মধ্যে নৃত্য করছেন। কালী—তারা ধূমবতী। সৃষ্টি তাঁর শান্তরসের নৃত্য দেখে জয় জয়কার করছে।

গৌতম নীলাম্বর কালীকে সতী, গৌরী ও যোগমায়া রূপে দেখেছে। শ্মশানে তিনি তাঁকে দেখলেন এবং চিনলেন—

কিছুক্ষণ পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনি চিতা দেখলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে, সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিতে ফিরে এলেন। ভোর ছটার সময় বাড়ীর বৌ বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ঝিকে ডেকে ওঠালেন! "চায়ের জল চাপাও। ছোটকুর স্কুল ভোর ছটা থেকে। ঝি প্রথমে বাথরুমে স্নানের জন্য জল ভরে রাখবে। বড় সাহেব, আর ভাই সাহেবের শেভ করার জন্য গরম জল রাখবে। তারপর চায়ের ব্যবস্থা করবে।

ঘরের বৌ পুজোর জন্য ঠাকুর ঘরে গেলেন। ঠাকুর ঘর দোতালায়, পুবদিকের বারান্দায়। কামরায় গুমোট গরম। বর্ষাকাল। ঠাকুর ঘরের দরজা খুলতেই গোপীনাথ ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি শূন্যে। তাঁর পরণের বাসন্তী রঙের বস্ত্র নকল হীরে লাগানো, মাথার মুকুটে একটু বাঁকা এক ময়ূরপঙ্খী। হাতে পেতলের বাঁশী। পায়ের উপর পা রেখে, হাতে বাঁশি নিয়ে তিনি পেতলের মন্দিরে বন্দী। তিনি হাসছিলেন। অন্ধকার ঘরে তাঁর হাসি রহস্যময় মনে হচ্ছিল। কামরায় মশা ভন-ভন করছে। ঠাকুর ঘরের বারান্দায় দুই মেয়ে শুয়ে আছে। বারান্দার এক পাশে একটা ছোট্ট ঘর। ঘরে মেয়েদের ভাই শুয়ে আছে। পাশেই টেবিল ফ্যান ঘুরে চলেছে। কামরা ভর্তি বই। ফারসী, উর্দু আর ইংরেজি বই। পালঙ্কের পাশে ছোট্ট টেবিলের ওপর। উর্দুর নূতন প্রগতিশীল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা। দেওয়ালে নন্দলাল বোস, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খাস্তগীর, এম, এল, সেন ও রবি বর্মার ওয়াটার পেন্টিংগ টাঙ্গানো।' জহরলাল নেহরুর ছবিও। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ ফটো ফ্রেমে বাঁধানো। ১৯৩৭-৩৮ এবং ৩৯ সালে যে ট্রফী জেতা হয়েছিল তার গ্রুপ, কোণে হলদে প্রায় আর একটা গ্রুপ ছবি—তার নীচে ১৮৯৭ লেখা।

এটাও ক্যানিং কলেজের ছাত্রদের ছবি। ছবিটি ছেলের পিতার ছাত্রজীবনের। ছবিতে ছেলেটার বাবা, গলাবন্ধ কোট পরে, মাথায় টুপি পরে, ফ্যাকালটি অফ আর্টসের চেয়ারম্যান স্বর্গীয় ডক্টর মনোরঞ্জন দত্ত'র পেছনে দাঁড়িয়ে। ডক্টর মনোরঞ্জন দত্ত, সাদা লম্বা দাড়ি রাখতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত, এবং তিনি নিজের ছড়ির ওপরে ভর দিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ডক্টর মনোরঞ্জন দত্ত এই বাড়ীতে প্রায় সত্তর বছর আগে ভাড়াটে ছিলেন।

নীচের তলায় বাড়ীর ড্রইংরুম। ড্রইংরুমে একটা তৈল চিত্র—এক বৃদ্ধ দামী জামা ও পায়জামা পরে মাথায় টুপি পরে, সৌখিন চেয়ারে বসে আছেন। একজন ইংরেজ আর্টিস্ট ছবিটি এঁকেছিলেন। ছবির নীচে উর্দুতে লেখা—'রায়জাদা বক্সী মেহতাব চন্দ।' পাশাপাশি তিনটে ঘর। একটা কামরার মেঝে কাঠের। এখানে বাদ্যযন্ত্র রাখা। সন্ধ্যেবেলা সুরজ বখ্শ সাহেব নাচ ও গান শেখাতেন।

এই প্রাসাদটি এখানকার বাসিন্দাদের জন্য বিশ্বকেন্দ্র।

এখান থেকেই প্রিয়জনদের ছবি উঠেছে, কনেরা পাল্কী চড়ে দূরদেশে গেছে, বরযাত্রী এসেছে, বরযাত্রী গেছে। এখানে ছেলে-মেয়ের জন্ম হয়েছে, তারা হেসেছে, কেঁদেছে। সব ঘরেই এ সব হয়। ঘর চুপচাপ এইসব দেখতে থাকে। ঘরের গল্প কেউ শোনেনা। ঘর যেন সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে।…'দেখব, তুমি কতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে।' সময় বলে। ঘর চুপ থাকে। বছর কেটে যায়। শতাব্দী বদলে যায়। ঋতু আসে—যায়। ঘর সময়ের সমুদ্রে নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সময়ের সমুদ্রে এক ঢেউ ওঠে। ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

নবাব সয়াদত আলী খাঁর অর্থমন্ত্রী রায়জাদা বক্সী মেহতাব চন্দ এই প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। এখন তাঁরই এক বংশধর এই প্রাসাদে আছেন। তিনি নামকরা ব্যারিস্টার। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ে। তিন জনেই ছাত্র!

ব্যারিস্টার সাহেব প্রায় সব সময়ই কংগ্রেস নিয়ে মেতে থাকতেন

অথবা 'জমানা' বা 'নিগার' পত্রিকায় উর্দু শায়েরী নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। প্র্যাক্‌টিস করবার সময় কোথায়? জমিদারী আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। ছেলেকে কেম্ব্রিজ পাঠাবার কথা ভাবছিলেন কারণ—তিনি সেখানেই পড়েছিলেন। মেয়ে দুটোর যৌতুকও প্রস্তুত। ছেলেটা এখন ওপরে ছাদে মশারি টাঙ্গিয়ে শুয়ে আছে। স্ত্রীর খটর মটরে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্ত্রী খড়ম পায়ে সকালবেলা সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন। সকলেরই ঘুম ভাঙ্গত। তিনি কখনো ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলতেন, কখনো রান্নাঘরের সাজসরঞ্জাম দেখতেন, কখনো এই ঘর, কখনো সেই ঘর—তারপর সব শেষে পূজোর ঘরে ঢুকতেন আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রামায়ণ পড়তেন।

মিষ্টি হাওয়া বইছে। নদীর ওপরে এখনো কুয়াশা। মোতিমহল ব্রিজ নিস্তব্ধ।

"উঠে পড় বিটিয়া! আজ থেকে তোমার স্কুল সকালে বসছে।" ঝি যমুনা ছোট মেয়েকে ওঠাল। মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসল। আজ থেকে স্কুল খুলছে। বিছানা ছেড়ে সে বাথরুমের দিকে পালাল।

বড় মেয়ে আলস্যে পাশ ফিরে শুল। দু'চোখ খুলে নদীর দিকে তাকাল। তার বয়স সতের আঠারো। কলেজে পড়ে। তার কলেজ চোদ্দই জুলাই খুলছে। শীঘ্রই তার বিয়ে। কলেজের চিন্তা সে এখন থেকেই ত্যাগ করেছে। নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে নদী দেখছে।

তার ভাইটা চোখ ঘষতে ঘষতে ঘরে এল ও আলস্যে মাতালের মত টলতে-টলতে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদী দেখতে লাগল। হাই তুলতে-তুলতে কাঁধে তোয়ালে নিয়ে বেসুরো স্বরে গাইতে-গাইতে বাথরুমের দিকে গেল।

"স্কুলে নিজের বন্ধুদের বলিস, সন্ধ্যেবেলা বড়কীর লহঙ্গায় (সায়া জাতীয় জিনিস) ফুল তুলে দেয় যেন।" ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে গৃহকর্ত্রী ছোট মেয়েকে হুকুম দিলেন। মেয়েটি চা খেয়ে, হাতে বই

নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিল। নীচে লা মার্টিনিয়ারের বাসের হর্ণ বাজছে। "আচ্ছা, আচ্ছা, বলে দেব।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সে বলল।

গৃহকর্ত্রী খাঁটি পূরবী। বড়মেয়েকে তিনি 'বড়কী' বলতেন, ছোটকে 'ছোটকী'। ব্যারিস্টার সাহেব তাঁকে বোম্বাই, কোলকাতা, কাশ্মীর—সব জায়গায় ঘুরিয়ে এনেছেন। প্রতি বছর, নিয়মিত নৈনীতাল ও মুসৌরী যেতেন কিন্তু তবুও কথায় পূরবী টান যেমন ছিল, তেমনই রইল।

বড় মেয়ে বারান্দা থেকে নীচে দেখল। নীচে বাগানের পথে স্কুল-বাস দাঁড়িয়ে। বাসে দু'চারটে হিন্দুস্থানী মেয়ে ছাড়া, সব ইংরেজ। হিন্দুস্থানী মেয়েদের মধ্যে একজন বাস থেকে মাথা বের করে বলল—"ম্যরিস কলেজ থেকে ফিরে আমরা সন্ধ্যেবেলা আসব।"

"আচ্ছা।"

বাস গেটের বাইরে চলে গেল।

ছেলেটা শিস্ দিতে দিতে নীচে নামল। হাতের নোটবুক স্টাইল করে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে, বেপরোয়া ভাবে সাইকেল চেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা হল।

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঁকি দিয়েছে। সবাই এখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। আবার সন্ধ্যে হয়ে এল। চারিদিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। চার পাঁচটি মেয়ের হাসিতে নদীর ধারের এই বাড়ীটি মুখর হয়ে উঠল। চার পাঁচটি যুবতী জানলার ধারে বসে এমন ভাবে হাসছিল যেন দুঃখ ও শোক কি—তারা জানে না···সত্যিই দুঃখ কি, তারা জানে না।

ছতরমনজিলের পেছনে সূর্য ডুবল। নদীর বুকে ভাসমান নৌকায় প্রদীপ জ্বলে উঠল। নদীর যাত্রা অব্যাহত।

কুড়ি

সূর্য যখন জাম গাছের পেছনে হেলে পড়ে, তখন ফিটন গাড়ী মরিস কলেজ থেকে গোমতী নদীর পুলের দিকে আসে। পুল থেকে নেমে একটা পথ সোজা এগিয়ে গেছে। নাম—য়্যুনিভার্সিটি রোড। নদীর ধারে ধারে ছুটো কাঁচা সড়কও এগিয়ে গেছে। এখান থেকে চাঁদ বাগ পর্যন্ত নানা কুঠি। ওদিকে ইজাবেলা থবর্ণ কলেজ। শান্ত পরিবেশ। কদাচিৎ কখনও মোটর বা সাইকেল চেপে কলেজের কোনো মেয়ে বা ছেলে এই পথ ধরে যায়। উপনগর অথবা ডালিগঞ্জগামী এক্কা ফয়জাবাদ রোড ধরে যেত। তারপর মুসলিম গর্লস্ কলেজ। অরহর ও আখের খেত। পেপার মিল। ওই দিকে কাঠের একটা পুলও ছিল। চিরৈয়া ঝিল বা ভঁয়সাকুড যাবার পথও ওই দিকে। সেকেন্দারবাগ ও বনারসী বাগ যেতে হলে কাঠের পুল পেরিয়ে যেতে হয়। গবর্ণমেণ্ট হাউসের পেছনে গাজীউদ্দীন হায়দারের নহর, লা মার্টিনিয়ার কলেজ আর লা মার্টিনিয়ার রোড, সবুজ কুঞ্জের মাঝ দিয়ে পথ বেরিয়ে দিলখুশা প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেছে, তারও আগে বিস্তৃত সবুজ ছাঁওনী।

মোতীমহল ব্রিজে দাঁড়িয়ে মরিস কলেজ ও কেশরবাগ। তারপর হাসীনাবাদ পার্ক ও আমীরউদ্দোলা পার্ক। পথ চৌক ও নক্‌খাসের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেখানে মেডিকল কলেজ, শাহমীনার সমাধি ও ইমামবাড়া হুসেনাবাদ। আকবরী দরজা ও গোল দরজাও সেখানে। এদিককার এলাকা পুরোনো লক্ষ্ণৌ। নূতন লক্ষ্ণৌ থেকে বেশ দূরে। কিন্তু নূতন লক্ষ্ণৌর মধ্যেও পুরোনো শহর দেখা যেত। শাহী কুঠির মধ্যে গর্ভণমেণ্ট হাউস। নদীর ধারে মোতীমহলে ইমপিরিয়ল ব্যাংক। হজরত গঞ্জের মাঝে বেগম কুঠি। ছতর মন্‌জিলে ক্লাব। বড় অদ্ভূত শহর। সব কিছু নতুন হয়েও এখানে পুরোনো। সময় অত্যন্ত কৃপণের মত এই শহরকে একটু একটু করে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ফিটন ধীরে ধীরে সন্ধ্যের গোলাপী আলোয় একটু একটু করে মোতীমহল ব্রিজ পর্যন্ত গড়ায়। পুল থেকে নেমে য়্যুনিভার্সিটি রোড না ধরে, ফিটন প্রায়ই বাঁ হাতের কাঁচা পথে নেমে যেত।

গঙ্গাদীন কোচবক্সে বসে। কিছুক্ষণ পর সে বলত—"রাণী বেটী, সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠি যাবেন না?"

"আমি তোমাকে গল্পটা এখান থেকে শোনাব।" (তলঅত বলল—) "পুরোনো গল্প নানা ভাবেই বলা যায়। আমার মাথায় কিন্তু ঢুকছে না, কি ভাবে বলি। কোন পাত্রের মহত্ব সবচেয়ে বেশী …গল্প কোথা থেকে শুরু হবে…ক্লাইম্যাক্স কোথায়…নায়িকা কে ছিল…আর, গল্পের শেষ কি ভাবে হওয়া উচিত…নায়ক কে…এই গল্প কে শুনছে…কে শোনাচ্ছে? আমার বড় ভাই কামাল বলত, কোনদিন ধংশ ও এ সব ঠিক করবে। কামাল কিছুই স্থির করতে পারেনি। চম্পাবাঈকে জিগ্যেস করতে যাবে।…হ্যাঁ যাব—গঙ্গাদীনের প্রশ্নের উত্তর আমি এতক্ষণে দিই!"…ফিটন ধীরে ধীরে কাঁচাপথে চলত। নীরবতা—আশ্চর্য নীরবতা! এই পথে, বেশ কিছুটা দূরে শ্মশান। নদীর জলে মোতীমহলের রূপালী ছায়া, ছতর মন্‌জিলের সোনালী গম্বুজ আর নজর অশরফের ইমামবড়ার প্রতিচ্ছবি। নদী এই সব ইমারতের নীচ দিয়ে শান্ত ভাবে এগিয়ে চলেছে। সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির সিঁড়িও নদীর জলে নেমে এসেছে। এটা দোতলা প্রাসাদ এবং এর তিনটি অষ্টকোণ প্রাচীর বেরিয়ে থাকার দরুণ একে সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠি বলা হয়। শীতের সময় সূর্য বড় তাড়াতাড়ি অস্ত যায়।

'রাণী বিটিয়া, নির্মলা বিটিয়ার বাড়ী যাবে না?' গঙ্গাদীন কোচবক্সে বসে-বসে জিগ্যেস করে।

"ফিটন গাড়ী সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির ভেতরে প্রবেশ করে।"

"এই নাও, 'ভইয়ন' তোমার আমদ-নামা দিয়ে গেছে।" লাজ ছাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে।

"ভইয়ন, অর্থাৎ হরিশংকর শ্রীবাস্তব সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র… বি. এ. ক্লাসে ফারসী ভাষা পড়েছে।

নির্মলার বড় বোন লাজ বারান্দায় জমিয়ে বসত। তার মুখ নদীর দিকে—'এবার বল জান কুসুমকে কি বলল ?'

মরিস কলেজের পলিটিক্স। লাজ সেখানে ফিফ্‌থ ইয়ার পাশ করেছে। কিছু দিনের মধ্যেই তার বিয়ে হবে।

'রাজকুমারী লাহোর চলেছে।' আমি বললাম।

'লাহোর! বাপ রে বাপ!'

'লাহোর অনেক দূরে। মনে হয় অন্য পৃথিবীতে।'

" 'আহ হা!' পায়ে নূপুর বেঁধে নির্মলা বাইরে আসত। মরিস কলেজে সে আমার সতীর্থ। গত বছর সে অসুস্থ হয়। ডাক্তাররা বলেন, স্কুল আর মরিস কলেজ এক সঙ্গে চলতে পারে না। আজকাল আমাদের বন্ধু মালতীর ভাই রোজ সন্ধ্যেবেলা তাকে এক ঘণ্টা করে রেয়াজ করায়। সে শম্ভু মহারাজ—ঘরানার কথক শিখছিল। লা মার্টিনিয়ার আমি ও নির্মলা একই ক্লাসের ছাত্রী। দু বছর পর আমরা সিনিয়র কেম্ব্রিজে যোগ দেব।

'নতুন নতুন জায়গা দেখতে আমারও ভীষণ ইচ্ছে করে।'—নির্মলা মনের কথা বলে ফেলল।

সূর্য ডুবছে। নদীর বুকে রঙিন তরঙ্গ। এই জগৎ, এই সৃষ্টি—জীবনের পরের যে ধূসর ছবি আমাদের মনে আঁকা, আমাদের সামনে সব যেন তরঙ্গের মত নাচতে থাকত। শাহী জমানার ইমারৎ, বোট ক্লাবের নৌকো, সিলাড়াওয়ালী কুঠির সংরক্ষিত, শ্যাওলা জড়ানো সিঁড়ি ভূগোলের বিশেষজ্ঞের মত আমাদের ভাবিয়ে তুলত—এর পর কি আছে আর কি বা হয়?

"আপ্পীর দিদি বিয়ের পর কোথায় যাবেন?" প্রায়ই নির্মলা জিগ্যেস করত।

" 'যেখানে ভাইয়া সাহেব নিয়ে যাবেন।' আমার উত্তর।

" 'ভাইয়া সাহেব কোথায় নিয়ে যাবেন?'

" 'আমি কি জানি!' আমি থমকে যেতাম।"

কামাল ঘরের কোণ থেকে উঠে সামনে এল, যেন তলঅতের কথা শেষ হবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তারপর সে তলঅতের কথা ধরে

বলতে শুরু করল—

"ভাইয়া সাহেব, যিনি আমার খুড়তুতো ভাই, আমার জামাইবাবুও হতে পারতেন। ছোটবেলা থেকে আমি এই রকমই শুনে আসছি। ভাইয়া সাহেব লেখাপড়া শিখে যখন বড় হবেন—আপ্পীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। তিনি ছিলেন আমার আপন ভাইয়ের মত। তাঁকে আমি মনে মনে আমার 'হিরো' ভাবতাম।

"ভাইয়া সাহেব অনেক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ড-এর লুজান শহরের একটি স্কুলে পড়তেন। কাকা সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হঠাৎ মারা যান। তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি বোম্বাই থেকে সোজা আমাদের এখানে—আলমোড়ায় এলেন। তিনি ফুলস্যুট পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুইস স্কুলের হলদে আর ধূসর রঙের মাফলারে তাঁর মুখ ঢাকা। কাঁদতে-কাঁদতে চোখ জবা ফুলের মত লাল। তিনি আমাকে আর আপ্পীকে কাছে ডাকলেন আর জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তলঅত তখন খুব ছোট। অন্যান্য ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সে এলাচ গাছের ওপর চড়ে হোম ওয়ার্ক করছিল।

"তারপর থেকে ভাইয়া সাহেব আমাদের সঙ্গেই থাকতে লাগলেন। বাবার চোখের মণি ছিলেন তিনি। ভাইয়া সাহেবের মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিলেন।

"স্বর্গীয় কাকার একমাত্র সন্তান ভাইয়া সাহেব। গরমের ছুটির পর ভাইয়া সাহেবকে লা মার্টিনিয়ারে ভর্তি করা হল। প্রায় দেড় শত বছর আগে নবাব আসিফউদ্দৌলার খাস মোসাহেব জেনারেল ক্লড মার্টিন, ইউরোপীয়ানদের জন্য এ কলেজের গোড়া পত্তন করেন।

"আমার প্রশ্ন, এই গল্পের নায়ক ভাইয়া সাহেব হতে পারেন কি? আমি যখন গল্প শোনাতে বসে, গল্পের পাত্রদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি। ভাবছি, গল্পের নায়ক অথবা হীরো'র সব গুণই পেয়েছিলেন ভাইয়া সাহেব।

এতক্ষণ তোমাকে আমি যা বললাম—তুমি বুদ্ধিমতী, নিজেই অনুমান করে নিতে পার যে এমন রোম্যান্টিক ব্যাক-গ্রাউণ্ড হিরোর

ছাড়া আর কার হতে পারে! তুমি যদি পুরোনো ধাঁচের পাঠক নাও হও তাহলে তুমি এ-কথা মেনে বিরক্ত হতে পার যে ভাইয়া সাহেব দেখতেও খুব সুন্দর ছিলেন। সুপুরুষ বলা যায়। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে থাকার দরুণ তাঁর কথায় ফরাসী টান ছিল। তিনি যখন ইংরিজি বলবার সময় 'ত' আর 'দ' ফরাসী টানে কথা বলতেন—অনুমান করতে পার, ইজাবেলা থবর্ণ কলেজের মেয়েরা কি ভাবে ঘায়েল হত।

"আপ্পী ও ভাইয়া সাহেব এক অপরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁদের পৃথক-পৃথক দল ছিল। লজ্জাবতী শ্রীবাস্তব আপ্পী'র সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী। লাজ, আমার প্রিয় বন্ধু হরিশংকরের ছোট বোন। জানিনা কেন, চম্পাবাইজীর কথা উঠলেই লাজ চুপ করে যেত। হরিশংকর বোকার মত সিগারেট খেতো। চম্পাবাইজী কোনো দলের সদস্যাই ছিলেন না। তিনি কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া থাকতেন। আমরা সকলেই সকলকে বুঝতে পারতাম কিন্তু চম্পাবাইজীকে আমরা কোনোদিন বুঝতে পারিনি। আমাদের সকলের ব্যাকগ্রাউণ্ড এক, আমরা সবাই প্রায় সমাজের একই ক্লাসের কিন্তু চম্পাবাইজীকে দেখে আমার সন্দেহ হত, তিনি সম্ভবত লোয়ার মিডিল ক্লাসের।"

"ভাইয়া সাহেব যখন 'ল' পড়ছিলেন, চম্পাবাইজী তখন বেনারস ছেড়ে ইজাবেলা থবর্ণ কলেজে ভর্তি হলেন।"

"১৯৪১ সাল।"

"আপ্পা লা মার্টিনিয়ার ছেড়ে ইজাবেলা-থবর্ণ কলেজে ঢুকেছেন।

"যে বছর আপ্পী পড়া শেষ করলেন, সেই বছরেই আপ্পী ও ভাইয়া সাহেবেব বিয়ে ভেঙে গেল।

"আমি ভাবছি, ঠিক যে ভাবে আমি বিগত দিনের গল্প বলতে চাই, সেইভাবে সম্ভবত বলতে পারব না।···অনেক ছোট-ছোট কথা, ছোট ঘটনাও আছে···বাদশাহ-বাগের সেই রাজকীয় দরজা···ফুলের বাগান···সেই বুড়ীটি যে প্রতিদিন পথে তেঁতুল বাছতে বেরোতো এবং একদিন হঠাৎ ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিয়ে মরল।

"এ সমস্ত ছোট-ছোট ঘটনা আমার কাছে বড় ঘটনা। তোমার এসব অর্থহীন মনে হতে পারে। আমি চাই যে কোনো উপায়ে ঠিক সেই পরিবেশ সেই সময়ের প্রভাব, স্বপ্নের মত কৈফিয়ত দ্বিতীয়বার ফিরে আসে যেন, এই ব্যাপারটিকে পরিবেশের সঙ্গে 'কমিউনিকেশন' বলা হয় এবং খুব কঠিন জিনিস। আমি আর্টিস্ট নই। কমিউনিকেট করতে পারব না।

"যাক···যা কিছু আমার চোখের সামনে ভাসছে, আমি তুলে নিচ্ছি :

"দেখুন, এটা সেনেট হল। আমি উঁচু জায়গায় বসে আছি আর রেডিওর জন্য কনভোকেশনের কমেন্ট্রি শোনাচ্ছি। নীচে বাগানে কালো টুপী ও গাউন গায়ে অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময় বয়ে চলেছে। সময়ের প্রবাহ আমি অনুভব করছি। ভাইয়া সাহেবকে দেখতে পেলাম। তিনি নীচে লাল্ কালীনওয়ালা পথে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে চম্পাবাইজী। তাঁরা পাশাপাশি হেঁটে ভিড় থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। লাউডস্পীকারে হঠাৎ নিউ থিয়েটার্সের কোনো ছবির জন্য পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া গান বাজছে।'– হায় কুচকে ওয়াজ কৈসী-আওয়াজ—' গানের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে। ওই দূরে ভাইস-চ্যান্সেলার দাঁড়িয়ে। তিনি এদিকে আসছেন। তাঁর সঙ্গে কালো গাউন পরা অনেক প্রফেসর। একদিন এমন আসবে, যখন এঁরা কেউ থাকবেন না। সময় কাউকে ক্ষমা করে না।

"আমি মাইক্রোফোন আমার পূজ্য বন্ধু হরিশংকরকে দিলাম।"

···"হ্যালো। আমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছ!···হ্যালো।"

"হ্যালো···হ্যাঁ" ল্যাম্পের পেছনে অন্ধকারে বসে আছে হরিশংকর। মনে হচ্ছে সে অদৃশ্য। শুধু তার ধ্বনি স্টেজের বাইরে থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"হ্যালো···হ্যালো···আমি হরিশংকর আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমি হরিশংকর শ্রীবাস্তব, কামালের অন্তরঙ্গ বন্ধু,···লাজ ও নির্মলার একমাত্র ভাই, চম্পাবাইজীর বন্ধু! আমার ভূমিকারও কম মূল্য নয়। আমি এই গল্পে বা নাটকে অনেকগুলো চরিত্র একসঙ্গে করছি।

কোথা থেকে কথা আরম্ভ করব, রঙ্গমঞ্চে কখন উঠব—বুঝতে পারছি না।"

(তলঅত আবার বলতে শুরু করল)—"ফিটন গাড়ী নড়ে উঠল তারপর সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির মধ্যে প্রবেশ করল। ঘটনা সেই বছরের যে বছর আপ্পীর এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে গিয়েছিল।

"লাজ বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরনে বাসন্তী শাড়ী। পায়ে মল। আপ্পীও তার সাথেই বেরোলেন। তিনি পায়ে কিছুই পরেন নি এখনও।"

" 'আমি একলাফে গাড়ীর বাইরে। তার পর এক দৌড়ে সোজা বাড়ীর ভেতরে।"

"আপ্পী, আপনি কখন এসেছেন? কামাল ভাইয়া স্টেশন থেকে এসেই আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন। এক্ষুণি আমি ভৈসাকুণ্ড হয়ে আসছি। দেখলাম চম্পাবাইজীর বাগানে দু'জনে বসে আছে।"

"দুজন কে?"

"ভাইয়া সাহেব ও কম্মন ভাইয়া···অমলতাসের গাছের নীচে বসে আছেন তাঁরা, চম্পাবাইজী, মামার ঘরে। আমাদের ফিটন আসছিল ওদিক দিয়েই। আমাদের দেখে চম্পাবাইজী হাত নাড়লেন। হাসলেন। কি সুন্দর লাগছিল তাঁকে দেখতে! আমি এক নিশ্বাসেই বলে গেলাম।"

"আপ্পী ও লাজ ফুলের টবের পাশ দিয়ে, বারান্দা ছুঁয়ে এগিয়ে গেলেন, যেন আমার কথাই শোনেননি। নির্মলা ও মালতী মিউজিক রুমে বসে ছিল। আমি চামেলীর ঝোপ লাফিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেলাম।"

"ভইয়ন মির্জাপুর ও দিল্লী গিয়েছিলেন, না? মালতী জিগ্যেস করল।"

"নির্মলা জানাল: সকালে এসেছেন। এসেই সোজা চম্পাবাইজীর কাছে গেছেন।"

"সেই সময় কদীরের বৌ এর কথা মনে পড়ল। কলেজ থেকে ফিরে যখন চা খাচ্ছিলাম, কদীরের বউ রহস্যজনক ভাবে মুখ ফুলিয়ে

বলেছিল—বড় বিটিয়া বিয়ে করবে না বলেছে।"

"আপ্পীর বিয়ের সময় আমি খুব ভাল ভাল শাড়ী কিনব— নির্মলা বলছিল।"

হঠাৎ তলঅত চুপ করে গেল। "শোনো" সে কামালকে বলল— "আমার অতীত আমার জন্যই অর্থপূর্ণ। অন্যের জন্য—পৃথিবীর জন্য তা অর্থহীন। আমার কথা তাদের ভাল লাগবে কেন!"

"আমার অতীত শুধু আমার।" কামাল তলঅতের কথাই বলল।

হরিশংকরের সংযত কণ্ঠস্বর:

"এই জগৎ, এই সংসার বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত।

"বর্তমানই অতীত হয়। ভবিষ্যৎই হয় বর্তমান।"

"আজ হয় গত কাল। আগামী কাল আজ। সময়ের খেলা আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তলঅত উদাস হয়ে বলল— আমি সময়ের হাতে পড়ে প্রায় পাগল হয়ে গেছি। তোমরা আমাকে সাহায্য করছ না কেন?"

"তলঅত বেগম, সম্ভবত স্বয়ং আইনস্টাইনও তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না!" হরিশংকর বলল।

এরা সকলেই লণ্ডনের সেণ্ট জন্‌সওড-এ বসে আছে।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪। ধূসর বিকেল। এদের প্রতিচ্ছবি দরজার কাঁচে প্রতিফলিত। সেই ছবি কেমন যেন অদ্ভুত, রহস্যময় সময়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তিনটি মানুষ, সময়ের অন্ধকারে প্রায় হারিয়ে যাওয়া তিনটি মানুষ বসে।

তলঅত, ঠিক এই ভাবেই সময়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তলঅত, ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির বারান্দায় বসে নির্মলা ও মালতীর সঙ্গে কথা বলছিল। এই তলঅত আর সেই তলঅতের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু দুই তলঅতের অস্তিত্ব যেন পৃথক-পৃথক। মহাত্মা বুদ্ধ, শাক্যমুনি বলেছিলেন—মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে বদলাচ্ছে। শৈশবে মানুষ যা, যৌবনে ও বার্ধক্যে অন্যরকম। তুমি ঠিক এই মুহূর্তে যা, পরের মুহূর্তে তা নও। শুধু থাকে এক নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর সময় প্রবাহ। দূর পাহাড়ে হিমপ্রবাহ ভেঙ্গে

টুকরো-টুকরো হয়ে বয়ে চলেছে। হাওয়া, অন্ধকার, সময় সেই বরফের টুকরোর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে।

"আমরা আমাদের কথা অনেকবার বলতে চাই। বলে শান্তি পাই।" হরিশংকর বলল—"কেননা আমরা ভয় পাই।"

"আমরা সময় আর অন্ধকার ভয় পাই। আমরা জানি, একদিন সময়ের হাতেই আমরা শেষ হয়ে যাব এবং অন্ধকারের হাতে নিজেকে সঁপে দেব।" তলঅত বলল।

"গৌতম নীলাম্বরও কত ভীতু।" কামাল বলল। "গৌতম নীলাম্বরের কথা ছেড়ে দাও নয়ত আসল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। স্থির করতে হবে, আসল বিষয়টা কি? চৌদ্দ বছর আগেও আমি ছিলাম এবং সময় যদি মেহেরবান হয়, চৌদ্দ বছর পরেও আমি, হরিশংকর থাকবো। তারপর সময়ের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে-কুড়িয়ে আমরা—ছোট-ছোট গিনিপিগ—টুক করে সরে পড়ব। আমাদের সঙ্গে তারাও সরে পড়বে, যাদেরই উল্লেখ কাহিনীতে।"

তলঅত সময়ের ধারায় বইতে-বইতে বসে রইল সেখানে। আবার সময়ের ঠিক সেই ধারায় বইতে-বইতে আর এক জায়গায় সে বসে আছে। তলঅত যেন দুই বিন্দু—দুই বিন্দুর মধ্যে অনেক বছরের ব্যবধান। এই ব্যবধান, এই পার্থক্য ধরেই তো মানুষ এগিয়ে চলে। আরও আগে—আরও, আরও আগে—পেছনে যা আছে রইল। পেছনে ফিরে দেখার সময় যে নেই।…শুধু দুটো তলঅত কেন? হাজার-হাজার তলঅত, টুকরো-টুকরো হয়ে হাজার-হাজার জায়গায় ছড়িয়ে আছে—ঠিক যেন একটা ভাঙ্গা দর্পণে একই প্রতিবিম্বের অনেক টুকরোয় ছড়ানো প্রতিচ্ছবি।

একুশ

লক্ষ্ণৌ—১৯৪০।

সন্ধ্যেবেলা আলো জ্বলে উঠেছে। নদীর ধারে ভেসে থাকা নৌকোয় প্রদীপ জ্বলছে। নদীর যাত্রা অব্যাহত। বারান্দায় ল্যাম্প জ্বলছে। বর্ষার পরওয়ানা প্রাণ দিতে এসেছে ল্যাম্পের প্রকাশে।

মেয়েরা বারান্দায় বসে আছে।

রাত গভীর হলে গঙ্গাদীন নীচে থেকে চেঁচাল—"বিটিয়া, এবার চলুন।"

তলঅত 'শব্ বথৈর' (সব ঠিক রইল) বলল এবং নীচে নেমে ফিটনে রায় বিহারীলাল রোডের দিকে চলল।

ফিটন কিছুক্ষণ চলার পর একটা বড় কুঠির ভেতরে প্রবেশ করল। কুঠির বাঁ-দিকের বাগানে 'রাত-কী-রাণী'র সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ীর লোকেরা পেছনের বারান্দায় বসে।

চেয়ার সাজানো। পালঙ্কের কাছে টেবিল ফ্যান। কাঠের ফ্রেমে জলভরা কলস। কলসের গায়ে চামেলী ফুল জড়ানো। বারান্দায় নামাজের চৌকি। বাড়ীর নাম 'গুলফিসাঁ'। এখানে 'গুলফিসাঁ'-র মত অনেক কুঠী। এখানে একই শ্রেণীর লোকের বাস। এদের সকলের কাছেই মোটরগাড়ী আছে। সবাই ভদ্র-লোক। সকলেই প্রতিষ্ঠিত। এদের সকলেরই জীবন-যাপনের বিধিনিয়ম এক। এদের সুখ-দুঃখ, সমস্যা এক রকমের। এদের আসবাবপত্র, বাগান, বাগানের ফুল, বই, জামা-কাপড়—একরকমের। এদের চাকর—চাকরদের কাজ—একই ধাঁচের।

তলঅতের খানসামাও অন্যান্য বাড়ীর খানসামার মত। তার নাম হুসৈনী।

সব বাবুর্চীর নাম হুসৈনী, হুসেন বক্স বা মদার বক্স। সব ধোপার নাম নত্থু। সব কোচয়ান—গঙ্গাদীন। সব চাকরানীর নাম—বুলাকন, রসুলিয়া, হামিদনের মা এবং মনজুরুন্নিসা। সব

বেয়ারা 'আব্দুল'। যেমন প্রায় সব হোটেলের ভায়োলিন বাদকদের নাম 'টোনী' হয় তেমনি এখানে সব পিতাদের নাম খানবহাদুর, তকী—রজা বহাদুর। উপন্যাসে বর্ণিত পিতাদের নামও তাই এবং আসল পিতাদের নামও তাই। সম্ভবত সেই জন্যই বলা হয় উপন্যাস যথার্থের চিত্রণ করে। অবশ্য আজেবাজে কথা বললে আলাদা কথা।

কদীর মোটর ড্রাইভারের বাড়ী মির্জাপুর। তার মিষ্টি, সুন্দরী বৌয়ের নাম কমরুন্নিসাঁ। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা যখন সকলে বিশ্রাম করত, তখন চাকরদের ঘর থেকে কদীরের গান ভেসে আসত। কদীর 'আল্‌হা' গাইত। ওদিকে গেলেই দেখা যেত—মিয়াঁ কদীর মেঝেতে বসে পেট্রোলের খালি টিন বাজাচ্ছে আর কমরুণ একধারে বসে-বসে কুরুশ দিয়ে জাল বুনছে। আপনাকে দেখে সে পানদান টেনে পান সাজতে আরম্ভ করবে। কমরুণ শ্যামলী-সুন্দরী বিবি। কমরুণ ও কদীর কৃষক সন্তান। ড্রাইভারের চাকরি নেবার আগে কমরুণ কিষাণ-সভার সদস্য ছিল। এ সে যুগের কথা যখন মতিলাল নেহরুর বিলেত-ফেরৎ ছেলে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াত। অবধের কৃষকের সে নেতা। জমিদারী প্রথায় কৃষকের দুর্গতির কথা কদীরের চেয়ে বেশী কে বুঝবে। তাই গুলফিসাঁ-র লনে কামালের বন্ধুগণ যখন সমাজবাদের লম্বা-চওড়া কথা বলত—কদীরও চুপচাপ যে কোনো অছিলায় সেখানে এসে দাঁড়াত, তাদের কথা বুঝবার চেষ্টা করত। কদীরের মনে আছে—তাদের গ্রামের জমিদার ঠাকুর ফুল সিং একবার কর না দেবার জন্য তার সেপাহীদের দিয়ে তার বাপকে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে মেরেছিল। কদীর কলকাতা পালিয়ে গিয়েছিল, ক্লীনরের চাকরি নিয়ে। তার বাড়ীতে এখনো দু'বেলা খাবার জোটে না।

কিন্তু লক্ষ্ণৌ শহরে যা ঘটছে, কদীর কিছুই বুঝতে পারে না। অসন্তোষের মূল কারণ আর্থিক। জমিদার ও কৃষকের লড়াই। বিলিতি সরকার এই লড়াইকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করতে চায় যাতে জনসাধারণ এই সংগ্রামকে গুরুত্ব না দেয়।

কমরুণ বিবি ও কদীরের ভালবাসাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্যান্য চাকর ও বাড়ীর লোকের সামনে তুলে ধরা হত। কমরুণ বিবির কিন্তু অন্যান্য চাকরদের বিবির সঙ্গে হৃদ্যতা নেই কেননা ড্রাইভারের স্ত্রীর স্ট্যাটস, সারভেণ্টস্ কটেজের অন্যান্য চাকরদের স্ট্যাটসের চেয়ে উঁচু। সে দুপুরবেলা, খাবার দাবার সেরে ফন্দনকে কোলে নিয়ে কুঠির ভেতরে চলে আসত। আম্মা বেগম তখন নিজের বেডরুমে পালঙ্কে শুয়ে মাসিক 'নওরংগে-খেয়াল' অথবা 'ইস্মত' পড়তেন, খালা বেগম নমাজের চৌকীর ওপর আধশোয়া, অন্য কোনো অতিথি বেগম শুয়ে অথবা বসে আছেন। পানদান সাজানো।

"কদীর বিবি এসেছে—বস কদীর বিবি !"

কমরুণ অত্যন্ত শিষ্টভাবে আদাব জানিয়ে কালীনের ওপরে বসে পড়ে। ফন্দনকে একদিকে শুইয়ে দেয়। বাজী আম্মা পান সেজে তার দিকে এগিয়ে দেয়।

খালা বেগম জানতে চায় : "বিবি—আজ কি রান্না করলে ?"

"অড়হর ডাল, ভাত ও ভাজা, বেগম সাহিবা !"

খাবার ও রান্নার প্রসঙ্গ চলে। শাক-সবজীর দাম নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর আপনা আপনিই সব চেয়ে প্রিয় প্রসঙ্গ চলে আসে বিয়ে শাদীর গল্প, কুটুমদের কুচক্র। কমরুণ সব আলোচনার মধ্যেই থাকত। কমরুণ যেহেতু 'ড্রাইভারের বিবি'—কদীরও তাকে এই নামেই ডাকত। বিকেল বেলায় কামাল, আপ্পী ও ভাইয়া সাহেব কলেজ থেকে ফিরতেন। ঝিমিয়ে আসা ঘর আবার মুখর হয়ে উঠত। কিছুক্ষণ পরেই মোটর পোর্টিকোয় প্রবেশ করত। কদীর নবাব সাহেবকে চীফ কোর্ট থেকে নিয়ে আসত। মোটর-ধ্বনি শুনে কমরুণ ঘোমটা টেনে কটেজের দিকে চলে যেত।

গঙ্গাদীন সইস ভাইয়া সাহেবের আর্দলী। গঙ্গাদীন ভাইয়া সাহেবের স্বর্গীয় পিতার সেবক। ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে সেও এখানে এসেছিল। আপ্পী ও ভাইয়া সাহেবের বিয়ের ব্যাপারে সে নিজের মতামত জাহির করত না। সকলেই বলত, এ বিয়ে হবেই কিন্তু ভাইয়া সাহেব এ বিষয়ে কোনোদিন কিছু বলেন নি।

বাইশ

চল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে তলঅতের জুনিয়র কেম্বিজ পরীক্ষা। সেই বছর সেপ্টেম্বরে সে ডবল নিমোনিয়ায় ভুগল। পরীক্ষা মাথায় উঠল। সারাক্ষণ সে কাঁদতো—'আমার এক বছর নষ্ট হল।—আমার এক বছর নষ্ট হল।' সকলেই তাকে সান্ত্বনা দিত। ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা কিন্তু সে তার আগে থেকেই শরীর খারাপ করে বসে আছে।

একদিন সকালে হরিশংকর এল। 'তলঅত, তোর মঙ্গল আমরা করবই। আমরা তোকে 'টট্টরওয়ালা' স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। এপ্রিল মাসে হাইস্কুল পরীক্ষা দিবি তারপর আই. এ.-টা কলেজে পড়বি।'

"রঘুবীর মামার স্কুলে?" অসীম আগ্রহে তলঅত জিগ্যেস করল।

"হ্যাঁ" বলেই অন্য দরজা দিয়ে হরিশঙ্কর নাটকীয়ভাবে প্রস্থান করল।

নির্মলা যখন জানতে পারল, তলঅত হাইস্কুল পরীক্ষার পর আই. এ.-টা পড়বে—সেও চেঁচামেচি জুড়ে দিল। অতএব তাকেও লামার্টিনিয়ার ছাড়ানো হল এবং তলঅতের সঙ্গে একই স্কুলে পাঠানো হল।

টট্টরওয়ালা স্কুলের একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে। স্কুল হয় একটি পুরানো শাহী ইমারতে। একে রঘুমামার স্কুলও বলা হয়। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্কুলটি সংযুক্ত। খুব কম ছাত্রী এখানে পড়ে। বাড়ীর মতই স্কুলের পরিবেশ, পাশের ঘরে রঘুমামা সপরিবারে থাকতেন। অত্যন্ত সাধু স্বভাবের ব্যক্তি। মেয়েরা শহরের প্রতিষ্ঠিত পরিবার থেকে মোটরে চড়ে লেখাপড়া শিখতে আসত। লামার্টিনিয়ারের বিশুদ্ধ ইংরিজি পরিবেশের পর তলঅত ও নির্মলার কাছে টট্টরওয়ালা স্কুল যেন এক পৃথক জগৎ। তলঅত ও নির্মলার লালন-পালন এমন এক পরিবারের মধ্যে হয়েছে যাকে

ইণ্ডো-ইয়োরোপিয়ান সভ্যতা বলা যেতে পারে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হাতে মানুষ হয়েছে এরা। মেয়েদের কনভেণ্টে পাঠানো হত। স্বাধীন পরিবেশে মানুষ হয়েও নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এদের নেই। প্রায়ই এদের বিয়ে এদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে করা হত। এরা মডার্ণ কিন্তু আলট্রা-মডার্ণ নয়। পশ্চিমের রং এরা গায়ে মেখেছিল ঠিকই কিন্তু আসলে এরা কট্টর হিন্দুস্থানী। এটা বিলিতি ঔপনিবেশিক সমাজ; জমিদারী সমাজের সাহায্যে এই পরিবর্তনশীল হিন্দুস্থানে পুরোনো মান-সম্ভ্রমের উপর এ বিলিতি সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম, এখানে চলেছে সেই চেতনায় উদ্ভূত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। রঘুমামার স্কুলও সেই আন্দোলনের একাংশ। এখন ভারতীয় পোষাক, ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতীয় সুকুমার শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত লোকদের 'কালো সাহেব' বলে ব্যঙ্গ করা হত। কংগ্রেস আন্দোলন এই নব চেতনার উন্মেষকে উৎসাহিত করল। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি আর ইসলামের স্বর্ণযুগের কথা আউড়ে যেত। একদিকে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনা ও অপরদিকে বিশুদ্ধ ভারতীয় আদর্শ। এখন প্রশ্ন, আসলে ভারতীয় বস্তুটা কি? একটি রাজনৈতিক দলের মন্তব্য—এ সব হিন্দুদের রাজনৈতিক ভড়ং। অন্য রাজনৈতিক দলের মন্তব্য—দেশের আসল নাগরিক—হিন্দু, মুসলমানেরা বিদেশী। 'গুলফিসাঁর সার্ভেণ্ট কটেজের মির্জাপুরের কমরুন্নিসা ও বামদইয়া মালিনের কে কেউ জিগ্যেস করল না, হিন্দুস্থানের আসল নাগরিক তো তোমরা; তোমাদের মতামত কি?

তলঅত ও নির্মলা ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবেশে মানুষ হয়েছে। তাদের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের সমাবেশ। অতএব লামাটিনিয়ার থেকে বেরিয়ে তারা যখন রঘুমামার স্কুলে গেল—বিশেষ অসুবিধে হল না। তারা সেখানেও নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল।

এক বছর হল, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ

করেছে। রাজনৈতিক অবস্থা দিন দিন প্রতিকূল হয়ে উঠছে। মার্চ মাস। মেয়েরা পরীক্ষা দিতে বেনারস যাবার জন্য প্রস্তুত। কামাল ও হরিশংকর তাদের ছাড়তে স্টেশনে এল। "তোমরা যাও, আমাদের পেপার শেষ করে আমরাও আসছি। অনেকদিন রামনগরের আম খাইনি"—কামাল বলল। এসব দুজনের পুরোনো টেক্‌নিক। গরমের ছুটি হল আর দুজনে বেরিয়ে পড়ল—বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, কিছুই বাদ যায় না। স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের অধিবেশন, দিল্লী চললাম। ইন্দিরা নেহরু মিটিং ডাকছেন, এলাহাবাদ যাব।

"বেনারস থেকে কোথায় যাবি ?" নির্মলা জিগ্যেস করল।

"আরে আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের কি কিছু ঠিক থাকে ?" কামাল বলল। মেয়েরা প্ল্যাটফর্মে সুটকেস রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। রঘুমামা দৌড়াদৌড়ি করে যাত্রার ব্যবস্থা করছিলেন।

"আহা ! বড় আমার সন্ন্যাসী রে !" নির্মলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ট্রেন এল। ট্রেন বেনারসের দিকে চলল।

তেইশ

চম্পা আহম্মদ বীসেণ্ট কলেজের ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে নীচের দিকে দেখল। লু বইছে। দূরে একটা হাঁস উড়ছে। নীচে কলেজের বিস্তৃত ময়দান—রোদের প্রচণ্ড তেজ। চম্পা ভাবল, কবে বৃষ্টি পড়বে। ঘণ্টা বাজল। মেয়েরা ক্লাসরুম থেকে বাইরে বেরুল। লীলা ভার্গাবের সঙ্গে সেও সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এল তারপর য়ুনিভারসিটির দিকে এগোলো।

চম্পার জীবন নিয়মে বাঁধা। বীসেণ্ট কলেজ, য়ুনিভারসিটি ও বাড়ী। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। বেনারস শহর, নিজের বাড়ী,

পাড়াপ্রতিবেশী এবং বই। বয়স মাত্র আঠারো কিন্তু তার ভাবনা চিন্তা যেন বৃদ্ধাদের মত। তার অনুভূতি শায়েবের (কবির) মত। শিশুদের মত হাসত, দুঃখ পেত। বাবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মা-ও মধ্যবিত্ত। পরিবারের সঙ্গে কোনো কাহিনী বা ঐতিহ্য জড়িত নেই। চম্পার পিতা উকিল। বাড়ী মোরাদাবাদে। চম্পার দিদিমার বাড়ী বেনারসে। পিতা এখানেই প্রাক্‌টিস্ করতেন। আয় মন্দ নয়। তবে তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন নেই, নেই মোটরকার অথবা রেফ্রিজারেটার। ওরা কোনো কুঠিতে থাকে না। চম্পা মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান। বিয়ের সম্বন্ধও আসছে; যৌতুকও তৈরী। বাড়ীর লোকেরা স্থির করেছে সে বি. এ. পাশ করলেই তার বিয়ে দেওয়া হবে। চম্পা কোনো কনভেণ্ট স্কুলে পড়ে নি। গ্রীষ্মকালে মুসৌরী গিয়ে সে রোলার স্কেটিংও করত না। চম্পার এক মামার অবস্থা খুব ভাল, তাঁর বাড়ী লক্ষ্ণৌতে। সেখানে উজীরহসন রোডে তাঁর কুঠি। চম্পার পিতা রাজনীতি নিয়ে সামান্য মাথা ঘামাতেন। তাঁর চাচা মোরাদাবাদে স্থানীয় মুসলিম লীগের অধ্যক্ষ।

কলেজ থেকে ফিরে চম্পা ছাতের ওপরে নিজের ছোট্ট ঘরে চলে আসত। জানালা দিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো শিবালয়ের কলস দেখত অথবা ইংরেজি উপন্যাস পড়ত। জেন অষ্টেন তার প্রিয় লেখক, উনবিংশ শতাব্দীর কীট্‌স এবং রজেটাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর ছবি দেখত, তার ভাল লাগত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে চম্পা আহমদ রোমাণ্টিক জীব।

লীলা ভার্গাবের সঙ্গে চম্পা বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছল। পরীক্ষার উত্তেজনা। পরিচিতদের ভিড় এই ছেলেমেয়েরা চম্পার জগতের মানুষ। চম্পা ভিড় দেখে আশ্বস্ত হত। এরা সবাই তার বন্ধু—ছাত্র, লেক্‌চারার, ছাত্রী, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী ও বৃদ্ধ প্রফেসার। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের কেন্দ্র। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির জগতে সাম্প্রদায়িকতা, কি ভাবে ঢুকে যায়—চম্পা তা বুঝে পায় না। সাম্প্রদায়িকতা, ঘৃণা, সংকীর্ণতা যে কি তার পরিচয় চম্পা তখনো পায় নি। সে শুধু

এটুকুই জানতে পেরেছে যে তার আশে-পাশের পৃথিবী অশান্ত এবং এই অশান্তি তার শান্তি ভঙ্গ করছে। এইটুকু জেনেই সে কষ্ট পায়।

সামনে একটা বড় বারান্দায় শামিয়ানা টাঙ্গানো হাইস্কুলের সঙ্গীতের পেপার হচ্ছে। মেয়েদের মৃদু কলরব। এদের মধ্যে লক্ষ্ণৌর ছাত্রীরাও রয়েছে। ঘণ্টা বাজল। শামিয়ানার নীচ থেকে মেয়েরা বেরুল। দুটি মেয়ে বাচ্চাদের মত লাফাতে-লাফাতে বেরিয়ে এল।

ইতিমধ্যে দু'জন যুবক যাদের চেহারা দেখে মেয়ে দুটির ভাই মনে হয়, ভিড় থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। রামনগর স্টেট থেকে একটা মোটরগাড়ী এসে দাঁড়াল। সেই দুটি মেয়ে ও দুটি ছেলে মোটরে বসল। পর মুহূর্তে গাড়ী ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

বেনারস পৌঁছে তলঅত, নির্মলা ও অন্যান্য মেয়েরা যেখানে উঠেছিল, সেই জায়গাটা অদ্ভুত ধরণের।

বিরাট এক জায়গা জুড়ে তিনতলা অট্টালিকা। অট্টালিকার মালিক একজন ধনী বিধবা ব্রাহ্মণ ভদ্রমহিলা। তিনি প্রায়ই তীর্থে যেতেন।

সারাদিন সেই বাড়ীতে এমন হৈ চৈ চলত যেন অনেক বরযাত্রী এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। চারিদিকে মেয়েদের দল।

থিওরী অফ মিউজিকের পেপারের দিন কামাল ও হরিশংকর এল। তলঅত ও নির্মলা পরীক্ষা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সরস্বতীর মন্দিরের সামনে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। এই মেয়েদের পাশ থেকেই কামাল ও হরিশংকর বেরিয়ে এল। দুটি মেয়ের মধ্যে একজনের আকর্ষণীয় চেহারা। গায়ের রঙ ফর্সা; রোদে চন্দন কাঠের মত মনে হচ্ছে। তলঅত ও কামাল রামনগরের দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে উঠেছিল। তিনি তলঅত ও কামালের আত্মীয়। কড়া রোদে নদী পার করে চারজন রামনগর পৌঁছল। হঠাৎ তলঅতের কদীরের কথা মনে পড়ল।

"কমরাণের জন্য চুড়ি ও শাড়ী কিনতে হবে।" তলঅত বলল।

"তোমার কেনাকাটা এখনো শুরু হয় নি ?" কামাল আশ্চর্য হল।

"না পয়সা দাও।"

দুজনেই রেগে দুটো মেয়ের দিকে তাকাল।

"আমরা কি মহাজন ? আমাদের কি ব্যবসা আছে নাকি ? কামাল উত্তেজিত হয়ে বলল।

"আমরা দরিদ্র, ব্রহ্মচারী ছাত্র। দান-ধ্যানের পয়সায় আমাদের চলে।

"তবুও আমাদের হৃদয় সম্রাটের মত।" কামাল বলল।

"ঠিক বলেছ।" হরিশংকর কামালকে সমর্থন করল।

"আচ্ছা সরস্বতী মন্দিরে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী রূপবতী—ঐ মেয়েটা কে তুমি যদি বলতে পার—তাহলে বেনারসের সমস্ত চুড়ি তোমাকে কিনে দেব।" কামাল শুধাল।

"কোন্ সুন্দরী রূপবতী ?" তলঅত ও নির্মলা এক অপরকে দেখল।

"তার ঠিকানা ইত্যাদি যদি দিতে পার—হরিশংকরের কৌতূহল চাপা রইল না।

"তোমার জন্য মেয়েদের নাম ঠিকানা জোগাড় করতে-করতে আমি হয়রান"—নির্মলা রেগে উঠল।

এইভাবে ঝগড়া করতে করতে তারা রামনগর পৌঁছাল। সেখানে খসখসের পর্দার ছায়ায় বসে তারা আড্ডা মেরে, আম খেয়ে, গল্প করে সময় কাটাল। দেওয়ান সাহেবের বেগম সাহিবা কাশীর অনেক অভিজাত ধনী পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে হরিশংকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, সবাই খুশী।

বৈশাখ মাস উত্তীর্ণ। আষাঢ় মাসে রেজাল্ট বেরুল। চম্পা আহমদ পাশ করেছে। তার যাত্রা হল শুরু। লক্ষৌতে মামু মিয়াঁকে চিঠি লেখা হল—জুলাই মাসে চম্পা আসছে।

লীলাকে তার ঘরে নামিয়ে দেবার পর সে রোজকার মত বাড়ী পৌঁছাল। দাই এক্কা থেকে নেমে ফাটক খুলল। সে বাড়ীর

ভেতরে ঢুকল ও বারান্দায় বসে পড়ল। পাশের বাড়ীতে রেডিয়ো বাজছে। লক্ষ্ণৌ থেকে খবর শোনানো হচ্ছে। চম্পার পিতা বৈঠকখানায় কোনো মক্কেলের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত।

"তোমার চিঠি এসেছে" চম্পার মা নীল রঙের চ্যাপ্টা খাম তার হাতে দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে চিঠি খুলল। বারান্দায় ল্যাম্প জ্বালিয়ে চিঠি পড়তে লাগল। অজানা লোকের চিঠি, মেয়েলী হাতের লেখা। মুসৌরী থেকে এসেছে, ইংরিজিতে লেখা। সম্বোধন—"মাই ডিয়ার চম্পা।" অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পত্র।

—"জেনে খুব খুশী হলাম, তুমি এ বছর আমাদের কলেজে পড়তে আসছ।" কলেজের নানা খবর তাতে লেখা। হস্টেলের যাবতীয় খবর, ফ্যাকল্টির নানা খবর চিঠিতে। শেষে লেখা, নতুন মেয়ে বলে সে এই পত্র লেখিকার চার্জে থাকবে। সে তার অফিসিয়াল এডভাইজর। অতএব ষোল তারিখে যখন চম্পা কলেজ পৌঁছবে, সে যেন ফ্লোরেন্স হলের সিঁড়ির কাছে তার সঙ্গে দেখা করে। চম্পার কোনো অসুবিধে হবে না।

চিঠির নীচে পত্র লেখিকার নাম—

তহমীনা রজা, রোজ মাউণ্ট, মুসৌরী।

চম্পা অবাক হয়ে গেল। তহমীনা রজা কে? তার ঠিকানা সে কি করে জোগাড় করল। চিঠিটা অত্যন্ত রহস্যময়। এরকম ঘটনা শুধু উপন্যাসেই ঘটে; তার মনে হল—সে যেন এক বিচিত্র জগতে প্রবেশ করতে চলেছে।

তার ধারণা ভুল নয়।

চব্বিশ

কথামত পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় ষোলো তারিখে চম্পার সঙ্গে তহমীনা রজার দেখা হল। চম্পা অবাক হয়ে চারিদিকে দেখছিল হঠাৎ তার

সমবয়স্কা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে তাকে জিগ্যেস করল—"তোমার নামই চম্পা আহমদ না ?"

"হ্যাঁ।"

"এস আমার সঙ্গে।"

পরমুহূর্তেই চম্পা চাঁদবাগের দুনিয়ায় মিশে গেল। সেইদিন রাতে হলে কলেজের আদব-কায়দা এবং পরম্পরা নিয়ে একটা লেক্‌চার হল। এখানকার জীবনের নানা দিকের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হল। চম্পা জানতে পারল, প্রতি বছর নতুন ছাত্রীদের নাম ও ঠিকানা কলেজের সিনিয়র ছাত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সিনিয়র ছাত্রীদের মধ্যে একজনকে 'এডভাইসর' নিযুক্ত করা হয়।

তহমীনার বোন তলঅত আরা ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাব সঙ্গে সে তাকে বলল—"আরে চম্পাবাইজী, তোমাকে আমি বেনারসে দেখেছি।"

চম্পা অন্য মেয়েদের সঙ্গে গুলফিসাঁও গেল।

সকলে তার সঙ্গে খুব সহজ ভাবে মেলামেশা করল। সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিও তাকে স্বাগত জানাল। শংকর শ্রীবাস্তব তার জন্য চায়ের ট্রে নিয়ে এল।

এক রবিবার বিকেলবেলা সে 'গুলফিসাঁ' পৌঁছল। তলঅত এবং তহমীনা পেছন দিককার বারান্দার সাইড রুমে জানালার ধারে বসে ছিল। পেঁয়াজ ও লঙ্কার ঝুড়ি মেঝেতে রাখা। নির্মলা আলু কাটছে। সম্ভবত সন্ধ্যেবেলা তাদের বাড়ীতে পার্টি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

চম্পাও আলু কাটতে ব্যস্ত। সেই সময় ভাইয়া সাহেব এলেন। তাঁর হাতে টেনিস র‍্যাকেট! খুব সুন্দর লাগছে তাঁকে। ভাইয়া সাহেব সাধারণত বাড়ীর ভেতরে আসেন না, বিশেষ করে যখন তহমীনার বন্ধুরা থাকে, কেননা তহমীনার বন্ধুকে তিনি "ক্রাউড" মনে করেন এবং "ক্রাউড"-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বনিবনা নেই। তহমীনার আসল কমরেড কামাল ও হরিশংকর। আজ তিনি কিন্তু ভেতরে এলেন।

চম্পা বসে-বসে আলু কাটছে আঙুল বাঁচিয়ে। ভাইয়া সাহেব সন্ধ্যেবেলার ডিনারের ব্যাপারে তহমীনাকে কিছু জিগ্যেস করতে এসেছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলে তিনি ফিরে গেলেন।

কিন্তু নিজের কামরায় গিয়ে তিনি গঙ্গাদীনকে ডেকে পাঠালেন—"ওই যে নতুন মেয়েটি ভেতরে বসে আছে—কে রে?"

"জানিনা হুজুর।" গঙ্গাদীন ঘাবড়ে গেল। ভাইয়া সাহেব আজ পর্যন্ত মেয়েদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন গঙ্গাদীনকে করেন নি। বড় বিটিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে—

"বড় বিটিয়ার কাছে চাঁদবাগ থেকে কেউ এসেছে।"

"আচ্ছা যাও।"

কামাল এল কিন্তু তাকে কিই বা জিগ্যেস করা যায়! তলঅতকে এ বিষয়ে কিছু বলাই বৃথা কেননা ও যদি একবার জানতে পেরে যায় তাহলে পৃথিবীময় সকলকে বলে বেড়াবে। কি ঝামেলা রে বাবা! তহমীনার সঙ্গে 'অফিসিয়লি' তিনি যুক্ত হয়েছেন তাই অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকানোও পাপ!! কয়েদীদের মত তাঁর অবস্থা!

আসল ব্যাপার, তিনি নিতান্ত একা।

ভাইয়া সাহেব নিজের ব্যক্তিত্বের রোমান্সে নিজেকেই ঘিরে ফেলেছেন।

চম্পাকে অমলা বলল—"এই মহাশয় তহমীনার ফিয়াঁসে কিন্তু তহমীনা এঁকে একদম লিফ্‌ট দেয় না।"

"আশ্চর্য! কিরকম 'টিপিকাল' পরিস্থিতি! 'গুলফিসাঁ'-র মত এবং এরকম অনেক প্রাসাদের লোকেদের যত গল্প সে পড়েছে প্রায় সব গল্পই 'টিপিকাল'।

খুব কাছ থেকে দেখলে অবশ্য গল্পে কিছুই পাওয়া যাবে না। অন্যের জীবনকে যে গল্প বা কাহিনী মনে করে—বস্তুতঃ তার জীবনও একটা গল্প। এই গল্পের পাঠক অন্য সবাই—সমস্ত পৃথিবী। চম্পা একথা জানত না।

বর্ষা কেটে যায়। কার্তিক পূর্ণিমা; পৌষ-মাঘ মাসের হাওয়া। বাগানে কুয়াশা। রাতের ফুলে ভোরের শিশিরকণা! চাঁদবাগে বড়দিনের আয়োজন। বড়লোক লেটেষ্ট ফ্যাশানের ওভারকোট সেলাই করালেন। গরীবরা শীতে কেঁপে মরল। বড়লোকেরা শিকার করতে কালপী ও তরাইয়ের দিকে বেরোলেন। কলকাতায় যেন আনন্দের বন্যা। শীতও কেটে যায়। বসন্ত আসে। সরষে ফুল ফোটে! গ্রীষ্মকাল। জেলার কম্পানীর বাগানে চামেলী ফোটে। লিচুর চালান শহরে এল। গোমতীর বালিতে পেয়ারা পাকল। শ্রাবণ মাস। বাগানে-বাগানে দোলনা ঝোলে। একটা বছর কেটে যায়। বহুমূল্য জীবনের একটি বছর নষ্ট হয়ে যায়। দেওয়ালী আসে।

তলঅত পেছন দিককার বারান্দার নীচের সিঁড়ির কাছে বসে। এখান থেকে বাগানটা যেন আরও সুন্দর দেখায়। নীল আকাশ। বহুদূরে নীল আকাশ সবুজ গাছের পাতায় মিলিয়ে যায় তারপর দারুণ এক নীরবতা। ভেতরে ভাইয়া সাহেব সম্ভবত ভায়লিন বাজাচ্ছেন। সে মাটিতে কান ছোঁয়াল। য়াজুজ-মাজুজের মত আমি মাটিতে কান পেতে শুয়ে আছি। হাত বাড়িয়ে সে একটা কাঁচামিঠে ঘাস ছিঁড়ল এবং পরম আশ্বস্ত হয়ে চিবোতে লাগল।

এক বছর কেটে গেছে। ভাইয়া সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন। এখন কোনো প্রতিযোগিতার জন্য তৈরী হচ্ছেন। কামাল ও হরিশংকর এম. এ. ফাইনাল-এ উঠেছে। আপ্পী বি. এ. পাশ করেছেন। তলঅত ও নির্মলা সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। ভাইয়া সাহেবের কি হয়েছে? ভাইয়া সাহেব চম্পাবাজীর সঙ্গে প্রেম করছেন। চম্পাবাজীও তাঁকে পছন্দ করছে। চম্পাবাজীর প্রেমে মনে হয় সারা পৃথিবী পড়েছে। কামাল ও হরিশংকর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা তলঅতকে বলত—তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে চম্পা কি রকম রহস্যময়ী। তলঅত জবাব দেয়, আচ্ছা ভাই, তাই বুঝব—আপ্পীর সঙ্গে তাঁর এখনও সেইরকম বন্ধুত্ব। আপ্পী ভীষণ মজাদার মেয়ে। উদার হৃদয়। কে বেশী রহস্যময়ী? আপ্পী না

চম্পাবাঈী ? কে এদের এসব কেমন করে বোঝাবে ! আমি বুঝতে পেরেছি, তলঅত ভাবল—মানুষ চেহারা, সুন্দর মুখ দেখে সব কিছু ভুলে যায়। চম্পাবাঈী সুন্দরী, আপ্পী সুন্দরী নন। এ সব ভেবে সে দুঃখ পেল। অর্থাৎ সৌন্দর্যের মূল্য এত বেশী! সে আরও কয়েকটা কাঁচামিঠে ঘাস ছিঁড়ে দুঃখীর মত চিবোতে লাগল।

কামাল দেরাদুনের পথে বেরিয়েছে। প্রতিবারের মত দেওয়ালীর ছুটিতে সে বেরিয়ে পড়ে। তার পুরোনো লামার্টিনিয়ার কলেজের এক ইংরেজ যুবক প্রফেসর কয়েক বছর আগে অকস্‌ফোর্ড থেকে ভারতে এসেছিল। কিছুদিন হল, সে সাধু হয়ে বাড়ির থেকে পালিয়ে গেছে। তাকে ধরবার জন্য কামালকে পাঠানো হয়েছে, কেননা কামাল তার প্রিয় ছাত্র। হরিশংকরের সঙ্গে হরিদ্বার, চকরাতা, হর কী পৈরী ও সেখানকার মন্দির এবং হিমালয়ের পাহাড়ে তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল। একদিন হঠাৎ যোগমায়া মন্দিরের সামনে তার প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। "ভাই, আমি জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমাকে আবার সেখানে টেনে নিয়ে যেও না। আমি খুব মজায় আছি।"—প্রফেসর তার কাছে প্রার্থনা জানালেন। "লক্ষ্ণৌয়ে গুজব, আপনি নিছক একটা পাবলিসিটি স্টান্ট দিয়েছেন"—কামালের কৌতূহল চাপা থাকে না। "ভাই"—তিনি হাত জোড় করে বললেন—"ঈশ্বরের দোহাই, তুমি চলে যাও ভাই।" নিজের গেরুয়া বস্ত্র সামলাতে সামলাতে একটা নালা পার হয়ে তিনি জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কামালের আর কিছু করার নেই। গম্ভীর মুখে, হরিশংকরের সঙ্গে দেরাদুনের মোহিনী রোডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্মুখে রিসপনা বয়ে চলেছে।

"ভাই হরিশংকর !" কামাল বলল।

"বল।"

"ভাই, প্রফেসর ঠিকই বলছিল। আমরা জঞ্জালেই বাস করছি।"

সেদিন দুজনেই দার্শনিকদের মত কথা বলল। ত্যাগের মর্মার্থ নিয়ে আমাকে বোঝাল।

"এস, এই বাড়ীগুলির নাম পড়ে যাই। তাহলে বাড়ীওয়ালাদের সাইকোলজী বুঝতে পারবে।"

চলতে চলতে একটা বাড়ির ফটকের সামনে থেমে, হরিশংকর বলল।

"আমরা কখনো বাড়ী বানিয়ে বাস করব না।"—কামাল বলল।

"ঠিক বলেছ, দেখ বুর্জুয়ারা কি রকম সেন্টিমেণ্টাল। এই নামটা পড়।"

"খোয়াবিস্তান। লাহোল-বিলা-কুয়ত।"

"কিন্তু তুমিও নিজে 'গুলফির্সা' ও 'খোয়াবাঁ'তে থাক।"

"জানি।"

"ভাই, কামাল—"

"বল।"

"ভেবে দেখ, এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত বাড়ী বানানো হয়েছে। সুন্দর চিত্তাকর্ষক ঘর। সারা পৃথিবীতে কত বাড়ী।"

"হ্যাঁ ভাই এ সব ভেবে বড় আশ্চর্য হই।"

তারা দুজনে একটা কালভার্টের ওপরে বসে পড়ল। দুজনেই এই সমস্যা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল। প্রফেসরের সংসার ত্যাগ করার ঘটনা দুজনকেই বিচলিত করেছিল। সুস্থ মস্তিষ্কের একটি লোক, সাইন্‌টিস্ট, চলে গেল জঙ্গলে? আশ্চর্য!

"এর পেছনে কোনো গভীর রহস্য বা অর্থ আছে।"

সারাক্ষণ তারা শান্ত, সুন্দর পরিবেশে চলতে চলতে বাড়ীর নাম পড়ে গেল—'নস্তরণ', দৌলতখানা', 'শ্যামরক', 'আশিয়ানা' 'রাজমহল।' কামালের পিতার বাড়ী 'খোয়াবাঁ'ও সেখানেই। অন্ধকার গড়িয়ে এল।

বাড়ীর বাগানের পাহাড়ী ফলের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত মোহময়।

দার্শনিকের মত তারা আবার কালভার্টের ওপর বসল। রাস্তার পাশে নহর, নহরের জল বয়ে চলেছে। জলের ওপরে একটা পুরোনো, শতছিন্ন জুতো ভেসে চলেছে।

পঁচিশ

দুটি বছর কেটে গেল। আগস্ট, বেয়াল্লিশের আন্দোলন পুরোনো হয়ে গেছে। 'পণ্ডিতজী, 'মৌলানা' ও অন্যান্য নেতা আহমদনগরের কেল্লায় বন্দী। পৃথিবীটা দ্রুত পালটে যাচ্ছে। চলতে-ফিরতে চোখে পড়ে ফৌজের লোক।

গুলফিশাঁর সৈয়দ আমীর রজা ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের প্রতি-যোগিতায় অসফল হবার পর, নৌবাহিনীর কমিশন হাসিল করলেন। তহমীনা এম. এ. ফাইনালের ছাত্রী। চম্পা এম. এ. প্রিভিয়সের ছাত্রী। কৈলাস হোস্টেলে থাকে। তলঅত ও নির্মলা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। চম্পা এখন সেই গ্রুপে থাকে বলে শহরের "ফ্যাশনেবল ইণ্টলেকচুয়াল।" অনেক নাম—অনেক চেহারা। এদের বিরাট দল। সেই দলের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে—একলা। একা থাকতে অপছন্দ করে না কেননা সে জানে—অন্তিম মূল্যায়ণে মানুষ নিঃসঙ্গ। তবুও আমরা চারিদিকে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে ইকোয়েশন স্থাপিত করতে চাই।

যখন এই ইকোয়েশন,' ভুল প্রমাণিত হয় আমরা বুঝতে পারি, মানুষ নিতান্ত সাধারণ।

এই কথাই সেদিন সে সৈয়দ আমীর রজাকে বলছিল, উনি আবার ভাইয়া সাহেব নামেই পরিচিত।

ভাইয়া সাহেব সেই দিন মাদ্রাজ যাবেন। চম্পার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি কৈলাস গেলেন। চম্পা লাইব্রেরী যাচ্ছিল। সঙ্গে সাইকেল নিয়ে সে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এল। ভাইয়া সাহেব তাকে বললেন—"আমি এখান থেকে পালাতে চাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পালাবার সুযোগ পেয়েছি। তুমি··· তুমি আমাকে বিয়ে করে আমার সঙ্গে যাবে?"

ভাইয়া সাহেব কেতা দুরুস্ত ও সুপুরুষ। নৌবাহিনীতে চাকরি

পাবার তো সোনায় সোহাগা, চার্লস ব্যায়ারকে য়্যুনিফর্ম পরালে যেমন লাগবে, তাঁকে সেইরকম লাগছিল।

চম্পার চেহারা কোনো অজ্ঞাত ভাবনায় লাল হল। জীবনে এই প্রথম সে এরকম কথা শুনছে। একটি লোক তাকে খুব কাছে পেতে চায়, সেও সেই লোকটিকে ভীষণ পছন্দ করে।

কিন্তু জবাবদিহি করে বলল—আশ্চর্য। এ কথা বলার সময় আপনার একটুও লজ্জা করল না?

"তুমি আমাকে বাগানের পথে নিয়ে এসেছ কেন?"

"আমি আপনাকে বাগানের পথে নিয়ে আসিনি।"

"আচ্ছা, তবু তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি আমাকে তোমার ভাল লাগে না? তুমি জান তোমার বন্ধু তহমীনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!"

চম্পা নীরব হয়ে গেল। সত্যি কথা। প্রথমবার সে বুঝতে পারল, তারও ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। সিদ্ধান্ত, দর্শনতত্ত্ব ভিন্ন বস্তু। আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আদর্শ ও সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরে যাই। বিশুদ্ধ দর্শন ও নৈতিকতার সঙ্গে ভাবনা ও ইম্পাল্‌সের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি আমরা খুবই দুর্বল।

ভাইয়া সাহেব যেন তার মনোভাব বুঝে নিলেন—"তুমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।"

"আমি অসাধারণত্বের দাবী কবে কোরলাম?" ততক্ষণে তারা বাদশাহ বাগের ফটক পর্যন্ত চলে এসেছে। "দাঁড়ান, আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে কেন আসছেন? আমার কাজ আছে। আপনি বাড়ী যান।"

"আমার কোনো বাড়ী নেই।"

"বাড়ী অবশ্য আমাদের কারুর কাছেই নেই।" চম্পা অধৈর্য হয়ে বলেছে—"এখন আপনার সঙ্গে দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আপনার একটা বাড়ী আছে, যার নাম গুলফিশাঁ। হে ঈশ্বর……কত বাজে নাম। অবশ্য সেখানে তহমীনা আছে। আপনি যান।"

"তুমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। সাধারণ মেয়েদের মতই আমার

সঙ্গে ঝগড়া করছ। তোমার সমস্ত রিয়্যাকশন অত্যন্ত মামুলী। তুমিও টাইপ মেয়ে। তোমার মত হাজার হাজার মেয়ে আছে ছনিয়ায়। আমার সঙ্গে প্রথমে ফ্লার্ট করলে আর এখন এগোবার সাহস নেই। অবাক কাণ্ড।"

"সাধারণ পুরুষ মানুষের মত আপনিও আমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন।" চম্পা হেসে বলল—"অবশ্য এটা প্রমাণ হল, আমাদের মধ্যে কেউই দেবী বা দেবতা নয়। সে সাইকেল চেপে সোজা টেগোর লাইব্রেরীর দিকে এগিয়ে গেল।

'গুলফিশাঁ' পৌঁছে ভাইয়া সাহেব জামাকাপড় প্যাক করতে লাগলেন। সেদিন তহমীনা এম. এ. পরীক্ষার শেষ পেপার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছে। সারাদিন বাড়ীতে কথাবার্তা চলল। বড় বিটিয়া লেখাপড়া শেষ করেছে। ভাইয়া সাহেব নেভির অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। এখন বিয়েটা হলেই হয়।

রাত্রে ভাইয়া সাহেব চুপচাপ মোটরে বসে স্টেশনে চলে গেলেন।

ঘরের লোকেরা বিরক্ত হল।

কামাল ও হরিশংকর তহমীনার সামনে যেত না।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়েছে। চম্পা বেনারস ফিরে গেছে। প্রতিবারের মত পাহাড়ে বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম হল। বাড়ীর সকলে গেলেন নৈনীতাল। কামাল নিজের পিসির নিমন্ত্রণে মুসৌরী গেল।

জুলাই মাসে সবাই পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলেন। 'গুলফিশাঁর' দরজা খুলল। একদিন হঠাৎ ভাইয়া সাহেব ফিরে এলেন। তিনদিন তিনি 'গুলফিশাঁয়' রইলেন অথচ তিন দিনই নিজের কামরায় নিজেকে বন্দী করে রাখলেন। যাত্রার একদিন পূর্বে তিনি আম্মা বেগমের কামরায় গেলেন।

"অভিনন্দন, আপনার মেয়ে এম-এ পাশ করেছে।" পালঙ্কের এক ধারে বসতে বসতে তিনি বললেন।

আম্মা বেগম কোনো জবাব দিলেন না।

"আমার মনে হয়, এবার আপনাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত।

"কার সঙ্গে" ? আম্মা বেগমের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

"আমার সঙ্গে, আবার কার সঙ্গে ?" তিনিও একটু জোর দিয়েই বললেন।

"এসব কথা বলতে তোমার নিশ্চয় লজ্জা করে না মিয়াঁ। চাচার মেয়েকে ত্যাগ করে অন্য মেয়ের দিকে ঝুঁকেছ। আমরা যেদিকে যাই—লোকের কথা শুনতে হয়।"

"আপনাকে কে বলল যে আমি কর্তব্যচ্যুত হয়েছি। আমাকে লালন-পালন করে মানুষ করা হয়েছে—স্রেফ এই জন্য যে আমি তহমীনা বেগমের স্বামী হব। আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করছেন কেন ? এত অকৃতজ্ঞ আমি নই যে আপনার মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে যাব।" তিনি কামরার বাইরে চলে গেলেন।

সোসন তহমীনা কে বলল—"বিটিয়া, আমি গানের ব্যবস্থা করবার জন্য ইমানবাঁদীকে ডাকতে যাচ্ছি। আপনি শোনেন নি, আপনার বিয়ে হতে চলেছে।"

"সোসন ! তুমি সবাইকে বলে দাও, পৃথিবী এদিক থেকে ওদিকে চলে গেলেও আমি ভাইয়া সাহেবকে বিয়ে করব না।"

তহমীনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সোসন যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না।

বাড়ীতে 'ইমারজেন্সী' ঘোষণা করা হল। চারিদিকে ফোন ও ট্রাংককল করা হল। কামালকে মুসৌরী থেকে ডেকে পাঠান হল, সে যেন বোনকে বোঝায়। প্রত্যেকে তহমীনাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তহমীনার 'না' 'হ্যাঁ' হল না। তার চোখ সারাক্ষণ কান্নায় ভিজে থাকে।

কামাল মুসৌরী থেকে ফিরে বাড়ীর এই অবস্থা দেখে। চম্পার সঙ্গে দেখা করতে কৈলাশ যায়। সেখানে গিয়ে জানতে পায়, চম্পা মামারবাড়ী গেছে, আগামী সপ্তাহে হোস্টেলে ফিরবে। চম্পার কাছে আবার যখন গেল, ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কে জানে, তিনি চম্পাকে কি বলতে গিয়েছিলেন। তিনি উঠে চলে গেলেন। সেই দিনই তিনি মাদ্রাজ রওনা হলেন।

ধীরে ধীরে সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। চম্পা আগের মতই তার দলে রইল। দুই মেয়েই অত্যন্ত সংযতভাবে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলল। কখনো ভাইয়া সাহেবের প্রসঙ্গ ওঠাত না! দুজনেই ভাবছিল—আমি অত্যন্ত সভ্য ও গম্ভীর মহিলা। আবেগ ও ভাবপ্রবণতা এখানে বৃথা, অর্থহীন। আমরা সাধারণ মেয়েদের মত নই।

এক-এক সময়ে, এক-একটি ঘটনা বা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ালে মনে হয়, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সময় কেটে গেলে মনে হয় আমরা মূর্খ। এত ছোট ও সামান্য সমস্যায় কাতর হয়ে পড়ি!

ছাব্বিশ

দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যে সাহায্য করতে কামাল কলকাতা যাবে ভাবছে এমন সময় সে জামাইবাবুর চিঠি পেল। এক বছর হল, লাজ্জের বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবু দিল্লীতে কোনো সরকারী বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারী! নির্মলার বিয়ের কথা চলছিল। তিনি লিখেছেন—তুমি কলকাতা যাচ্ছ। স্যার দীপনারায়ণের ছেলে গৌতমও আজকাল কলকাতায়। গৌতম বেঙ্গল-রিলিফ অথবা "ই. প. টা. র-রিপটার" কাজ করছে সেখানে। সে বিশ্বভারতীতেও কিছু কাজ করতে চায়। যা হোক, তুমি গৌতমের সঙ্গে দেখা কর, ছেলেটা কেমন খবর নাও। ডেপ্থ আছে না তোমাদের মতই 'বোহেমিয়ান'।

চিঠি মুড়ে কামাল পকেটে রাখল। জামাইবাবু অদ্ভুত মানুষ। দেশ জাহান্নমের দিকে চলেছে। আর ইনি বিয়ে-শাদীর কথা ভাবছেন। (কামাল অত্যন্ত সচেতন স্টুডেণ্ট ওয়ার্কার, তহমীনা ও ভাইয়া সাহেবের ব্যাপার তাকে ভীষণভাবে চিন্তামগ্ন করেছে। এরপর বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে তার মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না)—আমি

কলকাতায় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের মৃতদেহ ওঠাব না নির্মলার জন্য বর খুঁজব—বিরক্ত হয়ে সে তলঅতকে বলল। তবু কর্তব্যের খাতিরে সে গৌতমের ঠিকানা ইত্যাদি লিখে নিল। কামাল বেরিয়ে পড়ল। তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী। সারা পথে তারা যোশ, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, ও নজরুল ইস্লামের গান গেয়ে গেল। ট্রেনের জানলার বাইরে দেশের সবুজ ক্ষেত—এ দেশ আমার! দেশ ভক্তি, বিপ্লব, ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অভিযোগ তাদের হৃদয় যেন আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে।

গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট সুন্দর স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল। চারিদিকে ছোট-ছোট পুকুর, সবুজ মাটিতে বাঁশের ঝাড়। বহুদূরে সূর্য গঙ্গার বুকে ডুবে যায়। প্ল্যাটফর্মে গ্রামবাসীদের ভিড়, তারা চালের সন্ধানে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠতে চায়। প্ল্যাটফর্মের অন্যদিকে একটা গাড়ী-ভর্তি সৈন্য।

"যতক্ষণ এই ফৌজী ট্রেন না ছাড়ে, এ গাড়ী এগোবে না।" এক গার্ড কামালকে বলল। আপনাদের গাড়ী চার-পাঁচ ঘণ্টা লেট হতে পারে। "মশাই এটা ওয়ার টাইম।"

ছেলে-মেয়েরা প্ল্যাটফর্মে নেমে এল।

কামাল ও তার বন্ধুরা গান গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ট্রেন দাঁড়িয়েই আছে।

হঠাৎ রেখা চিৎকার করে আর একজনের দিকে ছুটে গেল। পেছন পেছন ছুটে গেল তার বন্ধু। প্ল্যাটফর্মের এক কোণে গ্রামবাসীদের ভিড়। দাড়িওয়ালা এক রোগা যুবক মরে পড়ে আছে। তার শ্যাম-বর্ণা রোগা যুবতী স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েছে। দুটি ছেলে চেঁচাচ্ছে।

"কামাল!" নরেন্দ্র বলল—"মৃতদেহ ওঠাবার কাজ এখান থেকেই শুরু হল।"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাঙলায় বলল—সে ও তার স্বামী অবুল মনশুর অন্নের সন্ধানে কলকাতা যাচ্ছিল। সাতদিন ধরে তারা কিছু খায়নি, আমিনা বিবিও এক সপ্তাহ অনাহারে কাটিয়েছে। সৈন্যদের

ট্রেন থেকে ফেলা দুটো বিস্কুট কুড়িয়ে সে বাচ্চা দুটোকে খাইয়েছে। সেও প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়ল ও শেষে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তার নাম আমিনা বিবি। এংলো ইণ্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার সেদিকে এল—"আপলোগ কেয়া গড়বড় মচাতা হ্যায়। আজকাল রোজ শ-পঞ্চাশ লোক মরতা হ্যায়। হ্যাম কিস্-কিস্কা ফিকর করেগা। ইয়ে রেলওয়ে স্টেশন হ্যায়, অস্পতাল নেহী হায়। ···ইয়ে বাঙ্গালী হামেশা ভুখা হ্যায়—ভুখা বাঙ্গালী! আপ কেয়োঁ ফিকর করতা হ্যায়?"

"এখানে গ্রেভ ইয়ার্ড কোথায়?" কামাল রাগে থরথর কাঁপতে কাঁপতে বলল।

"হামকো মালুম নেহী—কেওঁ, আপলোগ কবর খোদেগা? —ছ্যাট ইজ ভেরী ফানী!!"

ছেলেরা শহরের দিকে এগোলো—গ্রেভ ইয়ার্ড ও মৌলভীর খোঁজে।

কামাল মৃতদেহের কাছে বসল। অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম। হাওয়ায় বাঁশ গাছ দুলছে। সাঁ-সাঁ শব্দ। হোল্ডল থেকে সাদা চাদর বের করে সে মৃতদেহ ঢাকল। ময়লা শাড়ী দিয়ে কোনো ক্রমে শরীর ঢেকে রাখা আমীনা বিবি ও শত ছিন্ন কাপড় পরা অবুল মনসুর দুজনেই এক চাদরের নীচে।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। একটা নৌকো গঙ্গার বুকে। আলেয়ার মত একটা প্রদীপ জ্বলছে নৌকায়। ভেসে আসছে ভাটিয়ালী গানের সুর। গানের কথা কামাল বুঝতে পারে না, তবু গানের সুর তাকে আনমনা করে। দূরে লর্ড কর্ণওয়ালিশের বানানো ঝিলমিলি বারান্দাওয়ালা জেলা কলেক্টারের কুঠি। তার প্রায় পাশেই জমিদার রাজা গিরিশ চন্দ্র রায়ের প্রাসাদ। সেখানে রেডিয়ো বাজছে। বি. বি. সি.'র লাইট প্রোগ্রামের সুর নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিড়ে তরঙ্গের মত ভেসে আসছে। কামাল বেদনা বোধ করে। সে চোখ বন্ধ করল। এটা রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, ও শরৎচন্দ্রের দেশ। ঔপন্যাসিক ও কবিদের প্রিয় দেশ।

আমরা, মানুষরা সম্ভবত বিভিন্ন বিষয়ের এক একটি পুস্তক। ইতিহাসের প্রকরণ, শব্দ, রিপোর্ট, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতাদের ভাষণ, কমিউনিস্ট পার্টির মেনিফেস্টো। গত সপ্তাহে ডক্টর অশরফ ঠিকই বলছিলেন যে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা—লেনিনের সিদ্ধান্ত মাফিক আসা উচিত। পাকিস্থান—তাহলে যে মুসলমান সে কি অটোমেটিকাল পাকিস্থানী হয়ে যাবে? লেনিন, স্তালিন, গোর্কী, ডক্‌টর অশরফ, সজ্জাদ জহীর, জিন্নাসাহেব, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিতজী…

কামালের মস্তিষ্কে ঘটনাপ্রবাহ, নাম আর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এখন শুধু দুটি লাশ। সমস্ত ঘটনা, সিদ্ধান্তের শৃঙ্খলা এই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে ভেঙ্গে যায়। আমিনা বিবি ও অবুল মনসুরের মৃতদেহ—দুটি লাশ।

পরের দিন ভোরবেলায় তাদের যাত্রা হল শুরু। সন্ধ্যেবেলা ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছল। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের স্থানে চলে গেল। প্রমোদকুমারের বাড়ী এদের মিলনকেন্দ্র। দ্বিতীয় দিনে সবাই সেখানে একত্রিত হবে। কামাল মানিকতলায় গেল। সেখানে তার মামা 'মেটিয়াব্রুজওয়ালা নবাব' থাকতেন।

মানিকতলার একটা ঈষৎ জীর্ণ প্রাসাদের কাছে একটা গাড়ী থামল। প্রাসাদটির স্থাপত্য শৈলী কম্পানী যুগের। কলকাতায় এরকম অনেক বাড়ী দেখা যায়। বড় বড় থাম, চওড়া বারান্দা, বারান্দায় ও দরজায় ভেনিশিয়ান ঝিলিমিলি। ভেতরে কামরায় নকশাকাটা ফ্রেমে ইংরেজী দৃশ্য বাঁধানো। কাশ্মিরী কাপড়ের পর্দা। বাগানে ফুলের সুগন্ধ।

ওপর থেকে মেয়েরা চেঁচাল—"আরে, কম্মন ভাইয়া এসেছেন।" সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। চাকরানীর ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। নবাব সাহেব ভাগনের জন্য আরাম কেদারা থেকে উঠলেন।

প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে দত্ত পরিবারের কাছ থেকে মেটিয়াব্রুজ-নবাব কামাল রজা বাহাদুরের ছোট জামাই এই বাড়ীটা কিনে নেন। আগে এখানে প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা সভা হত। ওপরের কামরায় এখনো দত্ত পরিবারের ঝাপসা ছবি

টাঙানো। গ্রুপ ফটোগ্রাফ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে আছেন। ঘরের এক ধারে শ্বেত পাথরের ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম। শোনা যায়, এখানে মহর্ষি বসে বসে ভজন গাইতেন। বাড়ীর মালিক, ক্যানিং কলেজের অধ্যাপকবাবু মনোরঞ্জন দত্তের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা এই বাড়ী বিক্রি করে বালীগঞ্জে বিরাট এক কুঠি বানিয়েছিল। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন আই. সি. এস. অফিসার, কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা। তাঁর মেয়েরা বেশীরভাগ য়ুরোপে শিক্ষালাভ করেছিল। বাবু মনোরঞ্জন দত্তের এক নাতনীর বিয়ে চট্টগ্রামের এক পাহাড়ী রাজার ছেলের সঙ্গে হয়েছে।

বাড়ীর বর্তমান মালিক কোন এক সময় লক্ষ্ণৌর নবাব ছিলেন। তিনি সরকারের কাছ থেকে টাকা পেতেন আর কলকাতায় থাকতেন। বেঁচে থাকাই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল।

নবাব কামাল রজা বাহাদুর সুলতানে-আলম ওয়াজিদ আলী শাহের সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন। নবাব আলী রজা বাহাদুর তাঁর সবচেয়ে ছোট বোনের স্বামী ও খুড়তুতো ভাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কলকাতা অত্যন্ত মডার্ণ শহর। নব বাংলার ঔপন্যাসিকরা হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সেখানে কলেজ ছিল, প্রেস ছিল। চারিদিকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উৎসাহ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু নবাব আলী রজা বাহাদুর নিস্পৃহ। এ সব ব্যাপারে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই। আলীগড়ে এম. এ. ও কলেজ খুলেছে কিন্তু নবাব সাহেব ইংরিজি শিক্ষা নিয়েও মাথা ঘামাতেন না।

তাঁর সময় লক্ষ্ণৌ দিল্লী ও আজীমাবাদের সাহিত্যিক ও শায়েরীর পরিবেশে কাটত। ব্রিটিশ সরকারের টাকা ও ছত্রছায়ায় ভাল ভাবেই তাঁর দিন কাটছিল।

একদিন তাঁর বংশে একটি নতুন ঘটনা ঘটল। নবাব আলী রজার জামাই যিনি লক্ষ্ণৌয় থাকতেন, তাঁর বড় ছেলেকে আলীগড়ে পাঠিয়ে দিলেন।

নবাব আলী রজার দ্বিতীয় জামাই পাটনায় থাকতেন। তিনিও

খুব প্রগতিশীল। তখন পাটনায় আইনের খুব প্রচলন। সুতরাং পাটনার জামাই ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত চলে গেলেন।

নবাব আলী রজার জামাই ইংরিজি শিক্ষাকে তো স্বীকার করলেনই, রাজনীতি নিয়েও মেতে উঠলেন, কংগ্রেসের আদর্শকে মেনে নিলেন। লক্ষ্ণৌর গোলাগঞ্জের বাড়ীতে এখন লালা ভাইদের জমায়েৎ ঘটত। এরা সবাই সরকারী চাকুরে কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সুবিধে ও সমাজ সংস্কার চাইতেন। অসংখ্য মুসলমান এই দলে যোগ দিয়েছিল।

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। হিন্দুরা সওয়া শ বছর আগে ইংরিজি শিক্ষাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। মুসলমানদের শাসনকালে তারা ফারসী পড়ে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এল। হিন্দুরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করল; মোঘলদের মুন্সী ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ক্লার্কে পরিণত হল। গত একশত বছর ধরে হিন্দুরা পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্রের অংশীদার। ১৮৫৭ সালের পর থেকেই ইংরেজরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন আরম্ভ করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের শোষণ শুরু হয়। হিন্দু সমাজ এতদিনে এক বুর্জুয়া সম্প্রদায়েরও জন্ম দিয়েছে। তারা নেতৃত্ব ও এক উদার রাজনীতির জন্যও প্রস্তুত। মুসলমানরা তখনো ফিউডাল স্টেজ পেরোয়নি।

ইংরেজ ও জমিদার সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব ফলপ্রসূ হয়েছে। মুসলমানদের সময় থেকে করমুক্ত জমির আয় থেকে স্কুল চলত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এসব জমি অধিকার করে নিল। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল, মুসলমানরা পেছনে পড়ে রইল। হিন্দুরা ইংরিজি পড়া শুরু করল। মুসলমান জাগীরদাররা প্রায় অবলুপ্ত। মুসলমান কারিগর প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এ সমস্ত লর্ড কর্ণওয়ালিশের পেয়ারের হিন্দু জমিদারদের হাতে চলে গেল। এখন বাংলাদেশের অধিকতর কৃষক মুসলমান ও জমিদার হিন্দু। শ্রেণী চেতনা তাই বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রথমে দেখা দেয়। নব হিন্দু বুর্জোয়া নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত।

বাংলাদেশেই হিন্দুদের পুনরুত্থান আরম্ভ হল। উদাহরণ, ছিয়াত্তরের

মন্বন্তর। সন্ন্যাসী আন্দোলনের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ—ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর লুঠতরাজ। আনন্দমঠ উপন্যাসে বর্ণিত সন্ন্যাসীরা রেজা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতই; ইংরেজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করত। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য—ইংরেজরা লুঠতরাজ করতে এসেছে। ইংরেজ রাজত্ব ও শিক্ষাই হিন্দুদের উদ্ধার করতে পারে। ঠিক এই ভাবেই মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের নেতাও ইংরেজ শাসনের তারিফ করে চলেছিলেন। এই অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতা আশা করা বৃথা। প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এই ভাবে অবরোধ উপস্থিত হল।

চাকরী পাওয়ার ব্যাপারেও হিন্দুরা মুসলমানের চেয়ে এগিয়ে গেল। মুসলমানদের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্ম নিচ্ছিল; ইংরেজরা এই আতঙ্ককে নিজেদের কাজে লাগাল।

মোসায়েব, ইংরেজী কায়দায় কেতাদুরস্ত মুসলমান মধ্যবর্গের আবির্ভাব হল। দেশের মাটিতে খেটে-খাওয়া মুসলমান দরিদ্র কৃষক, তাঁতীদের কথা মুসলিম লীগের নেতারা একবারও ভাবলেন না। প্রত্যেকে অধিকতম আর্থিক সুরক্ষণ, চাকরি ও সুযোগ-সুবিধে আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর বুকে দামামা বাজাল। ডকটর আনসারী এলেন, আলী বন্ধু এলেন, খেলাফত আন্দোলন চলল; গান্ধী এলেন এবং কংগ্রেস মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার দাবী জানাল। পরিবেশ ও অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। দেশময় উত্তেজনা।

নবাব আলী রজা বাহাদুরের জামাই তালুকদার নকী রজা বাহাদুর খোলাখুলি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন না। অবধের তালুকদাররা ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। পরে এই তালুকদারদের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্ব জমে উঠল। গরীব কৃষকদের ওপর আধিপত্য কায়েম রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। এ যুগ লক্ষ্ণৌর 'নবাব' স্যার হরকোর্ট বাটলারের যুগ। লক্ষ্ণৌর তালুক-দারদের এটা স্বর্ণ যুগ। একদিকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছে,

অন্যদিকে জানেআলমের যুগের নবজাগরণ হচ্ছে। মহারাজা মুহমুদাবাদ, ঠাকুর নবাব আলী এবং রায় রাজশ্বরীবলীর লক্ষ্ণৌ।

এই সময় নবাব নকী রজা বাহাদুরের শিক্ষিত পুত্র নবাব আবুল মকরম তকী'র বাড়ীতে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। ছেলেটির নাম তিনি তাঁর ঠাকুমা আম্মা'র মামা মেটিয়াব্রুজ ওয়ালা নবাব কামালউদ্দীন আলী রজা বাহাদুরের নামে কামাল রাখা হল।

তাঁদের বাড়ীতে ছ্বছরের একটি মেয়ে, নাম তহমীনা বেগম। কামালকে তার সমাজের অনান্য ছেলের মত প্রথমে দেরাছুন স্কুলে পাঠানো হল। তারপর সে লামার্টিনিয়ার কলেজে পড়ল। ব্রিটিশ ও ফিউডল পরিবেশ ও পরম্পরায় গড়ে ওঠা লামার্টিনিয়ার কলেজ।

ছোটবেলার কথা কামালের খুব স্পষ্ট মনে আছে। বাড়ীর বড়রা রাজনীতি আলোচনা করত আর সে শুনত। নবাব আবুল মকারম তকী রজা বাহাদুরের বংশধর আর সেরকম নেই। এই বংশের লোকও সরকারী চাকরী করছে। কামালের চাচা মিয়াঁ অর্থাৎ ভাইয়া সাহেবের পিতা ব্যারিস্টার ও কংগ্রেসী নেতা। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। পাটনার সাধারণ কংগ্রেসী, তিনি প্রায়ই জেলে যেতেন! কামালের অসহযোগ আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। পাটনার মামু তাকে সঙ্গে করে জনসভায় নিয়ে যেতেন। তিনি স্টেজে দাঁড়িয়ে উর্দু'র রাষ্ট্রীয় কবিতা আবৃত্তি করতেন। পুলিস এসে লাঠিচার্জ করত। সভা ভেঙ্গে যেত। রাজনীতি এখন শুধু সংবাদপত্রেই সীমিত রইল না। দৈনন্দিন জীবনেও প্রবেশ করল। কামাল একটু বড় হতেই নিজেকে ভারতবাসী ভেবে গর্ববোধ করত। এই গর্বে নিজের অতীত নিয়ে গর্ব করাও স্বাভাবিক ছিল—আমি, আমার বংশ এমন ছিল, তেমন ছিল ইত্যাদি। নেতারা এরকমই ভাষণ দিতেন জনসভায়।' সেলর্স স্যুটের বদলে পাটনার মামী তার জন্য খাদ্দির শেরওয়ানী সেলাই করালেন। তার কজিন জামিয়া মিলিয়ায় পড়ত। কামাল জেদ ধরল, সে ও দিল্লীতে পড়বে। তার কথায় অবশ্য কেউ কান দিল না। যাই হোক 'কর্নেল ব্রাউন্স স্কুল'

ও লামার্টিনিয়ারে কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের তুলনায় সে ভারতীয় এবং ভারত তার অত্যন্ত প্রিয় দেশ।

এই ভারত, এই হিন্দুস্থানের স্বরূপ কি, তা সে সচেতনভাবে কখনো ব্যাখ্যা করেনি। ছোটবেলা থেকে সে এই হিন্দুস্থানেই অভ্যস্ত, এখানেই তার জন্ম, এখানেই তার পূর্বপুরুষরা সাত-আটশ' বছর ধরে বাস করছে। এই হিন্দুস্থানে সরষে ফুলের গাছ আছে, আছে রহট পাম্প; আছে শীতলা দেবীর মন্দির। হিন্দুস্থান বস্তী জেলার একটা মঠ যেখানে এক বি. এ. পাশ করা মোটা মোহন্ত বসে আছে আর মা তাকে প্রণাম করে দশ টাকার নোট এগিয়ে দিচ্ছেন—মোহন্ত দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। হিন্দুস্থান এটাওয়ার শ্যাওলা জড়ানো সেই দরগাহ যার দেওয়ালে অনেক ভবঘুরে ছেলে চড়ে বসে থাকত এবং একদিন কেউ একজন কামালকে চুরি করা একটি ফল খাইয়েছিল। হিন্দুস্থানের কদীর ড্রাইভারের বৃদ্ধা মা যে হলদে শাড়ী পরে মির্জাপুর থেকে কামালের জন্য মাটির খেলনা এনেছিল। সিভিল লাইনের সেই পথ যেখানে সাহেবদের 'ডগ বয়' সন্ধ্যেবেলা অনেক কুকুর সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোতো; সেটাও হিন্দুস্থান। এ ছাড়া কামালের আম্মা, খালা এবং ঘরের অন্যান্য মহিলারাও হিন্দুস্থানী। তাদের উর্দু কথা, গান, রীতিনীতি, আচার—অনুষ্ঠান পুরোনো গল্প: "অযোধ্যার রাজা দশরথের তিন রাণী কৈকেয়ী, কৌশল্যা ও সুমিত্রা।" হিন্দু পুরাণ ও দেবমালার কথা, মুসলমান আউলিয়ার গল্প, মোগল বাদশাহদের কাহিনী—এ সবই কামালের মানসিকতার পৃষ্ঠভূমি। অতীতকে নিয়ে গর্ব, বর্তমানকে নিয়ে পশ্চাত্তাপ, ভবিষ্যতকে নিয়ে একটি আশা, এই তিনটি তত্ত্বই তার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। যে গান্ধী ধুতি পরে ঘুরতেন, সেই গান্ধী দেশের সাধু-সন্ত ফকীরের পরম্পরা—কবীর, তুলসীদাস ও তুকারামের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দেশের কৃষকবর্গের প্রতীক, যে কৃষক ধুতি পরে মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়। নেহরু এই হিন্দুস্থানের নূতন যুগের প্রতীক। তাঁর হৃদয়ে এই মনোভাব সাগর-তরঙ্গের মত আলোড়িত।

এই হিন্দুস্থান রহস্যময়। এর বুকে অসংখ্য রহস্য—ধর্ম, দর্শন, শিল্প, রহস্য-তত্ত্ব, সাহিত্য, সঙ্গীত! একদিকে এই মহান রহস্যময় ঐতিহ্য, অন্য দিকে ইংরেজী সভ্যতা, সাহেবদের রাজত্ব। এসেম্বিব্লর নিয়মকানুন, গভর্ণরের দরবার। ইংরেজ অফিসার যারা 'গুলফিশাঁয়' ডিনার খেতে আসত, তার গোলগঞ্জের হাবেলীতে বসে বসে মহরমের শোভাযাত্রা দেখত—এই ইংরেজদের শেখানো হয়েছে, হিন্দুস্থানীরা যখন তোমার কুঠিতে সেলাম করতে যাবে তখন এদের যেন বারান্দায় বসিয়ে রাখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে এদের মধ্যে কিছু লোককে তাদের সোসিয়াল স্ট্যাটাস অনুযায়ী ড্রইংরুমে বসবার সম্মান দেবে, কিছু লোককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে বিদায় দেবে, কিছু লোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে নিজেরা খাবে। কামাল সেই 'সৌভাগ্যশালী' সম্প্রদায়ের ছেলে যারা ইংরেজদের সঙ্গে সমান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলত। এরাই হিন্দুস্থানের ফিউডাল সম্প্রদায়।

১৯:৪ সালে পণ্ডিত নেহরু এই আশা প্রকাশ করেছিলেন—যদিও মুসলিম রাজনীতি ফিউডাল চিন্তাধারার কবলে এবং মুসলমানদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পেছনে পড়ে আছে, তবুও তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের চেতনা অতিশয় দৃঢ়, তাই এরা হিন্দু নিম্ন মধ্যবিত্তের তুলনায় সমাজ-বাদের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন, আমাদের কলকারখানার মালিক ধনীসমাজ এখনো পুরোপুরী পুঁজিবাদী হয়ে ওঠেন নি। কংগ্রেসে হিন্দু বহুমত। হিন্দু বহুমত সম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এনেছে। এই অবস্থায় মুসলমানদের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিকে ব্রিটিশ সরকার পুরোপুরী কাজে লাগাবেন। দেশের ফিউডাল মহল দেশের জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা চায় না; স্বাধীনতা চায় না। অতএব তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধেছেন, চক্রান্ত করেছেন। মধ্যবিত্ত ইন্টেলিজেন্‌শিয়ার মধ্যেও ফ্যাসিজমের প্রতি অনুরাগ দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। পণ্ডিত নেহরু জবরদস্ত সোশ্যালিস্ট ছিলেন। তিনি কামাল ও তার দলের তরুণদের প্রতিনিধি।

জাগীরদার, মধ্যবর্গের নেতা, বুদ্ধিজীবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী ছাত্রদের জগৎ থেকে পৃথক আর একটি জগৎ ছিল যেটা আসল হিন্দুস্থান। এই জগৎ আসাম ও দক্ষিণ ভারতের চা বাগানে, কানপুর, বোম্বাই, কলকাতা, আহমেদাবাদ এবং টাটানগরের কল-কারখানায় খেটে-খাওয়া মানুষের জগৎ। ব্রিটিশ সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছে। বাংলাদেশে ইংরেজরা মুসলমানদের স্বাধীন সত্তা কেড়ে নিয়েছে; তাদের আর্থিক স্বাধীনতা হরণ করে, হিন্দুদের শক্তিশালী করেছে। তারা শিখদের হাত থেকে পাঞ্জাব কেড়ে সেখানে মুসলমানদের শক্তিশালী করেছে। যে যে প্রান্ত সবচেয়ে অধিক দিন ইংরেজদের অধীনে রয়েছে—সেই সেই প্রান্ত—বাংলা, বিহার, ওড়িশা, মাদ্রাজ সবচেয়ে বেশী বরবাদ হয়েছে। পাঞ্জাব সবচেয়ে শেষে ইংরেজদের হাতে এসেছে অতএব পাঞ্জাবের অবস্থার ততটা অবনতি ঘটেনি। উত্তরপ্রদেশের কৃষক সবচেয়ে দরিদ্র। কৃষকরা কংগ্রেস আন্দোলনের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের কাছে 'স্বরাজ্যের' অর্থ চাষবাসের সুযোগ সুবিধে তাদের জন্ম-জন্মান্তরের অত্যাচার ও ঋণ থেকে মুক্তি।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তখন কম্যুনিজমের নূতন এক হাওয়া। প্রায় সব কমুনিস্ট নেতা ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ইনটেলেক-চুয়াল।

কামাল তখন লামার্টিনিয়ারে—১৯৩৭ সালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় অধিবেশন ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভার স্থাপনা। ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট "ভারত ছাড়" প্রস্তাব পাশ হল। দেশে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে। দশ হাজার ভারতীয় পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল।

বাংলাদেশে তখন প্রলয়। চৌত্রিশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেছে।

চৌত্রিশ লক্ষ লোক—

চৌত্রিশ লক্ষ আমিনা বিবি ও অবুল মনসুর।

দ্বিতীয় দিন কামাল জলখাবার খেয়ে 'দত্ত হাউস' থেকে বেরিয়ে প্রমোদদার বাড়ীর দিকে চললো।

সাতাশ

পার্ক সার্কাসে প্রমোদদার বাড়ীতে অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। ইপটার কর্মকর্তা, পার্টির সদস্য লক্ষৌর ছাত্র-ছাত্রী। বাড়িটা সরগরম। ত্রাণকার্যের জন্য চাঁদা তুলতে হবে। তার জন্য যে অনুষ্ঠান করবার কথা তার রিহার্সাল চলেছে। প্রমোদদা ছাত্রনেতা। এক কোণে হারমোনিয়াম। দু-একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার গান তুলবার চেষ্টা করছে। প্রমোদদার বাড়ীর এই হল ঘরে ছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে। তার একধারে তাঁর বোনের স্টুডিও। স্টুডিওতে একটা ছেলে সাদা শাল গায়ে দিয়ে একটা তৈলচিত্রে শেষ টাচ্ দিচ্ছে। নাটকের পর ফাণ্ডের জন্য এই ছবিটিও নীলাম করা হবে।

প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত।

ব্রাস্ পরিষ্কার করে কপালে ছড়িয়ে পড়া চুল ঠিক করতে করতে ছেলেটি হল ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকে যেন নিজের কাজ ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার ঠোঁটে উদাস হাসি।

উত্তরপ্রদেশের এক ধনী পরিবারের ছেলে, আজকাল বিশ্বভারতীর ছাত্র। এলাহাবাদ থেকে এম. এ. ও ল পাশ করেছে। কি করবে এখনও ঠিক করতে পারেনি। তার সামনে অনেক পথ, অনেক প্রোগ্রাম—সাংবাদিকতা, রাজনীতি, গ্রন্থকার, কলাশিল্প সমালোচক। এদিকে ঘোর সাম্যবাদী। তার বাবা বলেন (প্রত্যেক বাবার মত) আই. সি. এস. পরীক্ষা দাও। তিনি নিজে ইংরেজ সরকারের 'নাইট', ব্যারিস্টার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর বাবাকে বলল—"আমাকে বিশ্বভারতী পাঠিয়ে দিন।" পিতা তাকে ভাল করে লক্ষ

করলেন—"কি ব্যাপার মিয়াঁ? শিল্পী হতে চাও নাকি? মাথা খারাপ হয়নি তো?" দুনিয়ার সব পিতাই এরকম কথা বলেন। কিন্তু যেহেতু সে তার পিতার একমাত্র সন্তান, তিনি ছেলের অনুরোধ রাখলেন। গত দু-বছর ধরে সে বোলপুরে এবং বিশ্বভারতীর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কলকাতায় রিলিফ কাজ করতে এসেছে।

"লক্ষ্ণৌ থেকে যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?" তার পাশ দিয়ে কেও যেতে যেতে বলল। সে হল ঘরের সেই কোণার দিকে এগোলো, যেখানে কামাল অন্য ছেলেদের সঙ্গে বসে গাইছিল "পালকী চলে, পালকী চলে, হো…" গানটিও অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ছেলেটি তার সামনে এসে দাঁড়াল, গান শেষ হবার প্রতীক্ষায়।

চারিদিকে বাংলা কথা।

কামাল চোখ তুলে তাকে দেখল—"নমস্কার।" গান শেষ করে হারমোনিয়াম বন্ধ করতে করতে তাকে বলল।

"আদাব আর্জ!" ছেলেটি হেসে বলল।

কামাল সহজ হল। বাংলা বলতে বলতে সে যেন হাঁফিয়ে উঠেছিল।

"গৌতম নীলাম্বর।" ছেলেটি নিজের পরিচয় দিল।

"কামাল রজা।"

দুজনের জামাকাপড় প্রায় এক। পায়জামা, কুর্তা, জহর কোট গায়ে কাশ্মীরী শাল। দলের প্রত্যেক ছেলের প্রায় একই পোষাক।

"মিয়াঁ, কোথায় এসে পড়লে। এখানে বাংলা বলতে বলতে আমার অবস্থা খারাপ। চল, চৌরঙ্গী ঘুরে আসি।"

"এস তোমাকে আমার ছবি দেখাই।" অরুণা দিদির স্টুডিওতে প্রবেশ করতে করতে গৌতম বলল।

"স্যার, হরিশংকরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?" কামাল জানতে চাইল।

"হরিশংকর কে?" গৌতম ঠোঁটে সিগারেট চেপে অবিকল আর্টিস্টদের মত ছবি শেষ করতে লাগল।

"আরে, হরিশংকর আমার বন্ধু—দিলদার লোক।"

"কোথায় ? ডাক ?" নবাবদের মত গৌতম বলল।

"ঘাস খেয়েছ না কি ? সে এখানে নেই। লক্ষ্ণৌয় পড়ে আছে। শরীর খারাপ।"

"তোমরা লক্ষ্ণৌয়ে থাক কেন ?" গৌতম ব্রাশ রাখতে রাখতে বলল।

"তাহলে থাকব কোথায় ?"

"ঠিকই বলছ।"

"ছবির নাক ঠিক হয়নি।"

"ঠোঁট বানানো বড় মুশকিল।"

"মাশা আল্লাহ ! চমৎকার উত্তর।

"সিগারেট নাও।"

"তুমি শিল্পী ?"

"নয়ত কি ? আমাকে দেখে গ্রাসকাটার মনে হয় নাকি ?"

"আরে-রে ! জামাইবাবু চিঠিতে তোমার কথাই লিখেছেন।"

"জামাইবাবু—ভদ্রলোকটি কে ?"

"আমাদের লাজের স্বামী।"

"তোমার লাজ কে ?"

"আশ্চর্য ! জামাইবাবু তোমাকে চেনেন।"

"আমাকে অনেকেই চেনে।"

"আচ্ছা, এ ধারণা তোমার আছে নাকি !"

"তোমার বুঝি নেই।"

"তা আছে বৈকি··· ।"

"ঠিক আছে।" গৌতম ছবি আঁকতে লাগল।

"চার-পাঁচ বছর মেরে-কেটে শান্তিনিকেতনে থেকে যেতে পারলে শিল্পী হয়ে যেতে পারি ··· এখন তোমার ছবি দেখে আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।" কামাল তার ছবি দেখতে দেখতে বলল।

"শুধু আর্টিস্ট ? আরে আমি তো ভাবছি, ব্যাঙ্গালোর গিয়ে রামগোপালের কাছ থেকে ভারতনাট্যমও শিখব।"

"একদিন আমিও সেই কথাই ভাবতাম। কিন্তু আমার বোনেরা যখন আমার মনোভাব জানতে পারল—তখন হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর এইসা হুটিং শুরু করল! মেয়েরা অত্যন্ত বাজে। আর্ট বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই।"

"তোমার বোন আছে?"

"হ্যাঁ ··· তোমার নেই?"

"না··· ।"

"অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। বোনেরা জীবনের একটা শান্ত, কমনীয় দিক্।"

"হ্যাঁ ··· তারপর কি হল?"

"কি?"

"তুমি বলছিলে··· ।"

"তুমি পার্টির সদস্য?"

"পার্টি? না, আমি নিজেকে তার যোগ্য এখনও করে তুলতে পারিনি। সদস্য হতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছ। তোমাকে দেখে রিভলিউশনরি বলে মনেও হয় না।"

"গৌতম সক্রোধে দেখল।

"মনে আছে, মহাত্মা গান্ধী তোমাদের গুরুদেবকে কি বলেছিলেন? —বলেছিলেন, বাড়ীতে আগুন লেগেছে আর আপনি বসে বসে পাখির গান শুনছেন!"

গৌতম সবেগে ব্রাশ রাখল। "বোকার মত কথা বোলো না। তোমার হরিশংকরও তোমার মত ছেলেমানুষ!

"তুমি ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা কোরো।" কামাল তার কথার গুরুত্ব না দিয়েই বলল।

"সে কে?"

"আমার খুড়তুতো ভাই।"

"তিনিও খুব যোগ্য ব্যক্তি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় থাকেন? লক্ষ্ণৌ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আজকাল মোর্চায় আছেন।"

"লক্ষ্ণৌয় অনেক লোকই আছেন কিন্তু তার অর্থ এই নয়—"

"তা ছাড়া আর কি?"

"চল, গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাই।"

গ্র্যাণ্ড হোটেল? তুমি একজন পাকা বুর্জোয়া।"

কামাল প্রতিবাদ করল।

"বাজে কথা বোলো না খুব খোলা হৃদয় নিয়ে আমি সব কিছু বিচার করতে পারি।"

"গুড।"

"ক্লাস সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে পারি? ভবিষ্যৎ হলো প্রোলেতারিয়তের যুগ—তুমি এ কথা স্বীকার কর?"

'হ্যাঁ।'

"হাত মেলাও।" তারা করমর্দন করল।

"তুমি কি মনে কর, ফিউডাল সমাজ নিজেই নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করবে?"

'হ্যাঁ।'

তারা আবার করমর্দন করল।

"তোমার দৃঢ় ধারণা, মধ্যযুগীয় সমাজকে তুমি ঘৃণা কর এবং তাকে ধ্বংস করা তোমার আশু কর্তব্য?"

"আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন কিন্তু তুমি নিজেও মধ্যযুগীয় সমাজের সদস্য।"

"তুমি কি করে জানলে?" কামাল ঘাবড়ে গেল। মনে হল, সে ধরা পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আগেই হল ঘরে কারা যেন বলছিল, তুমি মেটিয়াব্রুজ-ওয়ালা নবাবের আত্মীয় এবং তুমি 'দত্ত হাউসে'র নবাব সাহেবের···।'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাক্। কি করা যাবে বল! ইতিহাসের ওপর আমি কি করে খবরদারী করি। আমি অবশ্য প্রতি মুহূর্ত চেষ্টা করি নিজেকে 'ডি ক্লাস' করতে।"

"তোমার হরিশংকরও মধ্যযুগীয়?"

"হ্যাঁ সেও। কিন্তু তারও কোনো দোষ নেই।"

"চমৎকার।" গৌতম হাসল—"আমি কট্টর মধ্যবিত্ত।"

"চিন্তা কোরো না।" কামাল তাকে সান্ত্বনা দিল—

"আমরা আসলে সেই নূতন সমাজের একটা অঙ্গ, যে সমাজ হবে জনসাধারণের।"

এসব নানা কথা আলোচনা করতে করতে তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে কামাল জামাইবাবুকে চিঠি লিখল—চিঠিতে গৌতমের কথা, গৌতমের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ।

এই বছরই গ্রীষ্মের ছুটিতে গৌতম লক্ষ্ণৌ এল। আবাস-স্থান থেকে 'গুলফিশাঁ'য় ফোন করল। জানতে পারল, সবাই রেডিয়ো স্টেশন গেছে। রেডিযো স্টেশন থেকে খবর পেল—সবাই সিঙ্গাড়া-ওয়ালী কুঠি গেছে। "সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠি! অত্যন্ত বাজে নাম··· সবাই আজকাল বাড়ীর নাম একটু অসাধারণ রাখছে, যেমন 'খরবুজেওয়ালী হাবেলী', 'তরবুজওয়ালা কিলা', অথবা 'গাজর মনৃজিল' ও 'মুলো হাউস'। গৌতমের হাসি পেল। এরা সিঙ্গাড়া খুব পছন্দ করে হয়ত। সে সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিতে ফোন করল। চম্পা রিসিভার ওঠালো।

"হ্যালো।" চম্পা বলল।

"হ্যালো, আদাব আর্জ! দেখুন, আমি গৌতম—গৌতম নীলাম্বর। আপনারা যেখানে আছেন, সেখানেই যদি থাকেন, আমি আসতে পারি।"

"নিশ্চয় আসুন।" চম্পা বলল।

সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিতে সবাই নদীর সামনের বারান্দায় বসল। গৌতম জানতে চাইল:—"তলঅত আরা বেগম আপনাদের মধ্যে কে?"

"আজ্ঞে, আমি। আজ্ঞা হোক।"

"দেখুন মিস্, কেউ যদি লিখতে চায়, তার কলম থামানো যেতে পারে না কিন্তু আপনি যদি লেখা বন্ধ করতেন তাহলে ভালই হত।"

"ইপ্টার তরফ থেকে আপনি যত বাজে নাটক কলকাতায় প্রোডিউস করেছেন—তার খবর কামালের কাছ থেকে শুনেছি।

আপনাকে পনের মিনিট সময় দেওয়া হল, নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করুন। আমরাও পনের মিনিট সময় নেব নিজেকে জাহির করতে। তারপর নর্মাল হয়ে যান। নর্মাল হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। আচ্ছা, এবার শুরু করুন শুনেছি, আপনি বিশ্বভারতীর শ্রীবৃদ্ধি করছেন আজকাল। এখানেও অনেক বিরাট বিরাট শিল্পী আছে। এরা সকলেই এক এক করে আপনাকে ইম্প্রেস করতে চাইবে। প্রথমে আপনি আপনার রাজনৈতিক মতামত জানান। আপনি রিএকশ্‌নারি ননতো? অথবা মহাসভার সমর্থক?

"আপনি মুসলিম লীগের সদস্য নাকি?" গৌতম হামলা করল।

"কামাল ভাইয়া বলছিলেন, আপনি নাকি ছোট-খাট গুরুদেব হতে চলেছেন?"

"আপনি শিষ্য বানান?"—নির্মলা জিগ্যেস করল।

"গৌতম আপনার উপন্যাস নয় তো?" তলঅত প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে না। বহরাইচের পণ্ডিত, যারা নামের রহস্য জানেন—আমার এই নাম রেখেছিলেন।"

"ভাইয়া সাহেব এখনো এলেন না···।" কামাল বলল—"ফোন করেছিলেন, তিনি এখানে চা খ বেন।"

"ভাইয়া সাহেব" তলঅত ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল—"রাইডিং করতে গিয়েছিলেন। সাঁতার শেষ করে ফিরে আসবেন।" প্রত্যেকে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

"হে ঈশ্বর! কে ভদ্রলোক?—কোনো ফিল্ম স্টার—অশোককুমার বা অন্য কেউ নয় তো?" গৌতম প্রশ্ন করল।

"ভাইয়া সাহেব···তোমাকে বলেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।" কামাল বলল।

"অবধের তালুকদারদের ব্যাপার আমি খুব কমই বুঝতে পারি। আচ্ছা, আপনারা সবাই রাইডিং, সুইমিং ইত্যাদি করেন নাকি? আমি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি এবং সব মধ্যবিত্তর মতই বড়লোকদের একটু সমীহ করে চলি। যুদ্ধের আগে বাবার সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলাম। বিটিশ লর্ডদের দেখবার জন্য ঘুরে ঘুরে

বেড়াতাম। কোথাও লর্ড দেখলেই অবাক হয়ে তাকাতাম। পরে জানতে পারলাম, লর্ডদের "আণ্ডারটেকার"-রাও লর্ডদের মত একই পোষাক পরে।"

"আমরাও আণ্ডারটেকার্স।" কামাল বলল।

হরিশংকর টিপ্পনী কাটল "অতীতের সমাধির পুরোহিত।"

কামাল আশ্বাস দিল; "তোমাকে, পছন্দ করতেই হবে। কেননা আমরা আমাদের হৃদয় নিয়েই বেঁচে আছি।"

গৌতম গর্ব করে বলল তোমাকে পছন্দ না করে যাব কোথায়? আমার হৃদয় বিশাল।"

আঠাশ

চম্পা আবার তাদের দলে মিশে গেল। সে দলের নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েছে। দল তার প্রতি সহানুভূতি রাখে কেননা সে একা। এ আশ্রয় খোঁজার ভাবটা কত করুণ। দলও তো একটা চরিত্র যেমন পরিবেশ একটা চরিত্র—কল্পনার সাকার রূপ। মানবীয় সম্পর্ক ক্ষণভঙ্গুর, অনেকটা—আশঙ্কার উপর দাঁড়িয়ে। অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই মীর অনীস বলেছিল—'খেয়ালে-খাতিরে এহমব চাহিয়ে হরদম অনীস ঠেস না লগ জায় আবগীনোঁ কো।' (অনীস সদাসর্বদা সামলে চলো—এমন ভাবে চলো মানুষ যাতে যেন কষ্ট না পায়)। এবং মীর তকী মীর বলেছিল—'লে সাঁস ভী ধীরে সে কি মুস্কিল হ্যায় বহুত কমি, আফাক কী ইস কারগহে শীশাগরী কা।' (জীবন প্রায় কাঁচের ঘর—বড়ই কঠিন ঠাঁই—নিশ্বাসও খুব ধীরে-ধীরে নাও, যে কোনো মুহূর্তে এই কাঁচের ঘর ভাঙতে পারে)। চারিদিকে কাঁচের বাসন, কাঁচের ঘরেই রাখা। বিরাট এই দুনিয়ার কারখানা, কাঁচের। কামাল চম্পাকে বলল—"চম্পাবাজী চারিদিকের মানসিক বাবুর্চীখানায় আপনি ওঠা-বসা করুন। আপনি আমাদের বাড়ীতে আসুন, আমরা আপনার বাড়ীতে

যাব। আমরা কখনো আপনাকে একলা ছাড়ব না। নিজের মনকে একটু ডিসিপ্লিনে বাঁধুন। ঝামেলা এই যে আপনি রোম্যান্টিক।

কিন্তু জীবনে ডিসিপ্লিন আসবার সম্ভাবনা কোথায়! জীবনে এত বিশৃংখলা! কামাল বলল—আপনি যদি আর্টিস্ট হতেন, ভাল হত। মনের কথাকে শব্দের রূপ দিতেন কিন্তু আপনি না লেখেন, না মনের কথা কাউকে বলেন। অতএব 'ডিসিপ্লিন' আপনার জন্য খুবই জরুরী।

"লেখকরা কি সংযমী নয়?" চম্পার প্রশ্ন।

"সংযমী না হলেও, আর্টের পূজারী হিসেবে তারা 'প্রসেস' করতে করতে নিজের কথা, নিজের সুর খুঁজে নেয়।…চম্পাবাজী, আপনি ছবি আঁকেন না কেন?"

"তুমি তো আমাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের রোমান্টিক মনে করছ! না, কামাল! আমি ভাল আছি। তোমাদের সবার সঙ্গ আমার কাম্য। আমি তহমীনার সঙ্গেও মিলেমিশে থাকব।"

"হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধের ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে নেবেন চম্পাবাজী। এটা ঠিক বুঝতে পারলে কোনো দিন কোনো অসুবিধে হবে না।"

"আবার সেই কথা।"

"আচ্ছা, তাহলে আপনি সব কিছু যাচাই করে নিতে চান? চম্পাবাজী, এই পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর। লোককে এমন ভাবে শায়েস্তা করে যে—"

লনে বসে, বা রাস্তায় চলতে-চলতে তারা বাদ বিবাদ করে।

এখন চম্পা, তহমীনা, নির্মলা ও তলঅত এক সঙ্গেই সময় কাটায়। একদিন তহমীনা চম্পাকে বলল—শোনো, আমরা একটু 'এডাল্ট' হয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজি। ডিসেম্বর মাসে ভাইয়া সাহেব মাদ্রাজ থেকে আসছেন। এই বছর তুমি এম. এ. পাশ করবে। আবেগ, দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ ইত্যাদিকে একদিকে সরিয়ে তুমি ভাইয়া সাহেবকে বিয়ে কর।"

"বাজে কথা বলো না।"

"বাজে কথা কি?"

"তুমিই তাঁকে বিয়ে করছ না কেন ?"

"তোমার ছায়া হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।"

"বাজে কথা।" চম্পা বলল। তহমীনা কিছুক্ষণ পর বলল— "তা ছাড়া ভাইয়া সাহেবই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। পুরুষ মানুষকে মাথায় তুলে নাচানাচি করার কোনো মানে হয় না।"

"স্বভাবতই।"

"জীবনের আদর্শ কমিউনিস্ট পার্টি। বল, হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ।" চম্পা একটু সময় নিল উত্তর দিতে। তলঅত অন্য কামরায় বসেছিল। সে তাদের কথাবার্তা শুনে ভীষণ খুশী হল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এরা দুজনেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।" সে নির্মলাকে ফোন করল। নির্মলাও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। কিন্তু ভাইয়া সাহেব ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ এলেন আর চম্পার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সে সারাদিন খুশী-খুশী ভাব নিয়ে রইল। এরই মধ্যে গৌতম নীলাম্বরও এসে পৌঁছল। একটা ইংরেজি সংবাদপত্রে সে চাকরি পেয়েছে। যে সময় তারা সকলে এক সঙ্গে কাটিয়েছে—তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এমন সময়, এমন কাল, একবার কেটে গেলে আর কিছুতেই ফিরে আসে না।

উনত্রিশ

শান্তা, জায়গাটা চমৎকার। ঝোপ-ঝাড়ে কোয়েল ডাকছে। আমের বাগানে—এক মালিনী বাগানের ভেতর দিয়ে কড়া বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে চলেছে। এখানে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক—অর্থাৎ রিটায়ার্ড কালেক্টার, জমিদার, ব্যারিস্টারদের কুঠি। ছায়াঘন পথ, টুপ-টুপ করে বাসন্তী ফুল পথের উপর পড়ছে। রবিবার দুপুরে মেয়েরা বার্মিজ ছাতা হাতে নিয়ে এক অপরের বাড়ী যায়—ঘাসের উপরে বসে-বসে নিটিং করে ও তাদের মধ্যে অত্যন্ত ইনটলেক্চ্যুয়াল কথার

আদানপ্রদান হয়। জীবনটাকে এরা কায়দা, নিয়ম ও একটা রুটিনে বেঁধে ফেলেছে। বাড়ীতে উঁচু-উঁচু দরজা। দরজায় ঝিলমিলি। চওড়া সিঁড়ি। উঁচু চেয়ার, চারিদিকে সবুজ ঘাস, মনে হয় বাড়ী-গুলো ঘাসের সমুদ্রে ডুবে আছে। ছাতের উপর ইটালিয়ান কায়দায় জানালা। এ অঞ্চলের সর্বত্র এরকম অনেক—অনেক বাড়ী। পাকা ও মজবুত, এসব বাড়ীর ভিতর অতীতে বারান্দার সিঁড়িতে পাখাকুলী হয়ত ঘুমে ঢুলত। বহরাইন, যেখানে আমার জন্ম, আমার বাড়ীও প্রায় এইরকমই। দেখ শান্তা, বাড়ীর কথা নিয়ে বসেছি। কোনো একটি ব্যাপার, ঘটনা বা বিষয় নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা আমার বদ্ অভ্যাস। আমি বিরক্ত বোধকরি। আচ্ছা শোনো বাড়ী-গুলোর নাম শোনো—

নাম ও বড় অদ্ভুত জিনিস। যেমন—চম্পা বেগম। ভাল নাম, নয় শান্তা? দেখ তুমি এত দূরে—আমার মন চায় তুমি সব কিছু আমার চোখ দিয়ে দেখ। শান্তা তুমি অনেকদিন ধরে আমাকে বকুনী লাগাওনি। তোমার ভেতরে লুকোনো মাতৃত্ব আমাকে ডাকে না আর? শান্তা কত ভাল হত তুমি যদি এখানে থাকতে, এদের সঙ্গে আলাপ করতে। আমি এখানে আন অফিশিয়ালি মেয়ে দেখতে এসেছি—বড় মজার ব্যাপার। নির্মলা রাণী যদি গতানুগতিক ভাবে একটু লজ্জা পেতেন ও হারমোনিয়াম নিয়ে একটা গান গাইতেন তাহলে ব্যাপারটা জমত। কিন্তু তিনি গান ইত্যাদি গাইলেন না। উনি সম্ভবত জানেন না যে তার মাতাপিতা আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চান। যাক্ তার ব্যবহারে আমার প্রতি কোনো দুর্বলতাই প্রকাশ পায়নি। কথা বলা থেকে সময় পাবেন তবে তো? তার বিরাট বিরাট প্রোগ্রাম—কেম্ব্রিজ যাবেন ডক্টরেট করবেন। নির্মলা ও তলঅত অত্যন্ত চালাক মেয়ে। সব সময় কথা বলতে থাকে—"

"ভাষণ লেখা হল?"

নির্মলা বারান্দার জানালা থেকে মুখ বের করে জিগ্যেস করল।

"লিখছি।"

"দেখান।"

"ওহ্ হো—ভাই ভাষণ লিখছি না, একটা জরুরী চিঠি লেখা বাকি ছিল—তাই শুরু করেছি।"

"এটা চিঠি লেখার সময়? আমি বলি—"

কামরায় সকলে মিলে একটা কাওয়ালী গাইতে আরম্ভ করল।

"চলুন, কাওয়ালী গাই।" নির্মলার দ্বিতীয় আদেশ। সিঙ্গাডা-ওয়ালী কুঠিতে এসে কাওয়ালী গাওয়া যেন খুব জরুরী! সে উদাস দৃষ্টি দিয়ে নির্মলাকে দেখল—বোকা মেয়ে, এত আনন্দ ভাল নয়।

ঠিক সেই সময় সে দৃষ্টি তুলে দেখল দূরে ভাইয়া সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। একটু ঘাবড়ে গেছেন, হাসছেন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য সবাই বারান্দায় চলে এল।

"অত্যন্ত নার্ভাস টাইপের লোক।" গৌতম ধীরে ধীরে বলল।

"মেয়েদের মত ঘাবড়ে যান বেচারা। অত্যন্ত ভদ্র লোক।" নির্মলার উত্তর।

"ভদ্রলোক? তাহলে আমরা কি অভদ্রলোক? বাঃ-বাঃ", হরিশংকরের বিরোধ।

"তাঁর অবচেতন মনে কোন দ্বন্দ্ব চলছে।" গৌতমের দ্বিতীয় ঘোষণা।

হরিশংকর প্রতিবাদ জানালো।

ভাইয়া সাহেব উপরের দিকে তাকিয়ে চম্পাকে দেখলেন।

তাঁর দিকে চলে গেলেন। চম্পা চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে বসল, তাঁর জন্য চা বানাতে লাগল।

"কি ব্যাপার কি?" গৌতম বিরক্ত হয়ে বলল। তার স্বর গম্ভীর।

"ভাইয়া সাহেব খুব ভাল নাচতে পারেন।" নির্মলা পরিস্থিতি আয়ত্বের মধ্যে আনার চেষ্টা করল। তারা তিনজনেই গিয়ে একটু দূরে সিঁড়ির ওপরে বসল।

"লোকনৃত্য না ক্লাসিক্যাল।" গৌতম আগ্রহ নিয়ে জিগ্যেস করল।

"ওল্ড বল খুব ভাল নাচতে পারেন।" নির্মলার গলার স্বর নির্জীবের মত শোনাল।

ভেতরে কোনো তর্ক চলছে। হরিশংকর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে।

"ওহ হো! তোমরা চেঁচাচ্ছ কেন? গৌতম বলল।

"জীবন অনেক যুগে বিভক্ত"—কামাল যেন মুক্ত বিন্দু ছড়িয়ে দিল।

"বাঃ!···অর্থাৎ··· ?"

"কিছু করবার, কিছু হবার যুগ কবে আসবে ?"

"মিয়াঁ, পৃথিবীর জন্ম থেকে পয়গম্বর, দার্শনিক ও চিন্তাশীলরা যদি কথা না বলতেন তাহলে পৃথিবীর লাইব্রেরীগুলোতে গাধা ঘুরে বেড়াত। ধন্যবাদ দাও আমাদের, আমরা কথা বলি। এমন সময় আসছে যখন আমার কথা শোনবার জন্য তোমরা কান পেতে থাকবে।" কামাল বলল।

"সময় সব কিছু নষ্ট করে দেয়—তুমি বিশ্বাস কর?" গৌতমের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ" কামাল বলল।

সূর্য নদীর জলে ডুবছে। ছতর মনজিলের সোনালী গম্বুজ বাসন্তী রঙে রাঙা। সামনে নদীর তরঙ্গে একটি নৌকো শান্তভাবে এগিয়ে চলেছে।

'তুমি কি বিশ্বাস কর, সংকেত রহস্যময় ?"

কামালের প্রতি গৌতমের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ।"

"এই যে সামনে নৌকো বয়ে চলেছে—এই সংকেতও রহস্যময়।" গৌতম অত্যন্ত সাধারণ কথাও নাটকীয় ভাবে ও দার্শনিক আমেজে মিশিয়ে বলত। তার কথা বলবার এই বিশেষ ভঙ্গি লোকেরা পছন্দ করত। হরিশংকর তার কাছে এসে বসল। তারা সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ি নদীর জলে মিশে গেছে।

"নদী সময়ের প্রবাহের প্রতীক। পাথর সময়ের সঘন রূপ। এই পৃথিবীর ধ্বংসই একমাত্র সত্য - সময় কাউকে ক্ষমা করে না। বেদান্তে লেখা আছে—

নদী আমাদের জীবনের প্রতীক—হরিশংকর স্বগতোক্তি করল—আমি নদীকে ভালবাসি। তুমি নদীর প্রেমে পড়েছ? সে ঘুরে কামালকে গম্ভীর স্বরে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ।

আমি নদীর জলেই ডুবে মরব।

গৌতম! পেটি বুর্জোয়াদের মত রোম্যান্টিক হয়ে যাচ্ছ কেন?" তার কাছে বসতে বসতে তলঅত ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করল।

না! সে চমকে উঠল—সবই সময়ের যাদু, তলঅত আরা বেগম! একটা আঙুল হাওয়ায় নাচিয়ে সে বলল—সময়ের ক্ষমতা তুমি অনুমান করতে পার না।

পুলের ওপারে বহু দূরে নহবত বাজছে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় তারা সেই ধ্বনি শুনতে লাগল।

"এস ভূতদের খুঁজি।"

"এস।"

তারা চারজনই লনে ফিরে এল।

"চম্পা বেগম, ভাইয়া সাহেব। আপ্পী"—অত্যন্ত ভদ্র ভাবে গৌতম ঝুঁকে পড়ে তাদের আপ্যায়ন করল—আসুন আমরা সবাই ভূতদের খুঁজি।"

তারা চুপচাপ মোটর গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মোটর গাড়ী কাঠের পুল ছেড়ে এগিয়ে চলল।

"পথে একটা চৌমাথা এমন আসে, মানুষ যেখান থেকে কখনো ফিরে আসে না।" আমির রজা মনে মনে বলল।

কামাল মোটর থামিয়ে বলল—"আসুন, আমরা তরঙ্গ গুনি।"

তারা পুলের ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

তাদের নীচে নদী বয়ে চলেছে। নদীর বুকে অনেক রঙ-বে-রঙের বজরা। বজরায় বসা লোকদের পোষাক বিচিত্র—হীরে-মুক্ত জড়ান কাপড়, দামী দোপাট্টা পায়জামা। হীরে জহরতের চমকে নদীর জল উদ্ভাসিত।

তারা হাত নেড়ে এদের ডাকল। তাদের কথা এরা শুনতে পেল না

পাখির ডাকের মত সুরেলা, অস্পষ্ট, সারেঙ্গীর সুরের মত তীক্ষ্ণ ভয়াবহ! নদীর ধারে শেয়াল ডাকছে। শ্মশানে চিতা জ্বলছে। কফিন বানাবার জন্য কাঠের তক্তা চেরা হচ্ছে।

"পালাও এখান থেকে। চল এগিয়ে যাই। চম্পা বলল। তার মনে হল তার কণ্ঠস্বর নদীর বুক থেকে উঠে আসছে।

গৌতম বিস্মিত হয়: "ধ্বনি ভয় পাও কেন? কোথায় পালাবে?"

"আমার মাথা ঘুরছে। আমাকে ভূতের হাত থেকে বাঁচাও।" আমির রজা পুলের কাঠের উপরে মাথা রাখল। চম্পা তার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

"সুন্দর পুরুষ, আমি যদি তোমার হৃদয় বুঝতে পারতাম।"

"তুমি বুঝতে পারবে না। আমাকে কেউ বুঝতে পারবে না।" আমির রজা বলল।

মোটর গাড়ী স্টার্ট নিল। কামাল গাইতে শুরু করল। হঠাৎ খুব স্বচ্ছ চাঁদের আলো তাদের চেহারায় পড়ছে। প্রত্যেককে খুব পবিত্র মনে হচ্ছে।

"পুল। চারিদিকে পুল বানানো হয়েছে।" গৌতম রেগে গেল। তারা সেকেন্দরাবাদের পথ ধরল। কাছ দিয়েই একটা হাতী চলে গেল। হাতীর উপরে শাহে অবধ গাজী উদ্দীন হায়দার বিরাজমান। চম্পা তাঁর চেহারা লক্ষ্য করল। তাঁকে ভাঁড় ভাঁড় মনে হয়।

"তাঁকে অন্ততপক্ষে হাউ ডু ইউ ডু' বললে মন্দ হত না।"

কামাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়! "এঁকে নামকরা ইংরেজ মনে হচ্ছে। ঠিক ইংরেজ রাজাদের মত জামা কাপড় পরেছেন।"

শাহে জমান হাতীর পীঠে বসে রইলেন। মোটর গাড়ী এগিয়ে গেল। সকলেই চুপচাপ। গৌতম নিজের পাইপ ঠুকতে লাগল।

"যদি কেউ বলতে পারে, এরা কি ভাবছে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব।" চম্পা নিজেকেই বলল- আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারিনি, এরা ...য় কি। দলের সঙ্গে থাকা অর্থহীন। নিঃসঙ্গতাই সত্য।" কামাল গাড়ী দাঁড় করাল। সামনে লামার্টিনিয়ার কলেজ।

"এখানে তারা আমাকে কি না পড়িয়েছে" কামাল, আমির, রজা এবং হরিশংকর আঙুল উঠিয়ে এক সঙ্গে বলল। "তুমি কেন এত পড় ?" তিনি উল্টে গৌতমকে প্রশ্ন করলেন। এরা বড়ই অদ্ভুত লোক। এদের বোঝানো নিরর্থক।" তলঅত বলল। গৌতম চুপ। সকলে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। খালি কামরা। তারা জানালা দিয়ে দেখল। সকালে আবার ছাত্ররা আসবে, পড়বে। একটি কামরার দেওয়ালে জেনারেল মার্টিনের হিন্দুস্থানী বেগমের ছবি টাঙ্গানো। তলঅত জানালার কাঁচে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যেরা ঝিলের ধারে চলে গেল।

"এখানে আমার কাছে এস।" তলঅত ঘুরে দেখল, জেনারেল মার্টিনের হিন্দুস্থানী বেগম ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সে ইশারায় তলঅতকে আবার ডাকল।

"আমার সঙ্গে কথা বল।" সে বলল—"আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না অথচ সারাদিন এখানে কত লোক আসে, কত বই পড়ে, লেকচার দেয়। আমার দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকায় না।" সে কাঁদতে লাগল। তলঅত ব্যস্ত হয়ে উঠল। "শোনো, আমার কথা শোনো" তলঅত তাকে বোঝবার চেষ্টা করল—"তুমি অনন্তের একটি বিন্দুর উপরে ধ্যানমগ্ন হও। সময়ের ছোট ছোট টুকরো বাস্তবে—" "কথা দাও, আর কখনো পড়া করবে না।" কামাল চেঁচিয়ে গৌতমকে বলছিল।

"এখান থেকে আমাদের এক ইংরেজ প্রফেসর বই-খাতা-পত্র ত্যাগ করে হিমালয় পালিয়ে গেছে। কে জানে, সে এখনো বেঁচে আছে কি না, বাঘের পেটে গেছে না তার দাড়িতে পাখিরা বাসা বেঁধেছে।" হরিশংকর বলল। "ওম···ওম···ওম।" সমস্ত পরিবেশ এই আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হল। চম্পা হাত বাড়িয়ে ফুলের ডাল স্পর্শ করল। একটি পাতা ছিঁড়ে পথে পড়ল। ঈশ্বর, এই খসে পড়া পাতায় লুকিয়ে আছে। হরি ! হরি !! চম্পা বলল। লামার্টিনিয়ারের নীচের ঘরে জেনারেল মার্টিন শুয়ে আছে। তার উপর দিয়ে সময়ের প্রবাহ বয়ে চলেছে।

লাইব্রেরীর ছাতের ওপর দিয়ে একটা চিল উড়ে গেল। বই থেকে শব্দ উঠে এল এবং মিছিল বানিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজি অর্থহীন শব্দ। শব্দগুলো তাদের ভেংচি কাটতে লাগল। অনেক শব্দ বারান্দায় রাখা তোপের ওপর চড়ে বসল, শব্দের পাতলা পাতলা, কালো কালো ঠ্যাং নাচাতে লাগল। তোপ গর্জে উঠল—"আমার নাম লর্ড কর্ণওওয়ালিস" এবং আমাকে শ্রীরঙ্গপট্টমে ব্যবহার করা হয়েছিল। বারান্দায় বসানো পাথরের সিংহ ও মূর্তির অট্টহাসি। তারপর তলঅত খিলখিল করে হেসে উঠল। "এস, দিলকুশা যাই"। তারা দিলকুশার দিকে এগিয়ে গেল।

দিলকুশায় কামালের দেখা মিলল।

গৌতম রেগে উঠল! "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

"শুনেছিলাম বাদশাহ গাজীউদ্দীন হায়দারের প্রাসাদে সাড়ম্বরে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সেখানেই গিয়েছিলাম। বড় মজাদার দৃশ্য! কামরার এক কোণায় এক ইংরেজ বসে-বসে ব্যাগ-পাইপ বাজিয়ে চলেছে। রজব আলী, ফজল আলী কাওয়ালী বসন্ত খেয়াল ধরলেন। বারান্দায় ইংরিজি ব্যাণ্ড বাজছে। একটি হল ঘরে লণ্ডনের বাদশাহ'র স্বাস্থ্য পান করা হচ্ছে। বাদশাহ গাজীউদ্দীন হায়দারের আবার ইনজিনিয়ারিঙের শখ আছে। প্রচুর আজেবাজে জিনিস জমা করে রেখেছেন। টমাস ড্যানহাম সব দেখাশোনা করে। একদিন একটি স্টিমার গোমতী নদীতে ছেড়ে দিলেন। রবার্ট হোম আর্টিস্ট বসে-বসে ছবি আঁকছে। বিশপ হায়বারও সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই উপদেশ দিতে লাগলেন: সিঁড়ির একধারে বাদশাহ স্বয়ং দাঁড়িয়ে অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছেন। তারপর তিনি সবাইকে পিকচার্স গ্যালারীতে নিয়ে গেলেন। বিশুদ্ধ ইংরিজি পদ্ধতিতে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। একেবারে বিলিতি পরিবেশ। আমি হাঁফিয়ে উঠলাম। যখন ফিরছিলাম দেখলাম সাহেব রেসিডেণ্ট বাহাদুর ভারতীয় পোষাকে ঝালরদার পালকী করে চলেছেন। জিগ্যেস করলাম —"কোথায় চলেছেন?" বললেন—বাদশাহের মিছিলে যোগ দিতে

যাচ্ছি। করোনেশন।" আমি বললাম—"কোন বাদশাহ? এক-জনের দরবার থেকে তো আমি আসছি।" উত্তর পেলাম—"তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে নাসিরউদ্দীন গদীতে বসবেন। তামাশা বটে। ভাই হরিশংকর বাদশাহরা মারা যান তাহলে।" সে কথা শেষ করল।

দিলকুশার বাগান শান্ত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। একটি হলদে কুঠিরের পেছনে সাতান্ন সাল শহীদ ইংরেজ সৈন্যের কবর। "লেফ-টেনেন্ট পল, ফোর্থ পাঞ্জাব রাইফেলস্—" "ক্যাপ্টেন মেকডোনাল্ড, ৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স" "লেফটেনেন্ট চার্লি ডেশউড।" ফলকে নাম লেখা আছে। "হ্যালো, হাও ডু ইউ ডু?" তারা তিন জনেই সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল।

"হ্যালো চার্লি!"—গৌতম তাদের সিগারেট দিল। নবাব কুদসিয়া মহল, চামেলী ফুলের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল—"যদি কেউ আমাকে মনের শান্তি ফিরিয়ে দেয়, আমি তাকে আমার সমস্ত সাম্রাজ্য দিয়ে দেব।"

আমি প্রায়ই ভাবি, তুমি কেন বিষ খেয়েছিলে।" চম্পা নবাব কুদসিয়া মহলের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছে যেন সে তার সহপাঠিনী। মেয়েরা সকলেই এক অপরকে চেনে। চব্বিশ বছরের সুন্দরী অবধের মহারাণী খুব সামলে, পাথরের ওপরে বসল। অন্যান্যরা হাঁটতে হাঁটতে দিলকুশা'র ভগ্নাবশেষের দিকে চলে গেল।

"একদিন এক ফরাসী এসেছিল, সঙ্গে বেলুন। অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে আমার শ্বশুর, শাহজমনও তামাশা দেখতে এসেছিলেন। সেই ফরাসী লোকটি বেলুনের মধ্যে বসে এখান থেকে বার মাইল দূরে উড়ে গেল।—তুমি কখনো বেলুনে বসে উড়েছ?" মহারাণী চম্পাকে জিগ্যেস করল।

"না। তুমি কেন বিষ পান করেছিলে?" চম্পার আগ্রহ। স্বভাবতই, মহারাণী কথা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের মুখ আয়নায় দেখছিলেন।

"তুমি অত্যন্ত উদার মহিলা। লক্ষ্ণৌর গদীতে তোমার চেয়ে

উদার মহারাণী কখনো বসে নি। অনেক দান-পুণ্যও করেছ। আমাকে বল, তোমার এই উদারতার পরিবর্তে ছুনিয়া তোমাকে কি দিয়েছে? বল, আমাকে বল ভাই।" চম্পার প্রশ্ন।

"যেদিকে দৃষ্টি যায়, শুধু তোমাকে পাই।" মহারাণী গুণ-গুণ করে গান করছিল। "আমার বাদশাহ এই গানটি লিখেছিলেন।" চম্পাকে সে বলল।

বাগানে বসন্তের ফুলের সুবাস যেন হাজারো আতরের শিশি খোলা হয়েছে।

"কোনো এক বরষা। তুমি দিলকুশা মহলে বেড়াতে এসেছিলে। বাদশাহ কোনো কারণে তোমার ওপর রেগে ছিলেন। তুমি বিষ পান করলে। আচ্ছা মালিকায়-এ-অবধ, আমাকে একটা কথা বল, পুরুষ মানুষের জন্য প্রাণ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত? আমার মতে তাদের মোটেই পাত্তা দেওয়া উচিত নয়।"

কুদসিয়া মহল নিরুত্তর।

"নাও, রাজা গালিবে জংগ আসছেন। আজ পূর্ণিমা। বাদশাহ বেড়াতে এসেছেন। আমাকে দেখলে রেগে যাবেন। আমি যাই।"

"কোথায় যাও?" চম্পা ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

"কোথাও না। আমরা সবাই এখানে উপস্থিত। আমাদের অস্তিত্ব পৃথক নয়। তুমি যাও, তোমার বন্ধুরা তোমাকে ডাকছে।"

"চম্পাবাজী! চম্পাবাজী!" কামালের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে দিলকুশা মহলের দিকে এগিয়ে গেল। ভগ্নাবশেষের সব চেয়ে উঁচু সিঁড়ির ওপর সবাই বসে আছে। ভগ্নাবশেষের ভেতর দিকের কামরায় বাদশাহ-এ-অবধ নাসিরউদ্দীন হায়দারের ইংরেজ বেগমরা ঝালরদার সায়া পরে বিভোর হয়ে গিটার শুনছিল। তারপর বেগমরা পোলকা নাচ শুরু করল। অন্যান্যরা চলে গেল। চম্পা আবার একলা।

'মাদ্‌মোজেল, বুজেত তরীশারমা! মাদ্‌মোজেল!!" চম্পা মুখ ফিরিয়ে দেখল, বাদশাহ নাসিরউদ্দীন হায়দারের ফরাসী নাপিত দাঁড়িয়ে হাসছে। পকেট থেকে নকশা কাটা রুমাল বের করে সে

পাথরের ওপরে বিছিয়ে দিল তারপর চম্পাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল—'বসুন'।

চম্পা অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

"মাদমোজেল। আপনি সুন্দরী, সৌন্দর্য গর্বের বস্তু। গর্ব করুন, দুঃখ হতাশা ত্যাগ করুন। আসুন আপনাকে মৃত মহিলাদের গান শোনাই।" সে গিটারে ঝংকার তুলল।

'মৃতা' মহিলাদের ব্যালাড:

আমাকে বল, লেডী ফ্লোরা ও রূপবতী হাইপেশিয়া ও তাইস কোথায় লুকিয়ে আছে?

জোন কোথায় গেলেন, যাকে ইংরেজরা পুড়িয়েছিল?

এদের কি হল?

কিন্তু গত যুগের বরফকে দেখেছে?

"মাদমোজেল! মনে রাখবেন, সুন্দরী মহিলা দু'বার মৃত্যু বরণ করেন। রূপ গর্বের বস্তু। অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা গর্বের বস্তু। সময় কম। নিমেষে সব শেষ হয়ে যাবে। আমার কথা শুনুন—আমি প্যারিসের নাপিত। বাদশাহের চুল-দাড়ি কামিয়ে চব্বিশ লক্ষ টাকা আমার ঘরে তুললাম। সারা লক্ষ্ণৌ আমাকে খাতির করে চলত। বাদশাহ আমার ইশারায় চলতেন। দেশের হাকিম আমিই ছিলাম। আজ আমাকে কেউ মনেও রাখেনা। উদাস হয়ে সে নিজের জুতো দেখল।"

"আমার সময় হয়ে এসেছে। আজ্ঞা দিন মাদমোজেল!"—ঝুকে অভিবাদন করে সে বলল।

চম্পা নীচে নেমে এল। তারা মোটরগাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

"এস, ছত্তর মনজিলের দিকে যাই।" কামাল বলল।

গাড়ী দিলকুশা মহল ছাড়িয়ে কাসল্স রোডে এল। কিংগ গাজীউদ্দীন হায়দারের নহর ছাড়িয়ে গাড়ী হজরতগঞ্জে ঢুকল। তারপর কেশরবাগের দিকে এগিয়ে গেল।

সামনে রূপোলী নাচের আসর চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে।

"আজ এখানে বসন্ত-মেলা।" তলঅত খুশী মনে বলল।

"মনে হচ্ছে সুলতান-আলম অপেরায় অংশ গ্রহণ করছে।" নির্মলা বলল—'ভেতরে যাই ?'

"কি করে যাই ? আমাদের কেউ নেমন্তন্ন করেনি।" কামালের স্বরে সংশয়।

চল চুপি চুপি যাই, পাহারাদারদের পিছনে লুকিয়ে থাকব। শংকরের প্রস্তাব।

তারা চুপি চুপি ইমারতে প্রবেশ করল। স্টেজে বড় বড় থাম, রূপোয় মোড়া। অনেক আয়না ঝিলমিল করছে।

তারা নিঃশব্দে স্টেজের পেছনে এসে দাঁড়াল। 'পুখরাজ পরী' গান ধরল—

হ্যায় জলবা-এ-তন সে দরো-দীবার বসন্তী,
পোশাক জো পহনে হ্যায় মেরা য়ার বসন্তী।

(শরীর থেকে বাসন্তী জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে, দরজা জানালা বাসন্তী রঙের ··· আমার বান্ধবীর পোশাকও যে আজ বাসন্তী রঙে রাঙা) হলে উত্তেজনা। শ্রোতা বাঃ বাঃ করে উঠল। ওরা আরেক দরজা এসে দাঁড়াল।

পুখরাজ পরী গাইছে—

মোতী কালো মে নেহী য়ার কে জুলাফোঁ কে করী
ঝালে ভাদো কে উয়ো হ্যায়, আউর ইয়ে ঘটা সাবন কী।

ইন্দ্র সভার অপেরা চলছে। তারা ভিড়ে এদিক ওদিক করছে। হঠাৎ সব্জপরীর নজর এদের ওপর পড়ে। সে ঘাবড়ে গিয়ে 'কালদেবকে বলল—"এদিকে দেখ, সময়ের ভূত আমাদের দেখছে।"

'কালদেব' জোরে হাসল—কি ব্যাপার কি ? কিরকম ভূত ?

কালদেব হাসল।

কামাল এক পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করল—'সব্জপরী' কে ?"

"আরে, আপনি কোথায় থাকেন মশাই ? লক্ষ্ণৌর খবর রাখেন না ? – চম্পাবাই শাহেজমন গাজীউদ্দীন হায়দারের সময় থেকেই তাঁর পা মাটিতে পড়ে না। বয়স প্রায় চল্লিশ কিন্তু তাঁর দাপট ও জেল্লা একটুও কমেনি। আল্লা তাঁর গলায় প্রাণ ভরে মাধুর্য দিয়েছেন।

তাঁর গান একবার শুনলে ভোলা যায় না।" কামাল তাড়াতাড়ি সরে এল।

কালদেব গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করল :

লায়া শাহজাদে কো ম্যায় জাকর হিন্দুস্থান
তু আপনে মাশুক কো সব্জ পরী পহচান
তু আপনে মাশুক কো……

(যুবরাজকে হিন্দুস্থান থেকে নিয়ে এসেছি। হে সব্জপরী, নিজের প্রিয়তমকে চিনে নাও।)

শাহজাদা গুলফাম এখন স্টেজে। সে দরাজ গলায় গান ধরল—

মহলোঁ মে রহতা হুঁ ম্যায়, এক্য হ্যায় মেরা কাম,
শাহজাদা হুঁ ম্যায় হিন্দ কা গুলফাম মেরা নাম।

(প্রাসাদে বাস করি। বিলাসিতা করাই আমার কাজ। হিন্দের যুবরাজ আমি, আমার নাম গুলফাম।)

আবার সে গাইল—

সুবহ হোতী হ্যায় মেরী জান, কোই আন কে বীচ,
ভৈরবী মুঝকো সুনা চলকে পরিস্তান কে বীচ।

(কারও প্রতীক্ষায় ভোর হয়। আমাকে ভৈরবী শোনাও, পরী-রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ভৈরবী শোনাও।)

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। ভেতর থেকে এখনো শাহজাদার স্বর ভেসে আসছে—

উড়কে তু যায়েগী এক পলমে পরিস্তানকে বীচ
হাথ ফৈলাকে ম্যায় রহ জাউঙ্গা অরমান কে বীচ।

(তুমি উড়ে পরীর রাজ্যে চলে যাবে। আমি হৃদয়ে অনেক আশা নিয়ে, বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে থাকব।) বাইরে জলপরীদের ফটক, চীনী বাগ, জুলুখান, আলোয় ঝলমল করছে। কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা চলছে। জানে আলম গেরুয়া বস্ত্র পরে গাছের নীচে বসে আছেন। প্রত্যেকে গেরুয়া বস্ত্র পরে ঘোরাঘুরি করছে। দুর্গা প্রসাদ কত্থক নেচে চলেছেন। ফোয়ারা থেকে সুগন্ধ জলধারা উপচে পড়ছে। চারিদিকে ফুল, ফুল আর ফুল।

সেখান থেকে এখনো জোগনের ভৈরবীর সুর ভেসে আসছে—

তারকশী দুপট্টা ওড়ে কিরণ জো টাকঁকে,
হো শবে মাহতাব মে কেয়া হী সমন ঝলাঝলী।
আই বহার, সাকিয়া, জামে শরাব দে পিলা,
ফুল খিলে, ফলে শজর, অব্র উঠা, হওয়া চলী।
বহকে জমীনে শের মে গাঁও, 'অমানত' অপনা কেয়া,
জব হুই লগজিস ইক জরা নিকলা জবাঁ সেয়াঅলী।

(ঝলমল দোপটা, তার উপর জ্যোৎস্নার কারুকার্য। তোমাকে চাঁদের মত মনে হচ্ছে। বসন্ত এসেছে, সাকি সুরাপাত্র তুলে ধর। ফুল ফুটেছে, মিষ্টি হাওয়া বইছে। হে 'অমানত' তোমার পা কাঁপছে, সুরার প্রভাব তোমার সর্বাঙ্গে, মুখ থেকে এখন 'ইয়া আলী' বেরোচ্ছে।)

জোগনের সুরেলা আওয়াজ চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে ডুবে গেল। এরা মেলার ভিড় থেকে বাইরে এল।

রাস্তার উল্টো দিকে ছতর মন্‌জিল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। সারি সারি মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের ভেতরে গিয়ে তারা গাড়ী দাঁড় করাল।

গোমতী বয়ে চলেছে। বারান্দা জনশূন্য। সিঁড়ির উপরে নাসির-উদ্দীন হায়দার খালি পায়ে বসে আছেন। একটা জুতো জলে ফেলে দিলেন। জুতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায়। তিনি হাততালি দেন, কাউকে ডাকেন। কেউ আসে না। তিনি নিজে উঠে জুতো কুড়িয়ে নেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জুতো জলে ফেলে দেন। এই ভাবে সময় কাটাচ্ছেন বাদশাহ। বেশ কিছুক্ষণ তামাশা চলল। গৌতম ধৈর্য হারিয়ে তাঁকে সিগারেট অফার করল।

"না। আমি গড়গড়া পান করি। কেউ আছে ?"

"ক্ষমা করবেন—আমরা আছি।" গৌতম ঘাবড়ে গেল।

"তোমরা কে ?" তিনি জিগ্যেস করলেন।

"ব্যাস আমরা—শুধু আমরা।"

তিনি কোনো কথা বললেন না।

"এঁকে এখানেই ছেড়ে দাও—চল যাই।" কামাল চুপচাপ গৌতমকে বলল।

"এস, প্রফেসর ব্যানার্জীর কাছে যাই।"

তারা বাদশাহ বাগের শাহী দরজা পেরিয়ে বাগানে ঢুকল। হাওয়ায় ফুলের সুগন্ধ। টেগোর লাইব্রেরী ভবন গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। "শব্দ শক্তিশালী।"—লাইব্রেরী ভবন বলল—

"আমার কাছে এস, তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেব।"

"শব্দ দুঃখ ভোলায় না. দুঃখকে গভীরতর করে।" গৌতমের উত্তর।

হরিশংকর বলল: "নীরবতা সবচেয়ে ভাল। লোকেরা তাই মুনি হয়ে যায়, মৌন থাকে।"

"নীরব থাকলে জিভটাই অকারণ কষ্ট পায়। তুমি সে কষ্ট অনুমান করতে পার না।" কামাল হরিশংকরকে বলল।

তারা শহরের পুলের উপরে বসে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন চাঁদের আলোয় মায়াময়। নাসিরউদ্দীন হায়দারের বাদশাহ বাগ—

বেচারা নাসীরউদ্দীন হায়দার!

তারা প্রফেসারের কুঠির দিকে চলল। দূরে গাছ দিয়ে ঢাকা লনে প্রফেসর ব্যানার্জী পায়চারী করছিলেন।

"এরা এত সমস্যার সমাধান কি ভাবে করে।" কামাল বিরক্ত হয়ে বলল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ছাড়িয়ে তারা সেই পথ ধরল যেটা য়ুনিভার্সিটি রোডের পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে মোতীমহল-ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছোয়। তারা কাঁচা পথে নেমে গেল, যে পথ সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির দিকে এগোয়।

...অর্ধেক রাত প্রায়। তারা সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির দিকে এগিয়ে এসেছিল। গৌতম কুঠির সিঁড়ির উপরে একলা বসে আছে। একটু দূরে চম্পা, তলঅত ও নির্মলা বসে। কামাল, হরিশংকর ও আমীর রজা জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। নদী বয়ে চলেছে। নদীর ওই পারে নজফ অশরফ, মোতীমহল ও ছতর মনজিল দাঁড়িয়ে। নৌকো সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল।

সময়ের যাদু শেষ হয়েছে।

"সুবহ হোতী হ্যায় মেরী জান কোই আন কে বীচ। ভৈরবী—মুঝকে সুনা চলকে পরিস্তান কে বীচ।" গৌতম ধীরে ধীরে আবৃত্তি করছে।

"গৌতম ভাই! তুমি 'ইন্দ্রসভা'র শের (উর্দু কবিতা) আউড়ে চলেছ। অত্যন্ত ডিকাডেণ্ট তুমি'" তলঅত বলছিল। গৌতম হাই তুলে উঠে দাঁড়াল।

"চল ভাই, এবার যাওয়া যাক্। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।"

কামালের কণ্ঠস্বর।

তারা সবাই ঘুমোতে চলল।

আমি শান্তা'র চিঠি শেষ করতে পারলাম না—গৌতম বাসায় যেতে যেতে ভাবল।

ত্রিশ

প্রফেসর ব্যানার্জী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক। রবিবার বিকেলবেলা প্রায়ই ছেলেমেয়েরা তাঁর বাড়ী আসত। প্রফেসর তাঁর বাগানে চেয়ারে বসে থাকতেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ঘিরে বসত। তিনি উদাস গলায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। প্রফেসর তাঁর বৈঠকে গৌতম নীলাম্বরকে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

"প্রফেসর!" একদিন চম্পা জিজ্ঞেস করল—"মন ও ভাবনার দ্বন্দ্ব থেকে কবে মুক্তি পাব? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ এই দ্বন্দ্ব অনুভব করছি। জঙ্গলে ঝড় উঠলে ছায়া যেভাবে এক অঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে উঠে; এই দ্বন্দ্বও সেইভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। জাতি, দেশ, শাসন, মানুষ, সম্প্রদায়—এই দ্বন্দ্বে মশগুল। আমার চারিদিকে আতঙ্ক, অবিশ্বাস, ঘৃণা! নিজের মন আর বুদ্ধির সংঘর্ষ আর যেন সহ্য করতে পারছি না।"

বেনারসে যখন পড়তাম, ‘দুই-সম্প্রদায়ের’ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোনো কিছু বিচার করিনি। কাশীর গলি ও শিবালয় আমার বান্ধবী লীলা ভার্গবের মতই আমার কাছে প্রিয়। যখন বড় হলাম, একদিন হঠাৎ বুঝতে পারলাম, এই শিবালয়ের উপর আমার কোনো অধিকার নেই কেননা আমি কপালে টিপ পরি না, আমার মা দেবালয়ে পুজো করেন না—নমাজ পড়েন। ব্যাস, আমার আদব-কায়দা আলাদা হয়ে গেল, লোকের চোখে আমার দেশপ্রেমের পরিভাষাও পাল্টে গেল। অথচ বসন্ত কলেজে ত্রিবর্ণ পতাকা তলে দাঁড়িয়ে আমি জন-গণ-মন গেয়েছি। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, ত্রিবর্ণ পতাকা তলে দাঁড়ানো চম্পাকে কেমন যেন পর-পর মনে করা হচ্ছে। অথচ প্রফেসর, এ দেশ তো আমার! এই দেশেই আমার জন্ম। নিজের জন্য অন্যদেশ কোথা থেকে আনব? দেশ ছেড়ে যাবার কথা আমি ভাবতেও পারিনা, বুঝতে পারিনা। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হল একটি নূতন সমস্যা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আক্রমণকারী জাতি দেশবাসীকে দেশ থেকে বাইরে তাড়িয়ে দিল। তারা রাজনৈতিক উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয়ের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু দু রকমের। এক, যারা সেচ্ছায় দেশ ছাড়ে—দ্বিতীয় যাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন কথা শুনছি। আমি দেখেছি, আমার পরিচিত মুসলমান খুশী মনে নিজের দেশ ত্যাগ করে একটি নতুন দেশ গড়তে চায়। তাদের এই আগ্রহ আমার ভাল লেগেছে কেননা পরিবর্তন, নূতন কিছু গড়ে তোলা মানুষের স্বপ্ন। মানুষ তো নতুন স্বপ্ন দেখবেই কিন্তু লড়াই বেধেছে এই নূতন ও পুরানো স্বপ্নকে নিয়েই। আমার দ্বন্দ্বও সেইখানে।

যুদ্ধ ও শান্তির বিশ্লেষণ বা বিবেচনা অত্যন্ত কঠিন। শান্তির অর্থ কি? দেশ প্রেমের মাপকাঠি কি? আমি জানি, খুব ভাল ভাবে জানি, একবার পৃথক হলে আমরা আর মিলতে পারব না। ভাঙ্গা দেশ জোড়া লাগে না।”

“তুমি ভেবে দেখছ…” প্রফেসর গাছের ডালে বসা চড়ুই পাখিকে

দেখতে দেখতে বললেন—"ইংরেজ আসার আগে এদেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হত না। যুদ্ধ নিশ্চয় হত কিন্তু সেসব যুদ্ধ রাজনৈতিক। হিন্দু রাজার সৈন্যদলে থাকত মুসলমান জেনারেল—মুসলমানদের হয়ে হিন্দুরা যুদ্ধ করত। ইংরেজ এল; দেশে—ঘৃণার বীজ বপন করল, ইতিহাস তাদের হাতে বিকৃত হল। কিন্তু আজ ধর্ম ও সম্প্রদায় হয়ত আমাদের পাগল করে তুলেছে⋯।"

"আপনি ধর্মকে অর্থহীন মনে করেন? আপনি স্বয়ং কট্টর বৈষ্ণব।"

"বৈষ্ণব ধর্ম, ভক্তি-ধর্ম। বিশুদ্ধ প্রেম বৈষ্ণব ধর্মের ভিত।"

"প্রফেসর, প্রত্যেক ধর্মের বুনিয়াদ বিশুদ্ধ প্রেম। এ আর নূতন কথা কি।"

"তুমি আজ অপ্রিয় কথা বলছ।"

"প্রফেসর, আমি আগেই বলেছি, আমরা অত্যন্ত অপ্রিয় পরিবেশে বাস করছি। গত রাতে অতীতকে দেখছিলাম, সময়ের কারচুপি লক্ষ্য করছিলাম। বাড়ী এসে ঘুমোতে পারিনি। ভাবছিলাম, আজ ইতিহাস ও আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি এবং কি হওয়া উচিত। অতীতে আমরা অবিচার ও অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি। গত যুগের প্রায়শ্চিত্ত এ যুগে করছি। আমি আজ যা কিছু করছি—ভবিষ্যতের বংশধররা তাব প্রায়শ্চিত্ত করবে। আমার জন্য পৃথিবী সুন্দর হবে, না ধ্বংস হবে?⋯প্রফেসর, ইতিহাস, অতীতকে আমি যেন প্রতি মুহূর্ত অনুভব করি—ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ ধার্মিক অসমতা ও ঘৃণা আমাকে পাগল করে। কোনো হিন্দুকে আমি ঘৃণা করিনা, কিন্তু এই কমিউনিটির স্টিরিয়োটাইপ আচরণ আমাকে ঘৃণা করতে বাধ্য করে।"

"আধ্যাত্মিক ভারতে রাজনৈতিক ও আর্থিক অসন্তোষ সব সময় ধার্মিক ঝগড়ার রূপ নিয়েছে—বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতকের সন্ন্যাসী আন্দোলন; অবধ ও বাংলা দেশের অন্যান্য জেহাদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আধ্যাত্মিক নেতারা এক অন্যের গলা কেটেছেন—আশ্চর্য।" কামাল বলল।

"সংখ্যালঘুর সমস্যা এ দেশে বর্তমান—এ কথা তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস

করবে।" চম্পা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল।

"নিশ্চয় !" কামাল গলা পরিষ্কার করে বলল—"কিন্তু রাশিয়ার মত এখানে মাল্টি ন্যাশনাল স্টেট বানানো যেতে পারে।"

"দেখুন চম্পাবাজী, আমি ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির কথা ভাবি না। মানুষ শান্তি চায়, চায় রুচি ! এটাই মুখ্য আর সব কিছু গৌণ।" সে পার্টি লাইনে কথাবার্তা শুরু করেছে।

কামাল নূতন যুগের ছেলে, বুদ্ধিবাদী পথের পথিক, সৎ ও কল্পনা-প্রবণ যুবক। চম্পা তাকে ভাল করে লক্ষ্য করল।

"আর একটি কথা ..." কামাল বলল—"তোমার দৃষ্টি শহরের রাজনীতির উপরে। শহরের রাজনীতি শোষণের রাজনীতি। নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য তারা দাঙ্গা মারপিট করবেই। গ্রামের কথা তুমি জাননা। অনুমানও করতে পার না। গ্রামের রাজনীতি পৃথক। তার একটা বৈশিষ্ট আছে যা শহরে বসে বোঝা যায় না। এখানে আমরা রিলিফের রাজনীতি করি, কিছু আর্থিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধে পাবার কথাই বলি। মুসলমানদের এত চাকরি পাওয়া উচিত, শিখদের এত ও হিন্দুদের এত !—মিডিল ক্লাস রাজনীতি।"

"আমার বাবা নবাব তকী বাহাদুর অফ কল্যাণপুর মুস্‌লিম লীগের সদস্য হয়েছেন। বাবা ভাবছেন কংগ্রেস তালুকদারদের ধ্বংস করতে চায়। তিনি এখনো ফিউডাল আদর্শ আঁকড়ে ধরে আছেন। আমি আমার বাবার চিন্তাধারা বুঝতে পারি তাই তাঁর সঙ্গে বচসায় আমি নিজেকে জড়াই না।"

চম্পা তর্কে মেতে উঠল; "কামাল, তিনি যদি মুসলমানদের পাকিস্থানেই থাকা উচিত মনে করেন তাহলে তুমি বাধা দেবার কে ? ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার কর তুমি ?

তলঅত তাকে দেখছে। "আসুন !" সে বলল, "প্রফেসর চা খাবার জন্য ডাকছেন।"

গৌতম প্রফেসরের কাছে ঘাসের উপরে বসেছিল। সে চম্পাকে নমস্কার করল।

"চম্পাবাঈজী মুসলিম লীগ হয়ে গেছেন! আজ কাগজে দেখলাম জিন্না সাহেব বলেছেন হিন্দুদের সোসায়েল বয়কট করা উচিত। অতএব কাল থেকে চম্পাবাইজী আমাদের সভায় যোগ দেবেন না!" কামালের স্বর খুবই তিক্ত।

সন্ধ্যার আবছা আলোয় তারা বসে রইল। উদাস পরিবেশ।

একত্রিশ

কৈলাশ হোস্টেলের বার্ষিক অনুষ্ঠান "আনার কলি" নাটকের শেষে কামাল বলল—চম্পাবাজী, সঙ সাজার কী কোনো অর্থ আছে! আনার কলির চেয়ে ভাল কোনো নাটক খুঁজে পেলেন না? রোম্যান্টিসিজিমের একটা সীমা থাকা উচিত।" সে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গৌতম কাছে এসে বলল—"আপনি কামালের উপর চটেছেন? সেদিন প্রফেসারের বাড়ীতে কামাল আপনাকে কিছু অপ্রিয় কথা বলেছিল। আমি কামালের তরফ থেকে ক্ষমা চাইছি।"

"না গৌতম, আমি রাগ করিনি। কারুর ওপর রাগ করার অধিকার আমার নেই।"

"আপনি কি শহীদ হতে চলেছেন? এরকম দুঃখী দুঃখী ভাব কেন?

"তুমি—তোমরা বড় বাজে।"

"আমরা অত্যন্ত উদার। উদার মানুষ কয়েক রকমের হয়।

ভাইয়া সাহেবকেও সেরকম উদার বলা যেতে পারে।"

"তুমি—তুমি এ কথা বলছ? আমার মনে হচ্ছে আমি একটা গ্যালেরিতে দাঁড়িয়ে আছি। একটার পর একটা পর্দা উঠে যাচ্ছে—শেষ পর্যন্ত একটা কাল পর্দা বাকী রয়ে গেছে।"

"চম্পাবাইজী, আপনার সমস্যা, আপনারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি ভাইয়া সাহেবকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এটাই আসল কথা—

বাকী সব বাজে।" অভ্যেস অনুসারে গৌতম অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত নিজের মতামত প্রকাশ করল।

"ভলঅভ ঠিকই বলছিল, তুমি 'পোজ' মার। তোমার সঙ্গে কথা বললে মনে হয় খলিল জিব্রানের অলমুস্তফা'র সঙ্গে কথা বলছি।"

"চম্পাবাঈজী" সে ঘাবড়ে গেল—"রাগ করবেন না। আমাকে নিজের বাড়ী নিয়ে চলুন, কফি খাওয়ান। আমরা সেখানে বসে-বসে আলোচনা করব। মন খারাপ করবেন না। মানুষ এই জগতে মাত্র একবার জন্ম নেয়। চলুন যাই।"

চম্পা, চাঁদবাগের এক লেকচারার সীতা দীক্ষিত সঙ্গে কলেজের পেছনে, ছোট্ট এক কুটিরে থাকে। কুটিরে পৌঁছে তারা বারান্দায় বসলো। অন্ধকারে পেয়ারা গাছ থেকে টিয়া পাখিদের তাড়াবার জন্যে চৌকিদার হাক দিচ্ছিল।

গৌতম বেতের চেয়ারে বসে কলাগাছের কাঁদি দেখতে লাগলো! চম্পা কাপ কফি এনে তার সামনে সোফায় বসল।

"চম্পাবাইজী, আপনি গ্রেট। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি।"

"সত্যই।"

"চম্পাবাইজী, একটা কথা বলুন।"

"জিজ্ঞেস কর।"

"আপনি ভাইয়া সাহেবকে কতদিন ধরে জানেন?

"বেশ কয়েক বছর ধরে।"

"এতদিন আপনি কি করেছেন?"

"পড়েছি, আর কি করবার আছে?"

"তারপর?"

"আরও পড়েছি।"

"তারপর?"

"বাস, শুধু পড়েই গেছি।" চম্পা বিরক্ত হল।

"আর ভাইয়া সাহেবকে এতদিন সহ্য করে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যখন আপনার প্রথম দেখা হয়, অনুমান করি, আপনার বয়স সতের-

আঠারো। ভাইয়া সাহেবের কথা চিন্তা করা আপনার পক্ষে একটা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন, আপনার ভালবাসা—"

"বাজে কথা বোলো না।"

"বাজে কথা? হায় ভগবান, আরে প্রেম করা অন্যায়? প্রেম অত্যন্ত মনোরম বস্তু। আমি তো প্রায়ই প্রেমে পড়ি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা প্রেমিক-টেমিকদের বিশেষ একটা পাত্তা দেয় না। যাক্ আপনি রাগ করবেন না চম্পাবাজী, সরি। আজ এই চমৎকার পরিবেশে আপনার সেতার শোনা আমার উচিত ছিল, রাগ বাগেশ্রী তিন তাল অথচ দেখুন আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি।"

"অন্যের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আপনি সম্ভবত ভুলে গেছেন, আপনার মত ছাত্রকে আমি রোজ পড়াই।"

"জানতাম আপনি এই কথাই বলবেন। আমরা সারা জীবন একই কথা বলে যাই।" গৌতম অপ্রসন্ন। "আমি জানি নিজেকে রোম্যান্টিক প্রমাণিত করার জন্য ভাইয়া সাহেব কি কি ম্যানারিজম ব্যবহার করতেন! শুনেছি, খুব ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পারেন?"

"ভাইয়া সাহেবকে তুমি সহ্য করতে পার না কেন?" চম্পা বলল।

গৌতম অপ্রস্তুত। তার মুখ লজ্জায় লাল।

"অর্থাৎ..." চম্পা বলল, "আমাদের গ্রুপের সকলেই ভাইয়া সাহেবকে বড় দাদা মনে করে, তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তোমার একথা মনে রাখা উচিত। এখানে এসেছ একটু ভদ্রতা মেনে চলা ভাল। সব সময় তর্ক, হল্লা ও দাঙ্গা ভাল ল াগ না।"

"চম্পাবাজী, ভাইয়া সাহেবকে .িয়ে করলে আপনাকে কি রকম ভাঁড়-ভাঁড় মনে হবে। আপ্পীর কথা স্বতন্ত্র। তার জন্মই এই জন্য। কিন্তু আপনি...আশ্চর্য।

এবার চম্পা অপ্রস্তুত। "আপনার কাছে মতামত চাইনি।" তার কথায় সে প্রমাণ করতে চাইল, সে গৌতমের চেয়ে বড়।

"আমি মতামত জাহির করছি না। আমার মতামত জানবার কষ্ট করলে আজ এ অবস্থা হত না আপনার!" সে নাটকীয়ভাবে, কামরায় ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগল—এই শিক্ষিতা মেয়েকে দেখ। ইকনমিক্সের ওস্তাদ, ডাইলেকটিক্সের পণ্ডিত। বছরের পর বছর একটা তুচ্ছ রোমান্সে নিজেকে জড়িয়ে শহীদ হতে চলেছেন।" কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গৌতমের অট্টহাসি।

"গৌতম তুমি সত্যই পাগল।" চম্পা হাসল।

"হে ঈশ্বর! যে লোকটি ক্লাবে গিয়ে নিয়মমাফিক বল ডান্স করে, পিকনিক আর পার্টিতে মেয়েদের মুভি তুলে বেড়ায়, মেয়েদের মত সুন্দর এবং মেয়েদের মতই নিজের রূপ নিয়ে গর্ব করে—তাকে আপনি ভালবাসেন! ভালবাসাই যদি একান্ত প্রয়োজন মনে করেন—আমাকে ভালবাসুন। বা কামাল বা হরিশংকরকে ভালবেসে ফেলুন। এদের ছাড়া আরও হাজার হাজার লোক আছে। অবশ্য আমি এদের চেয়ে একটু পৃথক, স্বতন্ত্র।" পরক্ষণেই সে গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করল—"চম্পাবাজী আপনাদের অবশ্য একটা ঝামেলা আছে। আপনারা একটা প্রসেস, রেওয়াজকে বেশী ভালবাসেন। একটা দেবমালা প্রয়োজন, ব্যস!—কিছু নতুন কাজ করুন না!"

"করি। লড়াই।" চম্পা নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করল। গৌতম নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করে চলেছে। বছরের পর বছর সে নিজেকে, নিজের চিন্তাধারা অনুভূতি ও ভাবনাকে এদের তুলনায় অসাধারণ মনে করে এসেছে অথচ গৌতমের সামনে আজ নিজেকে অত্যন্ত দীন ও অসহায় মনে হচ্ছে। "প্রত্যেকে শিল্পী হতে পারে কই!" চম্পা একটু যেন চেঁচিয়ে বলল।

"আপনাকে শিল্পী হতে বলছে কে? সৈন্যদলের মত হাজার-হাজার শিল্পী ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। ও কথা বাদ দিন। অন্য কিছু করুন, মৌলিক কিছু কাজ।" গৌতম লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ল: "আপনি কিছুই দেখতে, বুঝতে পারছেন না?"

"দেখতে পাই", চম্পা বলল। "কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে। বাঁচার প্রশ্নটা আমার কাছে অনেক বড়। চাকরি করি, তিনশ টাকা পাই।

আমার বাবা সাধারণ উকিল। তোমাদের মত বড়লোকদের মত আমি শুধু দারিদ্র্যের থিওরি কপচাই না। আমি যেন প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যকে অনুভব করে চলেছি।"

"ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে আপনিও ক্লাবে গিয়ে নাচবেন, রাইডিংগ করবেন, না?"

"তা নয়তো কি আমি লাল ঝাণ্ডা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ব।"

"তাহলে বিয়েই ইকনমিক সমস্যার সমাধান। চম্পা বেগম, আর সবার চেয়ে আপনাকে একটু আলাদা মনে করতাম। যাক্, বলুন তো এই ভদ্রলোককে আপনার এত ভাল লাগে কেন?"

"জানি না।" কম বয়সী মেয়েদের মত সে লজ্জা পেল। রেগেও গেল একটু।

"তাহলে, ভাল চেহারা আপনার ভাল লাগে? কবিদের মত মেজাজ পেয়েছেন আপনি।" ঘুরতে ঘুরতে সে আয়নার সামনে দাঁড়াল, নিজের চেহারা দেখে ভুরু কুঁচকে বলল—"আমাকেও কোনো মেয়ে এমনভাবে ভালবাসবে? আমি দেখতেও মোটামুটি খারাপ নই।"

"শান্তা তোমাকে ভালবাসে না?"

এবার গৌতমের অবাক হবার পালা। চম্পা খুশী হল—এতক্ষণে গৌতমকে সে জব্দ করেছে।

"তুমি শান্তার বিষয় কি জান?"

"তুমি তাকে ভালবাস না? সে যেই হোক, তোমার কজিনের যে স্ত্রী, তোমার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছর বড়। তুমি শান্তা নীলাম্বরকে ভুলতে বসেছ। অনেক দিন তাকেও চিঠিও লেখনি, এখানকার রিপোর্ট পাঠাও নি। সে তোমার ইনটেলেকচুয়াল বন্ধু। কিন্তু তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে না। তুমি কাউকে বিয়ে করতে পারবে না, নির্মলাকেও না। গৌতম বাহাদুর, এ সব বড় রহস্যময় ব্যাপার। তোমার সিদ্ধান্ত এখানে অচল। আমি ভাইয়া সাহেবকে পছন্দ করি। তিনি আমার ইনটেলেকচুয়াল বন্ধু নন। গৌতম বাহাদুর, আমার তো তোমাকেও ভাল লাগে। এবার কি করি বল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বড়ই বিচিত্র। ধীরে ধীরে আমার তোমাকেও ভাল লাগছে। তাহলে আমি কি ফ্লার্ট করি? নিশ্চয়ই না। আমি মানুষকে ভালবাসতে জানি। আজ আমি কনফেস্ করলাম। জানি আমার কনফেসনের জন্য তোমারও কাঁচের ঘর ভেঙ্গেছে।" সে উদাস হয়ে কথা শেষ করল।

অন্ধকারে সে যে নৌকায় চড়ে চলেছিল, ঝড়ের মুখে সেই নৌকো কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে।

গৌতম চুপ। সে কি বলবে যেন স্থির করতে পারছে না।

চম্পার হৃদয় তার প্রতি করুণায় ভরে উঠল—কত ভাল ছেলে। হরিশংকর ও কামালের সব গুণ যেন এর মধ্যেও আছে। তাদেরই মত গম্ভীর আর দুষ্টু। এ দুজনে খুঁজে খুঁজে ঠিক নিজেদের মত লোকই বের করে। একেই দেখ, কোথা-কোথা থেকে এসে ঠিক এখানেই জুটেছে।

"তুমি শাস্তার বিষয়ে কি জান?" স্বভাবতই গৌতম রেগে গেছে। গৌতম চম্পার সঙ্গে ঝগড়া করছে, ঠিক আপন মানুষের মত। তার স্বরে প্রকাশ পাচ্ছে রাগ, অভিমান, সমালোচনা, অনুরাগ। মনে হয় গৌতম যেন চম্পার খুব কাছে এসে গেছে। এই অনুভূতি চম্পাকে আরও উদাস করে তুলল।

"গৌতম।" চম্পা বলল—"খুব পুরোনো কথার জন্য ক্ষমা কোরো। তবুও বলি আমরা সবাই খোলা বইয়ের মত, যে কোনো পাতা, যে কোনো লোক পড়তে পারে। আমাদের মধ্যে কোনো মিস্টি নেই। প্রত্যেকেই ভীষণভাবে এক্সপোজড—প্রখর আলোয়। সেই অন্ধকার কোথায়, যেখানে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখবে!

...তোমাকে যখন দেখি, আমার মনে হয়, প্রখর আলোয় আমরা দাঁড়িয়ে আছি—সেই আলোয় তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আমার কাছে উদভাসিত। এর উল্টোটাও ঠিক। তুমিও সেই আলোয় আমার পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাচ্ছ।"

"চম্পা শব্দের মায়াজাল বুনে লাভ কি?—শেষ কর এসব। শব্দ আমাদের খেয়ে ফেলবে।"

শব্দ না থাকলেও তার অর্থ তো রয়েই যাবে। আমাকে বলে দাও, আমরা কি করতে পারি।" চম্পার বিবশ কণ্ঠস্বর।

বত্রিশ

"আরে শোনো-শোনো আমাদের ভাইয়া সাহেব গৌতমকে ঈর্ষা করেন।" তলঅত একদিন সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিতে বসে নির্মলাকে জানাল।

"গৌতম কে? হায় হায়! ভীষণ মজার ব্যাপার তো! তাকে কে ঈর্ষা করবে? অত্যন্ত ডিফেন্সলেস সে।"

"তা ছাড়া আর কি …… আশ্চর্য!"

ঠগ মণ্ডলীর মত, প্রত্যেকেই এই মণ্ডলীর প্রত্যেককে ভালবাসে। একবার যে এই গ্রুপে ঢুকল, তার জন্য যে কোনো সদস্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

"কিন্তু চম্পাবাঈীর খবর কি? তিনি আবার ……" নির্মলা ভাবতে ভাবতে বলল।

"যাঃ ছেলেমানুষি কোরো না!"

"ছেলেমানুষি কি? সময় সব কিছু করতে সক্ষম!" নির্মলা বয়স্কদের মত বলল।

"ভুল কথা।" তলঅত জোর গলায় বলল—"চম্পাবাঈী এরকম কাজ করতেই পারেন না। তিনি ছেলেমানুষ নন। আচ্ছা তুমি গৌতমকে ভালবাসতে পার?" তলঅত হঠাৎ নির্মলাকে জিজ্ঞেস করল।

নির্মলা আসল কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইল। "গৌতম কে! যাঃ! এত ঘনিষ্ঠ হবার পর এ সব হয় না। হে প্রিয়া! প্রেম করার জন্য রহস্য-টহস্য থাকা দরকার।"

"অথচ আমাদের জেহাদ এই রহস্যের বিরুদ্ধেই।"

"তা ছাড়া আর কি!"

"আসলে চম্পাবাঈীর এই লাগাতার প্রেম আমাদের সাইকোলজী নষ্ট করে দিয়েছে। হে ভগবান, যেদিন থেকে এখানে এসেছেন, মনে আছে···? আমরা তখন ফাস্ট ইয়ারে। থার্ডক্লাস ব্যাপার।"

"অত্যন্ত থার্ডক্লাস।" নির্মলার সমর্থন।

"বুঝতে পারি না, যখন ভাইয়া সাহেব তাকে বিয়ে করতে চান, তিনি বিয়েতে মত দিচ্ছেন না কেন?"

ইতিমধ্যে একটা সাইকেল এসে দাঁড়াল। গৌতম নীলাম্বর সাইকেল থেকে নামল।

"জানাতে এসেছিলাম, এই অধমের দিন এখানে শেষ হয়ে এসেছে।"

"কোথায় যাচ্ছ?" তলঅত জিগ্যেস করল।

"এই একটু বিলেত যাচ্ছি। সংবাদপত্র পাঠাচ্ছে।"

"এই একটু বিলেত যাচ্ছি!" তলঅত নকল করে বলল—

"আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে! আহা! আমরা যেন কখনো বিলেত যেতে পারি না। তুমি যাও, দেখবে আমরাও পেছনে পেছনে আসছি।"

"তুমি চললে? সত্যিই আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।" হরিশংকর বলল।

"খারাপ লাগারই কথা। আমি অত্যন্ত মজাদার লোক।" গৌতমের উত্তর।

তলঅত এদের ছেড়ে নির্মলার কাছে গেল।

"গুরু যাচ্ছে।" সে বলল।

"আমিও শুনেছি।" সে কাঁদছে। তলঅত অবাক।

"পাগল মেয়ে কাঁদছ কেন? বিয়ে করে তুমিও ওর সঙ্গে বিলেত যেতে পার।"

"সে আমাকে বিয়ে করবে কেন? চম্পাবাঈীর প্রতি ওর প্রচণ্ড দুর্বলতা। সারা জীবন চম্পাবাঈীর সঙ্গে আমার তুলনা করবে। চম্পাবাঈীর ছায়া হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।" নির্মলা

কাঁদতে কাঁদতে বলল।

"চম্পাবাজী, চম্পাবাজী, তোমার চেয়ে খারাপ আর কে হবে? জানিনা, আর কার কার ক্ষতি তুমি করবে।' তলঅত থেমে থেমে বলল— কাঁদিস না পাগলি মেয়ে!" তার গলাও ধরে এল। বারান্দায় গৌতম ও হরিশংকরের অট্টহাসি ভাসছে। এই মুহূর্তে চম্পার প্রতি তলঅতের মন ঘৃণায় ভরে উঠল।

চম্পা জানালায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আকাশ দেখছিল।

"বনত বনাউঁ বন নাহি আবৈ হরি কে বিনা!…হরি কে বিনা।" পাশের ঘরের কোনো মেয়ে গাইছিল। রাগ পূরবী খেয়াল।

সহসা সে যেন বুঝতে পারল। বিরহ বাস্তবে আসল প্রেম। ঘাসের উপর মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পেশাল রুমে পিয়ানো বাজছে। সে নীচে নেমে বাদশাহ বাগের দিকে এগিয়ে গেল। প্রফেসারের বাড়ীতে অনেক লোক।

"ডায়েরেকট একশন!—কলকাতা — কলকাতা — দুই হাজার মৃত্যু!"

এরা কি বলছে? স্বপ্ন দেখতে-দেখতে সে জেগে উঠল যেন। গৌতমও আছে। সে ঝুঁকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখে চলেছে।

"হল কি?" চম্পা একটু ঘাবড়ে গেছে।

"নিজের লীডারদের জিজ্ঞাসা কর চম্পা বেগম। কে যেন তার কাছে এসে বলল।

চম্পা অসহায়—"আমার লীডার!" তার গলা শুকিয়ে আসছে।

"হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমার লীডার। লীগকে ভোট দিতে গিয়েছিলেন আপনি।"

"ভুল কথা।" সে আস্তে আস্তে বলল, গৌতমের দিকে তাকাল। গৌতম মুখ ফিরিয়ে নিল।

প্রত্যেকের চোখে তার প্রতি অপ্রীতি।

"চল, আমার বাড়ী চল। বসে কথা বলব।" হরিশংকর বলল।

আরেকজন হরিশংকরকে জিজ্ঞেস করল—তোমার কমিউনিস্ট পার্টিও খেল দেখাচ্ছে—পাকিস্থানের দাবী, জনতার দাবী।"

"আমরা শান্তি চাই।" গৌতম বলল

"শান্তি। যত সব বাজে কথা। গান্ধীবাদীদের চেয়ে বড় ফ্রড আর কেউ নেই।"

সে ফিরে এল। কৈলাশ হোস্টেলে য়ুনিয়নের সংকটকালীন অধিবেশন চলছিল। সে এগিয়ে গেল। চাঁদবাগের চ্যাপেল থেকে অরগানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে। রায় বিহারীলাল রোডে সারি সারি বাড়ী। সব বাড়ীর দরজাই আজ চম্পার জন্য বন্ধ।

দ্বিতীয় দিন সে জানতে পারল, এই গ্রুপ মৃত্যুর ভয় তুচ্ছ করে কলকাতা যাত্রা করেছে। নির্মলা, তলঅত, তহমীনাও গেছে তাদের সঙ্গে।

মাসের পর মাস কেটে যায়।

গ্রুপ কলকাতার পর বিহারে 'শান্তি', 'শান্তি' বলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাতে তারা গান্ধীজীর সঙ্গে বসে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গায়, দিনের বেলায় আহতদের সেবা করে।

মেয়েরা ফিরে এসেছিল। লক্ষ্ণৌর জীবন যথাযথ। একদিন চম্পা কাগজে পড়ল—বিহারে, ফল্গু নদীর ধারে কিছু দাঙ্গাবাজ তাদের ওপর হামলা করেছে। আহতদের মধ্যে কামাল ও হরিশংকরও আছে। চম্পা তাড়াতাড়ি সাইকেল চেপে গুলফিশাঁ রওনা হল। গেটের সামনে স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে। তহমীনা, তলঅত ও নির্মলা যাত্রার জন্য তৈরি। তহমীনা তাকে খবর দিল—ভাগ্যিস, শংকর চাচা সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এদের মোটরে গোরখপুর নিয়ে আসেন। গোরখপুরে তিনি সিভিল সার্জেন। এখন আমরা গোরখপুর চললাম।

"চম্পা তুমিও চল।" তহমীনা বলল। "গত কয়েক মাস ধরে তুমি আমাদের প্রায় ত্যাগ করেছ। আমরা ভাবছিলাম তুমি ব্যস্ত আছ। এখন কলেজ বন্ধ। চল আমাদের সঙ্গে। ফিরে আসবার সময় তোমাকে বেনারসে ড্রপ করব।"

গ্রুপ চম্পাকে আবার ডাকছিল। চম্পা সেই ডাকে সাড়া দিল।

তিনটি ছেলেই সিভিল সার্জেনের কুঠির পেছনের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গান গাইছে 'চলো হেনা গোরী'—প্রত্যেকেই গুরুতর ভাবে আহত। এরা সারাদিন পড়ে পড়ে গান গাইত। গৌতম প্রতিদিন নিজের কার্যসূচী পালটাতো। তার বাঁ হাতে প্লাস্টার। "জানিনা, এই হাতের তিনটি আঙ্গুল আমি ফিরে পাব কি না!" সে উদাস। "চম্পা!" একদিন সে উত্তেজিত হয়ে বলল—"ভাবতে পার, আমি আর কখনো পিয়ানো বাজাতে পারব না।"

"বন্ধুবর, মরবিড হয়ে বেশ রোমান্টিক ড্রামা করছ তো। বাজাতে পারবে না কেন?" কামাল বলল। তার পায়ে চোট লেগেছে।

তারা যখন প্রায় সুস্থ, তখন ফিরে যাবার কথা উঠল।

"চল একটু বেড়িয়ে আসি। বোহেমিয়ানের মত। জানিনা আবার কবে এদিকে আসব।" কামাল বলল। কামাল এখন প্রায়ই চুপ থাকে অথচ গৌতমকে মরবিড না হবার উপদেশ দেয়।

"এখানকার গ্রাম, গ্রামের অবস্থা আমাদের প্রত্যক্ষ করা উচিত। আমরা মির্জাপুরও যাব, আমাদের কমরুণের বাড়ী যেখানে।"

তারা হৈ-হল্লা করতে-করতে হাতীর পিঠে বসে কপিলাবস্তু পৌঁছল। গ্রামের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে তাদের দেখল।

কামাল একটা পাথরের ওপর বসল।

এখানে পদ্ম ফুলে ভরা পুকুর, সোনালী হরিণের দল, চামেলী ফুলের সৌরভ কোথায়?—চম্পা নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

"বন্ধুবর, চারিদিকে নীরবতা।" কামাল ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

"প্রচণ্ড নীরবতা।" হরিশংকর বলল—"চল ফিরে যাই। হাতী আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।"

কামাল গম্ভীর হয়ে বসে রইল। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল:

"শংকর, বন্ধু, ইতিহাস একটা বিরাট ফ্রড। ইতিহাস বরাবর আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছ।" শংকর তাকে সমর্থন করল।

তারা এগিয়ে এল হাভার দিকে। তাদের বিচিত্র ছায়া মাটিতে পড়ছে।

তেত্রিশ

ফিরবার পথে চম্পা বেনারসে নামল। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছে সে বন্ধুদের খোদা-হাফিজ বলল আর একাগাড়ী চড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল। রামলীলার হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। পাড়ায় পৌঁছে সে দূর থেকে নিজের বাড়ীর ফটক দেখতে পেল। শীতের রাত। তার বাড়ীতে আলো জ্বলছে, মনে হচ্ছে অন্ধকার সমুদ্র আলো করে কোনো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এক আত্মীয় বোনের বিয়ে। হৈ-হল্লায় ঘর মুখরিত। সে চুপচাপ দালানের অন্ধকারে একটা পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। তার পায়ের কাছে কোনো আত্মিয়ার বাচ্চা ছেলে শুয়ে। দালান থেকে বুয়া হুসেন বাঁদীর গান এদিকে ভেসে আসছে—

উসনে কহা, 'তু কৌন হ্যায় ?'
ম্যায়নে কহা 'সৌদা তিরা।'
উসনে কহা 'করতা হ্যায় কেয়া ?'
ম্যায়না কহা 'সওদা তিরা!'

সে বলল, তুমি কে ? আমি বললাম তোমার প্রেমিক।

সে বলল, তুমি কি কর ? আমি বললাম, তোমার দর-দস্তুর।)

উঠুন এবং দেওয়ালে মহিলাদের ছায়া কাঁপছে। কেউ সশব্দে একটা ঘণ্টা চৌকির উপর রাখল। দালানে কোনো ঘুমন্ত বাচ্চা কেঁদে উঠল। আবার গানের সুর—

উসনে কহা, 'তু কৌন হ্যায় ?'
ম্যায়নে কহা, 'সৌদা তিরা।'

চম্পা চোখ বন্ধ করে সব শুনছে! বাচ্চীখানায় তেলের প্রদীপ জ্বলছে। চারিদিকে ধুঁয়ো, কালচে-কালচে ভাব। নিজের বাড়ী !!!

রাত্রির নীরবতা। একটা গরুর গাড়ী জানালার নীচে রাস্তা দিয়ে

এগিয়ে চলেছে। গাড়ীর কর্কশ আওয়াজ ভাল লাগছে না। চম্পার মনে পড়ল—একবার রসুলন দাই তাকে বলেছিল—

"যখনই কোনো গাড়ী থেকে এরকম ধ্বনি বেরোয়, মা ভবানী রাগ করেন। ভীষণ অপয়া ধ্বনি—অঘটন ঘটে।"

তার বুক কেঁপে উঠল। কি হতে পারে? পরমুহূর্তেই তার তার্কিক অস্তিত্ব তাকে বোঝাল—সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কামালের বিশ্লেষণ···আঃ, কামালকে গুলি মার। তার বিশ্লেষণই কি ঠিক? কমিউনিস্টরা কি সব সময় ঠিক কথা বলে? এ সব ভাবতে-ভাবতে গৌতম নীলাম্বর ও কামালের উৎসাহ, তলঅতের বাতুলতা, তহমীনার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব—এক এক করে ছবির মত তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে কে? তাকে লোকেরা কি ভাবে? গৌতম তাকে কি ভাবে? দূর ছাই—সে জাহান্নমে যাক্, আর আমীর রজা—আমীর রজা—অনেক বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে রইল।

দিন কেটে যায়। শূর্পণখার নাক কাটা হয়, রাবণের আকৃতি জ্বলে ছাই হয়, ভরত-মিলাপ হয়, ছুটো রোগা ছেলে মুখে পাউডার মেখে মাথায় নকল মুকুট পরে, রাম-লক্ষ্মণ সেজে গর্বিত পদক্ষেপে সিংহাসনে বসে। মানুষ তাদের মধ্যেই দেবদর্শন করে। ছুটি শেষ হলে সে লক্ষ্ণৌ ফিরে আসে। কাত্তিকের অমাবস্যা। দেওয়ালী, আলোয় ঝলমল লক্ষ্ণৌ শহর। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পুজো। গুলফিশাঁর বারান্দায় খালা বেগম সাবধান করে দিলেন—"ছেলেমেয়েরা সব আজ তোমরা বাইরে বেরিও না। আজ রাতেই শত্রুরা না জানি কি যাদু করে।

তলঅত বলল:

··· সামনে চৌমাথায় কেউ একটা ঠোঙায় মিষ্টি রেখে গেছে। একটা প্রদীপ জ্বলছে। "মনে আছে, একবার ম্যাজিকের হাড় উড়তে উড়তে আমাদের বাগানেই পড়ল।"

তলঅত গুলফিশাঁর লনে বসে আকাশ দেখতে লাগল। "আজ রাতে লক্ষ্মী নিজের বাহনে বসে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াবে। কার কার দরজায় তিনি যাবেন, কে জানে!··· বাইরে ঘাসের উপর বেড়িয়ো না তোমরা।"

খালা বেগম আবার সাবধান করে দিলেন—"বর্ষার সাপ দেওয়ালীর প্রদীপ চেটে আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যায়।"

জায়গায় জায়গায় চৌরাস্তায় জুয়া খেলা হচ্ছে। রাম অবতার ও কদীর জুয়া খেলতে গেল। তারপর ভাই ফোঁটা এল। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের হাওয়া গাছের পাতায় লাগল। গ্রামে নাটকের যাত্রার পালাগানের গীত প্রতিধ্বনিত হল। হলুদ শাড়ী পরে ক্রিশ্চান মহিলারা যিশুর গান গাইল—'আহা মসীহা আয়া সরে আস্‌মা, সরে আসমা।' খিচুড়ীর পার্বণে সবাই মাঘমেলা-স্নানের জন্য ত্রিবেণী চলল। বসন্ত পঞ্চমীর দিনে ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজোর আয়োজন। মানুষ নিজের কল্পনায় দেখল দেবী, শ্বেত বস্ত্র পরে, শ্বেত পদ্মের ওপর হাতে বীণা নিয়ে বসে আছেন। কুমোরের হাতে গড়া মাটির প্রতিমায় তারা দেবী দর্শন করল। তারপর ফাল্গুন মাস। শিবরাত্রির প্রস্তুতি।

মোহররম। ঘরে ঘরে কাগজের তাজিয়া গড়া হল। কাগজের টুকরা, রেশমের দড়ি, তাবুত ও তাজিয়ায় তারা খোদার কেরামতী দেখতে পেল। ইমামবাড়ায় 'চিরাগ' (প্রদীপ) জ্বালা হল। অলি-গলিতে মানুষ শোক গীত গাইল। এল ফাল্গুন মাস। হোলী। আকাশ বাতাস রঙিন হয়ে উঠল।—আবীর ও রঙে হুল্লড়বাজরা পথে কবীরের গান গেয়ে বেড়ালো।

মানুষেরই ভুল। কোনো বস্তুরই কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তিগত আনন্দই মূল বস্তু—যেখানে পাও যেমন করে পাও, আনন্দ হাসিল কর। তোমার সিদ্ধান্ত, তোমার জেলযাত্রা, তোমার কংগ্রেস, তোমার মুসলীম লীগ, সব বাজে কথা—অর্থহীন। তোমরা মানুষের ভাগ্যের ফয়সালা করাতে চাও, অথচ দেখ মারামারি কাটাকাটি করে মানুষই কত রক্তপাত করছে। না—আমি কেবল ব্যক্তিগত আনন্দ চাই—ব্যক্তিগত আনন্দ! ঘর, শান্তি, সন্তান, পতি ও প্রেম।

"চম্পা বেগম, অত্যন্ত লজ্জার কথা! এ সব কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। লজ্জা করে না তোমার?" জানালায় পা ঝুলিয়ে বসা তার তার্কিক অস্তিত্ব তাকে সাবধান করে—"লজ্জা করে না তোমার!" বাতাসে এই কথারই প্রতিধ্বনি। ভাদ্র মাসের ঘনঘোর

বর্ষায় সে একই কথা শুনল। বর্ষা। নদী-নালায় জল উপচে পড়ছে। গৌড়মল্লারের সুরে সারা পৃথিবীর বেদনা! পূরবী হাওয়া যেন তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করছে।

গাছের ডাল সরিয়ে সে পথে এল। সামনেই প্রফেসর ব্যানার্জীর কুঠি। আজ আবার তাঁর ড্রইংগ রুমে লোকের ভিড়। আজ পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনো কিছুর ফয়সালা করার আগে এরা আমাকে জিজ্ঞেস করে না কেন? আমি— চম্পা আহমদ, এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছি। ড্রইংরুমের পর্দার পেছনে সকলে জড়ো হয়েছে। চামেলী গাছের ভিজে ঝোপ ছাড়িয়ে সে ধীরে ধীরে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রফেসর সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে চেয়ারে বসে আছেন। গৌতম ও কামাল উপস্থিত। গৌতম নূতন হিন্দুস্থানী দূতাবাসের সঙ্গে মস্কো চলেছে।

দিল্লী, সিমলা, নম্বর ১০ আউরংগজেব রোড, বায়সরীগল লজ, ভঙ্গী কলোনী—প্রত্যেকটি শব্দ চম্পার কানে আসছে। সে জানালা ছেড়ে সরে এল। আবার পথ।

এখন তার সামনে দুই পৃথিবী।

একদিকে এরা রইল। এদের আদর্শ, এদের সংঘর্ষ। কিন্তু এখানে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অস্পষ্ট। অপর দিকে শান্তি, সুরক্ষা, ব্যক্তিগত আনন্দ। আমির রজা পাকিস্থান চলেছেন। কেন যাবেন না? কামালের মত তিনি পাগল নন তো? এখানে তাঁর ভবিষ্যৎ কি? নতুন দেশে উন্নতি করতে করতে তিনি অনেক ওপরে উঠবেন। ব্যক্তিগত আনন্দ, ব্যক্তিগত উন্নতি, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য··· কেউ চাইবে না কেন? রাজনীতি তো জীবন হতে পারে না? অন্যেরা আমাকে কি দিল?—সে এসব ভাবতে শুরু করল। আমির রজার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, আমি পাকিস্থান চলে যাব—ব্যস ব্যাপার চুকে গেল। সব মুশকিল আসান হয়ে গেল!···হঠাৎ তার মনে হল হই হল্লোর যেন শেষ হয়ে গেছে। শান্তি! শান্তি! কল্পনায় সে নিজের নাম পড়ল—বেগম আমির রজা করাচী। বাঃ! কিন্তু এদের কথা খুব মনে পড়বে। যাক্ পৃথিবীতে মানুষ সব কিছু

পায় না। তুমি কেকও নেবে, আবার খাবেও—অসম্ভব। সে হাঁটতে হাঁটতে শাহী ফটকে পৌঁছল। তার পেছনে পেছনে গৌতম আসছিল।

"চম্পাবাজী, খোদা হাফিজ!" সে বলল।

"মস্কো চললে?"

"হ্যাঁ, কামাল জুলাই মাসে যাবে। তলঅত ও নির্মলাও যাচ্ছে। কেম্ব্রিজে তারা ভর্তি হয়েছে।" সে বাদশাহ বাগের ফটকের পুরোনো থামে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি আমাকে বলছনা কেন গৌতম, আমার কি করা উচিত।" সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

"কোন কোন ব্যাপারে আপনি আমার মতামত নেবেন? আপনিই তো বলেছিলেন—কে কাকে উপদেশ দেবে? আমি ছোটলোক নই চম্পাবাজী, আমি ছোটলোক নই।

"আর কিছু বলবে না?"

"আর কি বলব। আপনি তো শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে চান না! যাক্ খোদা হাফিজ। 'গুলফিশাঁ' গেলে আপ্পীকে বলে দেবেন। আমি কাল সকালে দিল্লী যাচ্ছি।" সে এগিয়ে গেল।

এবার কামাল সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। চম্পাবাজী, অভিনন্দন। তোমাব পাকিস্থান তুমি পেলে শেষ পর্যন্ত। কামালের স্বরে ঘৃণা, ও নিরাশা। চম্পা কেঁপে উঠল। সে ভেবেছিল কামাল লেক্চার দেবে, ভাল-মন্দ বলার কিন্তু কামাল কোনো কথাই বলছে না। যেন আর কিছু বলার রাগ করার, তর্ক করবার সময় পেরিয়ে গেছে। সব কথা শেষ হয়েছে। সামনে নির্মম পৃথিবী। কামাল কয়েক মুহূর্ত ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল তারপর সেও চুপচাপ এগিয়ে গেল।

সে একলা ঘন ফুল গাছের হাল্কা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। এরা সকলে তাকে ছেড়ে নিজের নিজের পথে যাত্রা করেছে।

সে পথে নামল। নীরবতা। বাড়ী ও গাছের সারির পর 'গুলফিশাঁ'। এখন 'গুলফিশাঁ' তার কাছে প্রায় অজানা লোকের মত কিন্তু সেই গুলফিশাঁয় 'সে' আছে—যে তার হাত ধরবে,

পথ দেখাবে। জীবনে প্রেমকে কি অস্বীকার করা যায়? মানুষ কতোদিন ছায়ার পেছনে দৌড়াবে? চম্পা তাকে বলবে—আমি এসেছি। আমি তোমার কাছেই এসেছি। সব অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনা, নস্যাৎ করে তোমার কাছে এসেছি। কণ্টকাকীর্ণ পথে তাদের চলতে দাও, পাগলের মত উন্মাদের মত। এরাও একদিন ক্লান্ত হবে, আমার মতই কোনো আশ্রয় খুঁজবে। আমাকে শান্তি দাও, স্থিরতা দাও। আমি এসেছি যদিও স্রেফ রোমান্সের অর্থ আমি এখনো বুঝতে পারিনি যার সিম্বল তুমি (এখানে প্রত্যেক জিনিসে সিম্বল আছে। এরা জীবনকে সিম্বলে বিভক্ত করেছে) তবু আমি আসছি।

'গুলফিশাঁ'র ফটকে রামঅবতার মালীর সঙ্গে দেখা।

"ভাইয়া সাহেব আছেন?" তার যেন গলা কেঁপে উঠল।

সে ভয় পাচ্ছে। সে যেন 'গুলফিশাঁ'য় ডাকাতি করতে এসেছে।

"ভাইয়া সাহেব এক্ষুণি চলে গেলেন।"

"কোথায়?"

গঙ্গাদীনও বাগান থেকে বেরিয়ে এল।

"কোথায় গেছেন ভাইয়া সাহেব?"

"ওই, সেখানেই।" রামঅবতারের স্বর তিক্ত—"মুসলমানদের পাকিস্থান। আপনিও যাবেন—সকলেই চলে যাবে? আমরা এখানে একলা থাকব।"

"ভাইয়া সাহেব বোম্বাই গেছেন। সেখান থেকে করাচী যাবেন—কদীর বলছিল" রামঅবতার খবর দিল— "হো লালা লা লালা—" টিয়া পাখি উড়াবার জন্য সে একটা ঢিল ছুঁড়ল।

গঙ্গাদীন আর রামঅবতারকে ছেড়ে সে ফিরে এল। ভাইয়া সাহেব চলে গেলেন—জীবনে মে: মোটর গাড়ি আর ঘোড়া—এই ছিল তাঁর নেশা। এখন আর কটি নূতন নেশায় তিনি মেতে উঠেছেন—নূতন দেশ, পদমর্যা.।, উন্নতি—পুরুষদের জগতই আলাদা।

"এই লোকটির জন্য আমি কত সময় নষ্ট করেছি! আমি কত বোকা ছিলাম।" আসল কথা হল ভাইয়া সাহেব অত্যন্ত রূপবান এবং তাঁর সঙ্গে খুব ভাল সময় কেটেছে। মনের মণিকোঠায় একজন রূপবান পুরুষের সঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্তের স্মৃতি থাকা ভাল। কিন্তু আমি তাঁকে ভালবাসতে পারি নি—কখনো না। ভাইয়া সাহেবের জগৎ—'গুলফিশাঁ' তার সামনে। গুলফিশাঁর লনে সবুজ ঘাস। একদিকে ইউকালিপটাসের সারি। কামাল, গঙ্গাদীন, তহমীনা ভেতরে বসে আছে। ভাইয়া সাহেব ······ ভাইয়া সাহেব রূপবান, দাম্ভিক! কি নিয়ে গর্ব করতেন তিনি। এসব ভাবতে ভাবতে চম্পার হাসি পেল। ইচ্ছে হচ্ছিল সে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে। মানুষ দাম্ভিক কেন হয়? ব্যক্তিত্বের দম্ভ? গৌতম নীলাম্বর নিজের ইনটেলেক্ট নিয়ে গর্ব করে, কামাল নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে, তহমীনা নিজের কোমল স্বভাব নিয়ে। এত অভিমান কেন? পথে চলতে চলতে চম্পা আকাশ দেখল। বর্ষা আসছে। বুক্ত হাওয়া। গাছের পাতা দুলছে। ভাল লাগছে।

এই 'ভাল লাগা' শুধু আমিই অনুভব করছি, না অন্য লোকেও করছে? অর্থাৎ তহমীনা—আর ··· গৌতম যে নিজের কাজিনের স্ত্রী শান্তাকে ভালবাসে।······"

"হা—হা—হা ··· হাউ ফানী।" সে মনে মনে বলল।

সে পালাল। চারিদিকে ভেজা মাটি, মাটির সোঁদা গন্ধ। আম গাছের উপর কাল, ঘন মেঘ। গুলফিশাঁর বাগান পেরিয়ে সে পেছন দিকের পথ ধরল। ওদিক দিয়ে একটা ছোট কাঁচা রাস্তা সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠী ও নদীর দিকে যায়। চারিদিকে বর্ষায় ভেজা ফুলের গাছ। লাউ গাছের ঝোপে সে কমরুণের আঁচল দেখতে পেল।

"কি ব্যাপার বিটিয়া?" কমরুণ হঠাৎ সামনে এসে জিজ্ঞেস করল।

"ড্রাইভার-বিবি, কিছুই তো না ··· " সে বলল।

কমরুণ তাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত।

"আমি এখানে বসি ড্রাইভার-বিবি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বিটিয়া—বসুন। বৃষ্টি পড়ছে—আপনি বারান্দায় চলে আসুন।"

সার্ভেন্ট কটেজের বারান্দায় সে চলে এল। ভেজা মাটি। একধারে অনেক বাসন রাখা। চাদরের ওপর পাপড় ছড়ানো।

"পাপড় শুকোবার জন্য শুকনো মাটিও পাওয়া যায় না।" কমরুণ দেহাতী ভাষায় কথা শুরু করল। সে বুঝতে পেরেছে—একটা কিছু ঘটেছে। "বিটিয়া, আপনারা পুরুষ মানুষের মনের খবর রাখেন না। আমরা এ টুকুই বুঝি, পুরুষ মানুষের খুশীর জন্য সব কিছু ত্যাগ করা দরকার। অবশ্য তাদেরকে খুশী করা অসাধ্য ব্যাপার। আমি তহমীনা বিটিয়াকে কত বোঝালাম—মেয়েদের নিজের সামর্থ্য সীমা বোঝা উচিত। ভাইয়া সাহেবের ওপর রেগে রইল। এখন নাও, তহমীনাকে কিছু না বলে তিনি পাকিস্থান চলে গেলেন। এখন বিটিয়া সাহেব সারা দিন ঘরে বসে-বসে কাঁদছে।"

ভাইয়া সাহেব নয় তো অন্য কোনো লোক আছে। ড্রাইভার বিবি, সব পুরুষ কি একই ধরণের? চম্পার স্বর অস্বাভাবিক।

"সব পুরুষই এক রকমের বিটিয়া!" কমরুণ বলল—

"পান সাজব?"

"না কমরুণ, থাক্—এবার আমি যাব।" চম্পা উঠে দাঁড়াল; ছাতা নিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কমরুণের উদাস দৃষ্টি সেই পথে, যেদিকে চম্পা গেছে—"এই মেয়েরা আমার কথা বোঝে না কেন!" সে রাম অবতারের বউ ছুটকী রামদইয়াকে বলল।

"বিটিয়াদের সাহস নেই, ভয় পায়। ভাবছেন, একটু ইংরিজি পড়ে সব কিছু জেনে ফেলেছেন। আসলে সাহস নেই?" ছুটকী মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

চৌঁত্রিশ

তলঅত তানপুরা নিয়ে বারান্দায় বসল। সে গাইতে চাইল—'অবকে সাওয়ন ঘর আজা' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরল না। তহমীনা কামরায় বসে ব্লাউজ সেলাই করছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে, গুমোট গরম। তলঅত উঠে কামরায় এল।

তহমীনা তাকে এমন ভাবে দেখল, সে যেন এক রহস্যময়ী। বাইরে এক কোয়েল ক্রমাগত ডেকে চলেছে। বহু দূর থেকে রাম অবতারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে! তলঅত যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল।

"আপ্পী সব কিছুই ফিলিংগ-এর ওপর নির্ভর করে। হৃদয় এবং মস্তিষ্কের মধ্যেকার সমীকরণের উপরও।" সে বিদুষী মহিলাদের মত বলল। এবার তুমিও আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করলে।"

"আজে-বাজে কথা!" তলঅত ভয় পেয়ে বলল—"আপ্পী আমি সত্যি কথাই বলছি। প্রবলেম ত্রিকোণ হয়ে যায়।

তোমার প্রবলেম, ভাইয়া সাহেব অথবা চম্পাবাজীর প্রবলেম এবং এই সমস্ত প্রবলেমের ইণ্টর য়্যাকসন অর্থাৎ…"

তহমীনা তাকে ভাল করে দেখল—"তুমি কেম্ব্রিজ যাচ্ছ, না?"

তলঅত দুঃখ পেল। আপ্পী আমায় বোকা মনে করছেন। "আমাকে মূর্খ মনে করছেন?" তার দুঃখী দুঃখী ভাব।

"না, তুমি খুব চালাক—কিন্তু তুমিও মেয়ে।"

"আপ্পী!" তলঅত রেগে গেল—আশ্চর্য! তুমি বুর্জোয়া হয়ে গেছ। লেখাপড়া শিখলে কেন তবে? হায় আপ্পী! তুমি য়ুনিয়নের সদস্যা ছিলে, মুভমেণ্টের সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। চম্পাবাজীর মত রিয়্যাক্‌শনারীকে তুমি এডুকেট করতে চেয়েছিলে আর এখন মেয়েছেলের লেবেল সেঁটে চুপ করে বসে আছ! আরে, ভাইয়া সাহেব চলে গেছেন তো কি হল? যেখানে মোরোগ ডাকে না সেখানে সকাল হয় না? আমি আরেকটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারি না—তুমি তাঁকে বিয়ে করতে চাও না অথচ বসে বসে কাঁদছ।

জাহান্নমে যাক ভাইয়া সাহেব! তাঁর মাথা তুমিই খেয়েছ। নির্মলা ঠিকই বলত—পুরুষ মানুষদের পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। পুরো ছটি বছর তোমার চোখের সামনে চম্পাবাঈর সঙ্গে ভদ্রলোক প্রেম করে গেলেন; এবং আজ যখন তিনি চলে গেছেন—ইনি বসে বসে কাঁদছেন। আরে এরকম লোককে জুতো পেটা করা উচিত।

"তলঅত—তিনি তোমার বড় ভাই। অসভ্যতা কোরো না।"

হ্যাঁ, এটাই বাকী আছে। তাঁর হয়ে তুমি এবার আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।"

রাগে, অভিমানে তলঅত প্রায় কাঁদ কাঁদ। ভাইয়া সাহেবের চেয়ে তার রাগ আপ্পীর ওপর বেশী। বয়সে সে যদি ছোট না হত, আপ্পীকে পিটুনী লাগিয়ে ঠাণ্ডা করে দিত। সমস্ত প্রেম ও বুর্জোয়া রোমান্স কর্পূরের মত উবে যেত। হায়! হায়! সে বাইরে বেরিয়ে এল, সাইকেল উঠিয়ে সোজা নির্মলার বাড়ী গেল। সেখানে কিছু খাবার খেয়ে ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেল। নির্মলা, মালতী ও হরিশংকরের সঙ্গে তুরূপ চাল খেলল তারপর তার মাথা ঠাণ্ডা হল।

তলঅতের যাবার পর তহমীনা উঠল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখল। প্রথম অঙ্ক শেষ হল—সে মনে মনে বলল। গুলফিশাঁর বনিয়াদ নড়ে উঠেছে। আচ্ছা, যদি আমাকে নিয়ে নাটক লেখা হয় তাহলে আমার চরিত্র কিরকম হবে—

"নবাবজাদী তহমীনা বেগম, বয়স পঁচিশ। ফাস্ট ক্লাস এম. এ. শ্যামবর্ণা, রোগা, সেন্টিমেণ্টাল। নিজেই নিজেকে কষ্ট দেয়। বাড়ীতে আপ্পী বলে তাকে ডাকা হয়। মিশুকে, শান্ত, দাম্ভিক। এ ছাড়া আর কিইবা আছে তার চরিত্রে!"

সে বারান্দায় চলে এল। বৃষ্টি থেমেছে অনেকক্ষণ। নীচের বারান্দায় অনেক আত্মীয় ছেলেমেয়ে কোড়া—জমালশাহী (এরকম খেলা) খেলছে। কামাল দেখল জানালায় তহমীনা দাঁড়িয়ে আছে। এরা সবাই নাটকের পাত্র, স্বপ্নে চলাফেরা করছে। স্টেজে প্রায় অন্ধকার। সে বাইরে চলে এল।

কামালও বাচ্চাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিল।

"কোড়া—জমালশাহী পিছনে দেখেই কি মার খেয়েছ পেছনে দেখেছ—হ্যালো আপ্পী।" সে দৌড়তে দৌড়তে এল।

তহমীনা বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কামাল বাচ্চাদের সঙ্গে মেতে উঠেছে।

"কোড়া জামালশাহী—আপ্পী! চম্পাবাজীও চললেন। হয়ত চলে গেছেন—পেছনে দেখেছ কি মার খেয়েছ—"

"ব্যাপার কি? কোথায়?" তহমীনা অবাক্।

"স্ত্রাজ—কোড়া জামালশাহী।" সে একটা বাচ্চা মেয়েকে বাছাই করা দোপট্টা দিয়ে মারল। মেয়েটি হাসতে-হাসতে তার পেছনে ধাওয়া করল।

"কি করে?" তহমীনার প্রশ্ন।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পেয়েছেন!" কামালকে বাচ্চারা প্রায় ঘিরে ফেলেছে। সে দোপট্টা ঘাসের ওপর ফেলে বাইরে পালিয়ে গেল।

পথে বেরিয়ে কামাল গুলফিশাঁকে একবার দেখল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠির দিকে চলল।

আগস্ট মাসের বর্ষায় আকাশ-পাতাল যেন ডুবে গেছে। সিঙ্গাড়া-ওয়ালী কুঠির বারান্দায় শিতলপাটি বিছিয়ে বসে-বসে তারা মেঘ দেখল। তলঅত তানপুরা সুরে মিলিয়ে মল্লার গাইতে চাইল কিন্তু সব সুর যেন ডুবে গেল।

বর্ষার স্বচ্ছ সোনালী জলে এই মাটি ভাসছে। শ্রাবণের অলৌকিক ধারা যা এই মাটিতে রয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক রক্ত তাতে মিশে আছে। রক্তের বর্ষা ঋতু, রক্তের বাদল, রক্ত মাখা কাদা গোমতীর জলে রক্ত, কূলে রক্ত, মানুষের চোখে রক্ত। তলঅত বিহ্বল হয়ে উঠল। সে নির্মলা ও হরিশংকরকে দেখল।

পঁয়ত্রিশ

তারপর যখন দুই ভাইয়ে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল, অর্জুন ধনুক উচিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলল—হে জনার্দন, আমার রথ দুই সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি দেখিতে চাই—কোন দল প্রকৃত পক্ষে আমাকে চায়।

শ্রীকৃষ্ণ রথ সেখানে দাঁড় করালেন। অর্জুন দেখলেন দুই সৈন্য দলে এক অপরের বংশধর বাপ, ঠাকুরদা, কাকা, ভাই, ভাইপো, ছেলে, বন্ধু, গুরু এক অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

তখন কুন্তীর সন্তান দুঃখ ভরা কণ্ঠে বলল—হে কৃষ্ণ, এই দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমার গলা শুকিয়ে আসছে। শরীর থর-থর কাঁপছে। ধনুক হাতে রাখতে পারছি না। হে কেশব, আমি স্থির থাকতে পারছি না। মাথা ঘুরছে। হে মাধব আমি আমারই জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রিয়জন ও গুরুজনদের কি করে হত্যা করি।

আত্মীয় ও কুটুম্ব শেষ হলে পুরাতন পরম্পরা শেষ হয়ে যাবে সেই সঙ্গে বংশের ঐতিহ্যও ধ্বংস হবে। মহিলারা আর সচ্চরিত্র রইবে না, পূর্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠা ধুলোয় মিশে যাবে। তাঁদের অনুকরণ করবারও লোক থাকবে না।

হে মধুসূদন, আমি জানিনা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে—আমি অথবা আমার শত্রু, যুদ্ধে আমরা তাদের পরাজিত করব, না আমাদের পরাজয় বরণ করা উচিত। হে গোবিন্দ !

ছত্রিশ

হিন্দুস্থান ১৯৪৭

সাঁইত্রিশ

ত্রিল ডেরিক এডবিন হবার্ড এশলে আরেকবার ঘড়ি দেখল ও পিকাডলি টিউব স্টেশনের বিরাট ঘড়ির নীচে পায়চারি করতে লাগল। সে চম্পা আহমদকে কথা দিয়েছিল। তার সঙ্গে সে এখানেই দেখা করবে তারপর তাকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাবে। চম্পা এখনো এল না। বিরক্ত হয়ে সে 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান ও নেশন' দ্বিতীয়বার পড়তে শুরু করল। পত্রিকায় গৌতম নীলাম্বর নামক এক ভারতীয়ের একটা চিঠি, দেশ বিভাজন, যুদ্ধ ও শান্তি'র সমস্যার উল্লেখ করে ছাপা হয়েছে। সুরেখা আহ্‌জার বাড়ী গিয়ে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ত্রিল ব্যগ্র।

ত্রিল দ্বিতীয় লর্ড বার্নফিল্ডের কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতামহ প্রথম লর্ড ত্রিল ডেরিক এডবিন এশলে এই বংশের ভিত গড়েছিলেন। ত্রিলের প্রপিতামহ এক দরিদ্র পাদরীর সন্তান, অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ক্লার্কের চাকরি নিয়ে হিন্দুস্থান গিয়েছিলেন। সেখানে চাকরি করতে করতে নীলের ব্যবসা করে তিনি দু-হাতে টাকা রোজগার করলেন। মৃত্যুর আগে তিনি কোনো প্রান্তের হাকিমের পদ পেয়েছিলেন এবং তাঁর একমাত্র সন্তান বিলেতে রবারের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ব্যবসা করতে করতেই তিনি গ্রাম ও অট্টালিকা কিনেছিলেন, লর্ড উপাধি পেয়েছিলেন, পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি প্রথম লর্ড বার্ণফিল্ড। তার পত্র, দ্বিতীয় লর্ড বার্ণফিল্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।

তিনি সাম্রাজ্যের বিদেশ বিভাগে চাকরি করেছিলেন, তুর্কী ও আফগানদের শেষ করেছিলেন এবং হিন্দুস্থানের 'স্বাধীনতা আন্দোলনে'র বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়েছিলেন। তিনি মনে প্রাণে 'টোরী' ছিলেন তাই কালো মানুষদের বিশেষ করে অর্ধ সভ্য হিন্দুস্থানীদের ঘৃণা করতেন। তাঁর পিতামহ 'নবাব' গ্রিল এশলে নিশ্চয় অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি মোরগ লড়াই আয়োজন করতেন, ও গড়গড়া টানতেন। রয়েল একাডেমির শিল্পী জুফানী তাঁর একটি ছবি এঁকেছিল—বিরাট থামওয়ালা বারান্দায় আরাম চেয়ারে তিনি বসে আছেন। সেবক গড়গড়া সেজে এগিয়ে দিয়েছে। কালা এক নেটিভ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। ছবিটি 'মনোরে'র মধ্যেকার হলে টাঙ্গানো। দ্বিতীয় লর্ড বার্ণফিল্ড মহাযুদ্ধে জার্মানীর বোমায় নিহত হন। তাঁর দুই ছেলে। বড় জন তৃতীয় বার্ণফিল্ড ব্যবসা করছে—পারিবারিক সম্পত্তির সে মালিক। গ্রিল কনিষ্ঠ সন্তান।

বার্ণফিল্ড পরিবারে সে জৌলুস আর নেই। মালয়ের রবার জঙ্গল এখন প্রায় কমিউনিস্টের দখলে। কেনিয়ায় মাউ মাউ আন্দোলন চলছে। হিন্দুস্থান স্বাধীন হয়েছে। প্রতি রবিবার পূর্ব-পুরুষদের গড়া প্রাসাদ, বার্ণফিল্ড-হল, পাব্লিককে টিকিট বিক্রি করে দেখান হয়। প্রাসাদে এখনো প্রচুর বহুমূল্য প্রাচীন বস্তু এবং চারিদিকে শত-শত একর বাগান। লর্ড বার্ণফিল্ড ব্যবসা ও জমীদারীর ঝামেলা ও আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে সময়ের আগেই বুড়ো হয়ে গেছেন।

গ্রিল এ সব ঝামেলার মধ্যে নেই। কেম্ব্রিজে সে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র। সে ছোটছেলে তাই তাকে নিজেই নিজের জীবিকা অর্জন করতে হবে। রোজমারীকে বিয়ে করার পর বড়দা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন লেডী সিন্থিয়া'র সঙ্গে গ্রিলের বিয়ে দেবেন, গ্রিল একজন ডিউকের জামাই হবে, সমাজের উঁচু মহলের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকবে। ইংলণ্ডের য়্যারিস্টোক্রেসি'র সদস্যদের উচিত, এই সংকটের সময় এক অপরকে

সাহায্য করে, আরও কাছে আসে কিন্তু ছেলেটি বংশের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিল। মধ্যবিত্ত ঘরের এক সাধারণ মেয়ে রোজমারীকে সে বিয়ে করে বসল। প্রথমে তিনি ভাবলেন ছেলেটি কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। পরে বুঝতে পারলেন, রাজনীতি থেকে গ্রিল শত ক্রোশ দূরে। ঈশ্বরের কৃপায় সে শুধু দার্শনিকই। রোজমারী'-র সঙ্গে তার দেখা এক আর্টিস্ট সম্মেলনে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, তবে শিল্পী। শিল্পী হিসেবে খুব সফলতা অর্জন করেনি। গ্রিলের তাকে ভাল লেগে গেল। সে রোজমারীকে বিয়ে করে লণ্ডনে দাদা ও বৌদিকে ফোন করল। একেতো রোজমারী অখ্যাত ও দরিদ্র, তার ওপর সে রোমান ক্যাথলিক। লর্ড বার্ণফিল্ড রাগে ফেটে পড়লেন। গ্রিল বেপরোয়া। হেগেল ও কান্ট অধ্যয়ন ও রোজমারীকে নিয়ে সে দিন কাটাতে লাগল।

গ্রিল কেম্ব্রিজে পড়ছে তার বৌ স্ট্যাফোর্ডশায়ার চিনির কারখানায় চাকরি করে। হাতের আঙুলে বিয়ের আংটি দেখে সে অবাক হয়, কখনো কখনো। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় সে বিবাহিত। একটা বৌ আছে বাড়ীতে, আদরের বৌ। মাসে এক আধবার রোজমারী'র সঙ্গে তার দেখা হয়।

একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এক শিলিংগের টিকিট কেটে সে নিজেদেরই 'বার্ণফিল্ড হল' দেখতে গেল। দাদা-বৌদি দক্ষিণ ফ্রান্সে, হাউস কীপার ও অন্যান্য চাকর নূতন। গ্রিলকে চিনতে পারল না। সে চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখল আর ভাবল,—আশ্চর্য! আমার জন্ম এইখানেই !!

গ্রলের মহল এই বিরাট গ্রামের এক কোণায়। চার-পাঁচ শত বছর আগে গড়া। ফুলের বাগান, মাঝে মাঝে ইটালিয়ান শ্বেত পাথরের মূর্তি। 'রক গার্ডেন' ও ডাচ স্টাইলের বারান্দা। একদা সে টুইডের স্যুট পরে এখানে ঘুরে বেড়াত ও বেড়াতে-বেড়াতে মহলের পশ্চিম দিকে চলে যেত। যেখানে দ্বাদশ শতকের দুই সন্ন্যাসীর কবর ছিল। এখন কবর খালি, গর্তে ভর্তি জল জমে থাকে। কবরের পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য চিন্তা করত।

বাইরের লোকদের জন্য এই মহলের সঙ্গে অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে। কিন্তু ব্রিদের কাছে এ সবই অর্থহীন। এই ঐশ্বর্য তার কাছে হাস্যাস্পদ মনে হত। প্রপিতামহ 'নবাব' ব্রিল হার্বাড এশলের ছবি দেখে কোনো রোমান্টিক ভাবনা মনে এলনা বরং সে আরেকবার চিন্তা করতে বাধ্য হল—হাজার হাজার হিন্দুস্থানীর রক্ত চুষে তিনি এই প্রাচুর্য গড়ে তুলেছিলেন। সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ এ চিন্তা নয়; একজন সুফী প্রকৃতির মানুষ বলে এসব চিন্তা। সে যখন অপরিচিত দর্শকের মত এই অট্টালিকায় প্রবেশ করল, সে এক অদ্ভুত শান্তি ও সন্তোষ অনুভব করল। তার ভয় ছিল, অন্যান্য আধুনিক ইণ্ট্যালেকচুয়ালদের মত সে যেন রোমান ক্যাথলিক না হয়ে যায়। সে কোনো বিশেষ মতবাদে নিজেকে না জড়িয়ে স্বাধীন থাকতে চাইত। অস্তিত্ববাদের পূজারীদের স্বাধীনতার এই মনোভাবকে বিশেষ অর্থে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখানে পৌঁছে উপনিষদের অর্থও জানা যায়।

ব্রিল একালে প্রকৃত অর্থে আধুনিক। যুগের সমস্ত বেদনা, মানসিক অতৃপ্তি, আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির শিকার সে।

রোরিংগ টওয়েনটি তার ছোটবেলার যুগ। ৩· থেকে ৩৯-এর যুগে সে শিক্ষা লাভ করেছে। লণ্ডনে তার টাউন হাউসে প্রায় সব শিল্পীরাই তার সৎমা লেডী এলনের সঙ্গে দেখা করতে আসত। মা এই গোড়া পরিবারের সদস্যা হয়েও প্রায় সব আধুনিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতেন। সে যুগ বড় বিচিত্র যুগ—'ডেলী ওয়ার্কার' ও বাঁ হাত কর্মীদের যুগ। বুদ্ধিজীবীদের দল ফ্যাসিস্ট বিরোধী। ওডন, ডে·লুইস ও স্পেণ্ডরি প্রগতিশীলদের গুরু। ক্রিস্টফর উড, স্যাড্রিক মরিস ও বেন নিকলসনের পেন্টিংয়ের যুগ সেটা। কলা সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যালে, ইনটিরিয়ার ডেকোরেশন—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন চলছে। ওয়েনচেস্টার থেকে ব্রিলকে কেম্ব্রিজ পাঠান হল। সেখানে সে সিডনী·সসেক্স কলেজে ভর্তি হল। সেই থেকে লাগাতার মানসিক চিন্তা ও কল্পনার জগতে বিচরণ। কিন্তু যুদ্ধ বাধল ও বমবাজ পাইলটেরা অনেক সুন্দর

জার্মান নগর ধ্বংস করল। সেখানেই তার প্রিয় দার্শনিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞরা জন্ম গ্রহণ করেছিল।

সে কলেজে ফিরে এল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী। এশিয়ার মানচিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গতকালের শত্রু আজ মিত্র। গতকালের মিত্র আজ শত্রু। একদিকে শান্তির ধ্বনি উচ্চারিত, অন্যদিকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি। কাল যারা প্রগতিশীল বলে দাবী করত, আজ তারা প্রতিগামী। কোনো মূল্যে কোনো স্থিরতা নেই। সময় অমূলক। যুদ্ধের ভয়াবহতা ত্রিলকে বিচলিত করেছে। কেম নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে মানসিক ধোকার আবর্ত তাকে ঘিরে ফেলত। যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ ও মানুষের ভড়ং দেখে তার মনে নৈরাশ্য এসেছে। মাইকেল, এক ইহুদী যুবক ও ডেনিস তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাইকেলের মত ডেনিসও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কবিতা ডেনিসকে টানে।

এ ছাড়া অনেক কালো ও ইয়োরোপিয়ান ছেলে মেয়ে তার বন্ধু।

নিজের দেশের ছেলে-মেয়েরা ত্রিলকে আকৃষ্ট করত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের শব্দটি একটি ফ্রড ছাড়া আর কিছু নয়। যুগে পৃথিবী প্রবেশ করেছে। বিশ্বের নানা দিক থেকে প্রচুর কালো ছেলে-মেয়ে ইংলণ্ডে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসছে। সুন্দর ছেলে-মেয়ে।

রোজমারী একমাত্র স্বদেশী, যাকে ত্রিলের ভাল লাগল। সে তাকে বিয়ে করল।

নানা দেশ 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা' আয়োজন করত। এশিয়ার নানা দেশের ছেলেমেয়েরা শ্বেতকায় ছাত্রদের ডেকে এনে নিজের নিজের দেশের সংস্কৃতিকে প্রাচীনতম প্রমাণ করবার চেষ্টা করত। 'ওরিয়েন্টাল নৃত্য' কবিতা পাঠ ও বেসুরো যন্ত্রসঙ্গীত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার একটা অঙ্গ। সে শুনেছিল আমেরিকায় বিরাটভাবে এরকম র‍্যাকেট চালানো হয়। এসব তামাশা তার ভাল লাগত না। এসব সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা থেকে সে দূরে সরে থাকত। সে যখন শুনত, থাইল্যাণ্ড অথবা ইন্দোনেশিয়ার ছেলে-মেয়েরা কালচারাল ইভিনিংয়ের আয়োজন করছে, তার ইচ্ছে হত, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যায়।

"জান, গ্রিল এশিয়া থেকে নিজের সুরক্ষার উপায় খুঁজছে।" ডেনিস একদিন এই রহস্য উদ্ঘাটন করল।

একদিন গ্রিল শুনল, এক নূতন গ্রুপ কেম্ব্রিজ এসেছে। এরা ভারতীয় এবং লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে।

গ্রিল এদের সঙ্গে আলাপ করেনি যদিও সে শুনেছে এই ভারতীয় দলটি খুবই প্রগতিশীল।

এক উইক-এণ্ডে লণ্ডনে এক বন্ধুর সঙ্গে সে ইণ্ডিয়ান কালচারাল ইভিনিং-এ গেল। সম্ভবত ভারতীয়রা টেগোর জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছিল। সভায় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। জুতো খুলে, পা মুড়ে সবাই মাটিতে বসে। ডেনিস ধ্যানস্থ হল। প্যাণ্টের ক্রীজ নষ্ট হবার ভয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। পা মুড়ে মাটিতে সে বসতে পারল না। গ্রিল উদাসভাবে দেখল, অথচ অন্য ইংরেজরা নিঃসঙ্কোচে সাধুদের মত মাটিতে বসে আছে। এরা কে? সম্ভবত ব্রোকার্স. সে আলস্যের মধ্যে ডুবে চিন্তা করল।

রোগা একটি মেয়ে স্টেজে এল। তার ঘোষণায় সভায় প্রচণ্ড হাততালি। গ্রিল কিছুই বুঝতে পারল না। সারা হলে সেইরকম মেয়ে গিজ-গিজ করছে। এরা ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে কমরেড সুলভ মনোভাব নিয়ে কথা বলছিল।

এরকম মেয়েদের প্রতি গ্রিলের মনে আর কৌতূহল নেই। ইটালী ও ফ্রান্স এদের উপযুক্ত যায়গা। তাছাড়া টেগোরের প্রতি তার এমন কিছু আগ্রহ নেই—রোম্যান্টিক, মধ্যমবর্গীয় ভাবুক এক যোগী। (ইদানিং গ্রিল পশ্চিমী ক্রিশ্চান ও পশ্চিমী ইউরোপিয়ানদের প্রতি ঝুঁকেছিল।)

কালো শাড়ি পরে এক মোটা মহিলা স্টেজে এলেন। মহিলাটি অত্যন্ত মধুর সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে।

"ইনি কে জান?" ডেনিস সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে স্টেজের দিকে তাকাল।

"না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই। সম্ভবত ইনি হিন্দুস্থানী কালচারাল প্রতিনিধি—বলবেন, শংকরাচার্যই পারমাণবিক থিওরির জনক।

"ইনি মিসেস সুজাতা মুখার্জি।" ডেনিস রহস্যময় হাসি হাসল— "এখানে সাংবাদিকরা এঁকে সমীহ করে চলে। তুমি যদি 'অবজার-ভারের প্রতিনিধি হয়ে হিন্দুস্থান যেতে চাও, এঁর সঙ্গে দেখা কর।"

স্রিলের সামনে আজ জীবিকার সমস্যাও রয়েছে। শিক্ষা শেষ করে সে কি করবে? বি. বি. সি.? না। সেখানে আগে থেকেই তার মত অনেক ইংরেজ বুদ্ধিজীবী আছে। কোনো ফিল্ম কোম্পানীতে স্ক্রিপ্ট রাইটারের চাকরি নেবে। না, তাও না। ব্রিটিশ প্রযোজকরা আমেরিকান প্রযোজকদের সাহায্যে ছবি তৈরি করছে আজকাল। বিশুদ্ধ ব্রিটিশ নাগরিকদের মত সে আমেরিকানদের ঘৃণা করে। শিক্ষা বিভাগের চাকরি? না, কখনো না। সাংবাদিকতাই একমাত্র পথ, যে পথে সে সহজভাবে চলতে পারে। কিন্তু এ লাইনেও ভীষণ প্রতিযোগিতা।

প্রোগামের শেষে ডেনিস শ্রীমতী মুখার্জির কাছে গেল। তিনি অবজারভারের বিল ক্রেগের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

"হ্যালো ডেনিস।" তিনি হেসে বললেন।

"মিসেস মুখার্জি, আমাদের সবাইকে কফি খাওয়াবেন না?"

"নিশ্চয়। সবাই চলুন।"

একটি বেশ বড় গ্রুপ তাঁর সঙ্গে চলল। তাঁরা নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। দলটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত। এরা লণ্ডনে নিজেদের এক আলাদা পৃথিবী গড়ে তুলেছিল অর্থাৎ লণ্ডনে আরেকটি হিন্দুস্থানী লণ্ডন গড়ে তুলেছিল।

"চল-চল!" তারা হল্লা করতে করতে বেরিয়ে এল।

শ্রীমতী মুখার্জি চেলেসীর একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে থাকতেন। স্রিল সকলের সঙ্গে তাঁর বাড়ী ঢুকল। মেয়েরা অত্যন্ত সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলছিল। একজনের নাম তলঅত, একজন নির্মলা। তারা এই বছরেই কেম্ব্রিজে ভর্তি হয়েছে।

শ্রীমতী মুখার্জির বাড়ী পূর্ব বাঙলার ফরিদপুরে। অত্যন্ত কালচার্ড পরিবার। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে মানাতে পারলেন না। তিনি দেশত্যাগ করে অনেকদিন ধরে ইয়োরোপ ও লণ্ডনে বাস

করছেন। তাঁর ছেলে শিল্পী প্যারিসে থাকে।

দ্বিতীয়বার ত্রিল যখন লণ্ডন গেল শ্রীমতী মুখার্জির বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে পেল না। তিনি জেনেভা গিয়েছিলেন। ত্রিল তাঁর বাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে—এমন সময় একটি মেয়ে মিষ্টি হাসি হেসে বলল—"হ্যালো?"

তার মনে পড়ল, মেয়েটি রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন স্টেজে ঘোষকের কাজ করছিল।

চম্পার মনে পড়ল, ডেনিস তাকে বলেছিল, এই ছেলেটি কোনো লর্ড সন্তান। "আমিও মিসেস মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম কিন্তু তিনি জেনেভা গেছেন।"

"আপনি এখানে পড়েন?"

"আজ্ঞে না, আমি প্যারিসে থাকি। নির্মলা শ্রীবাস্তবকে চেনেন সে গর্টন কলেজে পড়ে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।"

"আর কামাল রজা?"

"সুরেখা দেবী তার কথা আমাকে বলেছিলেন। এখনো আলাপ হয় নি।"

পনের কুড়ি মিনিট 'আপনি অমুককে চেনেন', 'আপনি তমুককে চেনেন' ইত্যাদি কথায় কেটে গেল।

"আপনি নারগিস কাবাজকে চেনেন?" চম্পা উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল।

"আজ্ঞে না, আমার পরিচিতদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ডেনিসের মত বিশাল নয়।"

চম্পা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসল। "আশাকরি ইয়াংগ আশুতোষকে আপনি চেনেন।"

চেলেসীর আণ্ডার গ্রাউণ্ড এসে গেছে।

"আচ্ছা আবার দেখা হবে, আপনি যদি কখনো কেম্ব্রিজে আসেন।"

"গুডবাই!" সে তাড়াতাড়ি চলতে-চলতে এস্‌কেলেটারে নেবে গেল।

…পিকাডিলি'র আণ্ডার গ্রাউণ্ডে আধঘণ্টা ধরে সে চম্পার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে! গত দুবছরে কয়েকবার চম্পার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। আজ চম্পা খবর পাঠিয়েছে, সে প্যারিস থেকে লণ্ডন আসছে—তারা সবাই সুরেখার বাড়ীতে জমিয়ে আড্ডা মারবে। গৌতমের চিঠি নিয়ে সে সুরেখার স্বামী গুলশনের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। পত্রলেখক গৌতম লিখেছে ভারত বিভাগের সব দায় দায়িত্ব ইংরেজদের। সুরেখা বলেছিল, গৌতম নীলাম্বর অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ। আজ সন্ধ্যেবেলা স্রিল গৌতমের দেখা পাবে না, কেননা সুরেখা জানিয়েছিল, গৌতম আজ লণ্ডনের বাইরে।

স্রিল 'ইণ্টারনেশনল টাইমের'র নীচে পায়চারি করছে।

আটত্রিশ

কেম্ব্রিজে দোকান থেকে বেরিয়ে নির্মলা ফ্রিট্জ-উইলিয়ম—লাইব্রেরীর দিকে চলেছিল. পথে গৌতম নীলাম্বরের সঙ্গে দেখা।

"নির্মলা, তোমাকে কোথায় কোথায় খুঁজেছি।" গৌতম তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এল—"কামাল বলল, তুমি সম্ভবত লাইব্রেরীতে আছ। খবর কি নির্মলা?" নির্মলার চোখ আপনা আপনিই বুঝে এল। গৌতম তার সামনে দাঁড়িয়ে।

"তুমি এখানে কোথায়?"

"লণ্ডন থেকে এসেছি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।"

"শুনেছি তুমি আজকাল ফরেন সার্ভিসে?"

"ঠিকই শুনেছ।"

"ভাল আছ?"

"ভাল আছি।"

গৌতম লক্ষ্য করল, নির্মলা যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছে।

"লাইব্রেরী বাদ দাও। কামাল ও জলঅত বলেছে, কোহিনুরে দেখা করবে।"

নির্মলা তার সঙ্গে চলেছে। কালো গাউন পরা ছাত্রদের দল তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। নির্মলা একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলল এই দিককার ছেলেটি ব্রণ্ড, সেই গ্রিল মজাদার লোক। ইনিও চম্পার শিষ্য আজকাল।"

"আ-চ-চ্ছা? চম্পার সঙ্গে দেখা হয় তোমাদের?"

"প্রায়ই।"

"আনন্দে আছে সে?"

"কি জানি—আনন্দ বড় রিলেটিভ বস্তু।"

গৌতম কথা বলল না। তারা কিংগ কলেজের সামনে দিয়ে চলেছে। হাল্কা বৃষ্টি পড়ছে।

"আমার মনে হয়, নির্মলা বলছিল, কয়েক বছর পর চম্পাবাঈ মিসেস মুখার্জী হয়ে যাবেন। বড় দুঃখের কথা। মিসেস মুখার্জীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"সময় আঘাত হেনে চুপচাপ সরে পড়ে। বড়ই দুঃখের ব্যাপার!" নির্মলা দ্বিতীয়বার দুঃখের কথা বলল। গৌতম এখনো নিরুত্তর।

"সুজাতা দেবী আজ থেকে পনের-কুড়ি বছর আগে কি প্রভাবান্বিত ছিলেন নিশ্চয়ই অনুমান করতে পার। দু-চারটে কথা বলবার জন্য হয়ত লোকেরা তাঁকে ঘিরে থাকত। আর আজকাল? নিজের ছেলের বয়সী ছেলেদের ডেকে ডেকে বাড়ী নিয়ে যান, কফি খাওয়ান। বই লেখেন, ফ্লীট স্ট্রীটে সবাই তাঁকে চেনে। বল তো, তাঁর নাম, জনপ্রিয়তা তাঁকে কি আনন্দ দেয়? তিনি এসব পেয়েই কি খুশী? চম্পাবাঈও এরকম হয়ে যাবেন। সময় তাঁর ওপর আঘাত হেনেছে। তিনি অন্যকে দুঃখ দিতে চান।"

গৌতম অবাক হয়ে নির্মলাকে দেখল।

তার চোখে বর্ষার একটি বিন্দু জল পড়ল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সে বলল—

"এখন ত্রিল তাঁর প্রিয় কেননা সে লর্ড এশলের সুপুত্র, ঠিক যে ভাবে তুমি স্যার দীপনারায়ণের ও ভাইয়া সাহেব, স্যার জকী রজা বাহাদুরের সুপুত্র।

"নির্মলা, চম্পার প্রতি তুমি অন্যায় করছ।" গৌতম বলল।

"না গৌতম, চম্পাবাজী নিজে দুঃখ পেয়েছেন, আমাদেরও দুঃখ দিয়েছেন। কাল কামাল বলছিল, চম্পাবাজীর ম্যাজিক শেষ হয়ে গেছে। তলঅত তার উত্তরে বলল—চম্পাবাজী যেখানে ছিলেন, সেখানেই আছেন। আমরা বড় হয়েছি।"

গৌতম উদাস হয়ে তাকে দেখল। নির্মলা বলে চলেছে—

"প্যারিসে ছিলেন। কাজ ফেলে ব্রিটেন চলে এলেন। এখন শুনেছি লণ্ডনে চাকরি পেয়েছেন ও এখানে ভর্তি হবেন। আশ্চর্য, নিজের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। গৌতম চম্পা সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো সেন্টিমেণ্টাল সাহচর্যের প্রয়োজন।

জজেস লেনে ট্রাম্পেটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গৌতম দাঁড়িয়ে পড়ল।

"জানিনা কে। প্রায়ই বড় করুণ সুর বাজায়।" নির্মলা বলল। "ভাইয়া সাহেব, আজকাল লণ্ডনে। পাকিস্থান হাউসে ডিপ্লোম্যাট, তাই আমাদের সঙ্গে দেখা করেন না।"

তারা 'কোহিনুর' পৌঁছেছে।

"গৌতম!" নির্মলা ভাবতে ভাবতে বলল—"লোকেরা এত বাজে হয় কেন?"

গৌতম নিরুত্তর। পথের ধারে অসংখ্য হলুদ ফুল ফুটেছে। বর্ষার ধারা কোমর জলের উপর পড়ছে—যেন জলতরঙ্গ বাজছে।

"নির্মলা!" গৌতম থেমে থেমে উচ্চারণ করল।

"আদেশ হোক!"

"আমাকে বিয়ে করবে?"

"কক্ষনো না।"

"কেন নির্মলা?" তার স্বর কাঁপল।

"এই জন্য যে…" নির্মলা নিঃসংকোচে বলল—তুমি অত্যন্ত বাজে লোক। এস, ভেতরে যাই। বর্ষায় ভিজে যাবে।

নির্মলা সত্যিই বড় হয়ে গেছে।

তারা একটা রেঁস্তোরায় প্রবেশ করল।

উনচাল্লিশ

ভোর ছটায় চম্পার ঘুম ভাঙল। গত রাত্রে দুটো পর্যন্ত সুরেখার বাড়ীতে আড্ডা মেরেছে। বাথরুম থেকে জোনকার্টির চেঁচাল—"আজ তোমার চাকরির প্রথম দিন। তাড়াতাড়ি তৈরি হও।" আমি ওয়ার্কিং ক্লাসের মেয়ে, কি শাড়ী পরব বল। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে, বাস ধরে সে সেন্ট জাজ উড পৌঁছল। বিল ক্রেগের বাড়ী কলিং বেল বাজাতে ভেতর থেকে কেউ "কাম ইন" বলল। ঘরে ফায়ার প্লেসের সামনে একটা চেয়ারে বিল আধশোয়া অবস্থায় কিছু পড়ছে। পাশে এক য়্যালশেশিয়ান বসে আছে। "হ্যালো মাইডিয়ার, কি পান করবে?"

"কিছু না, ধন্যবাদ।" চম্পা বলল।

"প্রুফ পড়তে পার?" বিল বেপরোয়া ভাবে কাগজের একটা বাণ্ডিল তার দিকে এগিয়ে দিল তারপর রান্নাঘরে ঢুকে এটা ওটা নাড়তে লাগল।

শান্তা ক্রেগ রেশমী শাড়ী পরে, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে নীচে নামল। চম্পা লক্ষ্য করল—শা[illegible] সুন্দরী। সে বুঝতে পারে না, বিবাহ বিচ্ছেদের পর, গৌতমকে [illegible]য়ে না করে সে বিল ক্রেগকে বিয়ে করল কেন! আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে জীবনে।…গুড্ মর্নিং মিসেস্ ক্রেগ!" চম্পা ভদ্রভাবে অভিবাদন জানাল।

"গৌতম তোমার বিষয়ে অনেক কিছু বলেছে। পৃথিবীটা বড্ড ছোট।" শান্তা টাইপ করতে করতে বলল। বিল কফি-ট্রে উঠিয়ে আনল। চম্পা লক্ষ্য করল, বিল যত বিনম্র, শান্তা ততোই দাম্ভিক।

"ফ্র্যাংক রাসও তোমাকে পছন্দ করে।" সে চম্পাকে জানাল।

"ফ্র্যাংকরাস?" চম্পার প্রশ্ন।

বিল ইঙ্গিতে য়্যালেশিয়ানকে দেখিয়ে দিল। তার পর কাগজের বাণ্ডিল উঠিয়ে প্রেসে চলল। বিলের পাব্লিশিং হাউসে প্রুফ রীডার হিসেবে আজ চম্পার চাকরির প্রথম দিন।

"তোমার জীবনের প্রোগ্রাম কি?"

লাঞ্চ ব্রেকে বিল চম্পাকে জিজ্ঞেস করল। সে মানুষের প্রুফও পড়ত।

"বড় কঠিন প্রশ্ন।"

তুমি কনফিউজ্‌ড?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে জালে তুমিও জড়িয়ে পড়েছ?"

"হ্যাঁ।"

বিলের মুখে কোনো কথা নেই। সবাই জড়িয়ে পড়েছে। সে, তার স্ত্রী শান্তা, যে একদা শান্তা নীলাম্বর ছিল ও ইংরিজি ও মারাঠী ভাষায় উপন্যাস লিখত; ত্রিল এশলে, অন্যান্য লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধি-জীবী; পশ্চিমের মানুষ, সমাজ, সভ্যতা এবং 'নব-এশিয়া'র প্রতি-নিধিরা, সবাই ভিন্ন ভিন্ন নরকের মাঝখানে ঝুলছে। এখন তারা জানতে পারল 'পুল সরাতে'র উপর দিয়ে চলার অর্থ কি? ক্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমানদের কপালে আরও কষ্ট লেখা আছে। এরা তারা যাদের নিয়ে টয়েনবী দশটি গ্রন্থ লিখেছেন অথচ এখনো কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি।

নূতন হিন্দুস্থান আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও সাংস্কৃতিক উচ্চতা প্রচার করে চলেছে। এটা প্রচারের যুগ। তারা পত্র-পত্রিকা পুস্তক ও প্যাম্‌প্লেটের সাহায্য নিচ্ছে—কাটা-কাটা শব্দের সাহায্য নিচ্ছে। বিল শব্দ নিয়েই কারবার করে। শব্দের ক্ষমতা ও অক্ষমতা সে জানে। তবু সে চম্পার মতই জড়িয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের ধাঁধা ব্যক্তি-গত জগৎ পীড়াদায়ক কেন না মানুষ জানেনা—কি করে এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরোনো যায়।

একটা পথ ছিল কিন্তু এ পথ বড়ই কঠিন। বিল চম্পাকে দেখল "তুমি কখনো কমিউনিস্ট হও নি?"

চম্পা চুপচাপ আলু খেয়ে চলেছে।

"তুমি গল্প লেখ। আমি তোমাকে 'বিল্ড আপ' করব। হিন্দুস্থানী পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসের প্রচুর স্কোপ। আর. কে. নারায়ণ ও মুল্করাজ আনন্দকে দেখ। তুমিও লেখ, বুঝলে!"

"আমি লিখতে পারি না।"

"অসম্ভব। তোমার গ্রুপে কত লেখক!"

"আমাকে আমার গ্রুপের মত ভেবো না।"

"আচ্ছা, তাহলে আপনারও একটা ফ্যাড আছে - আপনি ইনডিভিজুয়ালিষ্ট!" বিলের উত্তর।

এই হোটেলে তুপুরবেলা অনেকে লাঞ্চ সারতে আসে। কাছেই বি. বি. সি. স্টুডিয়ো। কয়েকজন হিন্দুস্থানী মেয়ে তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।

"এই মেয়েটি চম্পা আহ্‌মদ। অন্যের ফিয়াঁসে ফাসানো—এঁর কাজ। তুমি যদি মনে কর আমি স্ক্যাণ্ডেল ছড়াচ্ছি, তাহলে নির্মলা শ্রীবাস্তবকে জিজ্ঞেস কর, তার টি. বি. হয়েছে—"একটি মেয়ে কাউন্টারের উপর থেকে ট্রে উঠিয়ে উর্দু ভাষায় বলল।

"নির্মলার টি. বি. হয়ে গেছে?" দ্বিতীয় মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। সে লিডহর্স্ট স্যানাটোরিয়াম যাবে। প্রথম জন উত্তর দিল তারপর দুজনে কামরার অন্য দিকে চলে গেল।

চম্পা যেন জ্ঞান ফিরে পেল। ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—নির্মলা কেমন আছে? তার টি. বি. কি করে হল? কিন্তু সে চুপচাপ বসে রইল। জানালার বাইরে জনসমুদ্র। তার চোখের সামনে দিয়ে অনেকগুলো শ্বেত মুখোশ চলে গেল। মুখোশের উপরে লেখা আছে—জবীনা হুসিন, সুরেখা আহুজা, অমলা রায়, ফিরোজ জবীন। আমীর রজা এলেন। চম্পার সঙ্গে আজ এত বছর পর আমীর রজার দেখা। তিনি সেই রকমই আছেন শুধু তাঁর স্যুট

আরও দামী এবং তাঁর পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তিনিও চম্পাকে দেখলেন। ঝুঁকে আদাব অর্জ করলেন ও অন্য দিকের টেবিলে গিয়ে বসলেন।

চম্পা ঘড়ি দেখল, ব্যাগ কুড়িয়ে বিল ক্রেগের সঙ্গে আবার অফিস রওনা হল।

চল্লিশ

কেম্বি জ পড়া শেষ করে তলঅত ফ্লীট ষ্ট্রীটের একটা সংবাদপত্রে চাকরি নিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় 'কপি' নীচে পাঠাবার পর সে ভিক্টোরিয়ার দিকে বেড়াতে গেল। এখানে এক আর্ট স্কুলে সে বিমূর্ত কলা শিখত। সে অন্ধকার, সেঁতসেঁতে কামরায় ঘুরে বেড়ালো। লাইফ ক্লাশে এক ছাত্র এক নগ্ন নিগ্রো মেয়েকে দেখে দেখে অত্যন্ত বোর হয়ে হাজেলে আঁক কাটছিল। উপরে পোট্রেট ক্লাসে এক বুড়ো ভিখিরি হাতে বিয়ারের মগ নিয়ে স্টুলে বসে ছিল। কেউ হাসছে না। দক্ষিণ আফ্রিকার লাল দাড়িওয়ালা আর্টিস্ট একটা ঘরে মেঝেতে বসে বসে ম্যাণ্ডোলিনের তারে ঝংকার তুলছিল। তলঅতকে দেখেই সে রেগে যেত। রেগে সেই আর্টিস্ট তলঅতকে অভিবাদন জানাল। তলঅত হেসে তাকেও অভিবাদন জানাল।

এও এক অন্য জগৎ। ভিক্টোরিয়ার পুরোনো আর্ট স্কুল···

সে ওয়েস্ট এণ্ড পৌঁছল। হে মার্কেটের ওপরে গিয়ে সে 'রাইটার্স এণ্ড আর্টিস্ট ক্লাবে' ঢুঁ মারল। বিল ক্রেগ এক গেলাস বিয়ার নিয়ে বসে আছে, মনে হয় বিয়ারের গেলাসে সে সব দুঃখ বেদনা ডুবিয়ে দিতে চায়। এক ফরাসী লেখিকা সহানুভূতির সঙ্গে তার কথা শুনছিল। মহিলা-লেখিকার চেহারায় প্রীতি ও সদভাব। স্বভাবতই, সে বলছে শর্মিলা তাকে বুঝতে পারে না। এও এক জগৎ হে

মার্কেটের রাইটার্স এণ্ড আর্টিস্ট ক্লাব। সে আবার তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল, পথে নামল।

তলঅত ও কামাল সেণ্ট জন্স উডে থাকে, কামাল এখন এক ল্যাবরেটরীতে চাকরি করে। সেণ্ট জন্স উডে আর্টিস্ট, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাধিক্য। ছায়াঘন রাস্তার পাশে কয়েকটা পুরোনো গির্জা। কোণায় একটি ইটালিয়ান রেঁস্তোরা সেখানে প্রায়ই এক পোলিশ ইহুদী আর্টিস্ট বসে থাকে। লাঞ্চ অথবা ডিনার খেতে আসা লোকদের সে স্কেচ আঁকত ও আশা করত কেউ স্কেচ কিনবে কিন্তু কেউ তার স্কেচ কিনত না। সেণ্ট জন্স উডের ছবির মত সুন্দর ঘরের বাসিন্দাদের জীবন ঝোড়ো হাওয়ার মত। ভালবাসা বিবাহ-বিচ্ছেদ, মানসিক অশান্তি ও ব্ল্যাক কফি এদের জীবনের মূলমন্ত্র। এদের কামরাও সুন্দরভাবে সাজানো। মেয়েরা সব প্যাণ্ট পরত, পনি টেল স্টাইলে চুল বাঁধত, কানে জিপসি রিং পরত ও মা-বাবাদের ঘৃণা করত। কখনো বা মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতো। কয়েকজন সতের-আঠারো বছরের যুবক ও যুবতী সেক্স ও মর্বিডিটি নিয়ে উপন্যাস লিখছিল। অনেক বুদ্ধিবাদী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রাচীন এশিয় ও বাইজন্তিয়ম সংস্কৃতি, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম, বেদান্ত ও জৈন-বুদ্ধ মতামত নিয়ে, চোখ বুজে আলোচনা চালিয়ে যেত। সবাই তর্ক ও বিবেকের হাতে দুঃখ পাবার জন্য প্রস্তুত।

সুরেখা রাস্তার ওপারে থাকে। তার স্বামী গুলশন আহুজা লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের ছাত্র। সুরেখা ভারতনাট্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে ও রয়েল একাডেমি অফ ড্র্যামাটিক আর্টে কোরিয়োগ্রাফী শিখছে। চোপড়া দম্পত্তি, সুরেখা ও গুলশনের প্রতিবেশী। আশা চোপড়া মূর্তি বানায়। সতীশ চোপড়া বি. বি. সি.'র হিন্দী সেকশনে কাজ করে। শান্তা ও বিলিয়াম ক্রেগ এখানেই থাকে।

অমলা রায় ও নারগীশ কাউসজী চেলসীর এক আধুনিক ও দামী ব্লকে থাকে। অমলা রায়, তলঅত ও নির্মলার ছোটবেলার বন্ধু, তার

বাড়ী গুলফিসাঁ ও সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিরের কাছেই। অর্থাৎ তারও বাড়ী লক্ষ্ণৌ। অমলা রায় এখন ইণ্ডিয়ান-ফরেন সার্ভিসে। ফিরোজ সুইস কটেজে থাকত ও উর্দু ভাষায় পি· এচ· ডি· করছিল। জারীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশী, ফরাসী ও উর্দু ভাষায় বি· এ· অনার্স করছিল।

এদের ব্যস্ত জীবন। কনফারেন্স, ড্রামা, রাজনৈতিক জলসা ও মিছিলে ভরপুর।

এও এক জগৎ—ইন্দো-পাকিস্থানী লণ্ডন। এই লণ্ডন, য়্যাংলো স্যাকসন রাজধানীর ভেতরে এই রকম অনেক ছোট-ছোট জগৎ, এক বিশাল জগতে লুকিয়ে ছিল যেন।

কৃত্রিম নগরী…

একচল্লিশ

চম্পা নারগীশের কামরায় এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। "আমাকে একটা শাড়ী দাও তো।" নারগীশ বাথরুম থেকে ডাক দিল। অন্য কামরায় শাস্তা একই রেকর্ড বার-বার বাজিয়ে চলেছে। সেই দিনই তার নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। বিল কোর্ট ইয়ার্ডে গুলশনের সঙ্গে বেড়াচ্ছে। চম্পা আলমারী খুলে বার করলো ইভনিং গাউন, শাড়ী, জুতো ও ব্যাগ। একধারে হাতীর দাঁতের ছোট্ট মন্দির, মন্দিরের ভেতরে ছোট্ট একটি মূর্তি। পারসীরা মূর্তি পুজো করে? সম্ভবত জরথুস্ত্র…অথবা অন্য কিছু।

আমাদের মনের সবচেয়ে নীচের স্তরে একটা না একটা অজানা মূর্তি রাখা। সেই মূর্তির নাম আমি জানিনা—ঈসা, কৃষ্ণ, জরথুস্ত্র। এই মূর্তি শেষ সময় পর্যন্ত অনামী থাকবে। শেষ সময় যখন মানুষের চোখ শেষ বারের মত বন্ধ হয়, সেই সময় কি জানি, সে কি দেখে। এই অনামী মূর্তি কি রূপ ধারণ করছে, কে জানে?

শাস্তা নারগীশের জন্য একটা শাড়ী বের করল। "আলমারী বন্ধ করে দাও, আলমারী বন্ধ করে দাও!" চম্পা প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

"হ্যাঁ···?" শান্তা পুনরায় কামরায় এসে জিজ্ঞেস করল—"কাকে বলছ?"

"কিছু না, ভাবছিলাম দিনে কতবার শান্তা এই আলমারী খোলে।"

"হ্যাঁ···?" শান্তা কিছুই বুঝতে পারল না "এবং আলমারী থেকে রঙ-বে-রঙের কাপড় সে বের করে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ···তো?"

"ঈশ্বর আলমারী বানিয়েছেন এখন তিনিই আলমারীতে বন্দী।" চম্পা বলল—"তোমার আলমারীতে কোনো মূর্তি আছে?"

"আমার আলমারীতে আকৃতি আছে।" শান্তা চম্পাকে লক্ষ্য করল—"তুমি একটু পাগল আছ।"

"হ্যাঁ, তুমি নও?"

"তোমার কথাবার্তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের সীমা ছুঁতে চলেছে। ওদিকে যেওনা, কষ্ট পাবে।" শান্তার উত্তর।

শ্বেত শাড়ী পরে, চুলে তোয়ালে লেপ্টে সুরেখা বাইরে এল। সে জানালা দিয়ে টেরাস গার্ডেন দেখতে লাগল।

"জীবন! জীবন!" সুরেখা খুশী হয়ে ভরপুর নিঃশ্বাস নিল এবং শূন্যে, দুই বাহু প্রসারিত করল।

"সুরেখা, আমার কাছে জীবনের স্বরূপ, সংকেত। সংকেত রহস্যময়, তুমি বিশ্বাস কর?" চম্পা, শান্তাকে জিজ্ঞেস করল।

"জীবন আমার সামনে শ্বেত শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছে।···হাসছে, গাইছে গুনগুন করে নির্ভিক, সাহসী—দুর্বল···জীবন···" প্রত্যেক শব্দের বিপরীত দুটি অর্থ। সে শান্তাকে দেখল। আমি একবার গৌতমকে বলেছিলাম—"আমি ও তুমি সদা-সর্বদা পৃথক থাকব।"

"গৌতম এখনো সার্কুলেশনে আছে?" শান্তা উঁচু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"কি?" সে অবাক হল।

"অর্থাৎ" শান্তা একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে এমন ভাবে বলল, যেন চম্পা কোনো খোলা বইয়ের পাতা। কয়েক মিনিট ধরে শান্তা সেই বই পড়ছে—"সে এখনো সার্কুলেশনে আছে না লাইব্রেরীর

বুকশেল্ফে তাকে উঠিয়ে রাখা হয়েছে ?"

"জানিনা।"

"তোমার মেম্বারশিপের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ?"

শান্তা ক্রেগ দাম্ভিক, আর অভদ্রও।

"তোমাকেও এই একই প্রশ্ন করতে পারি।"

শান্তা উদাস হাসি হাসল। শান্তা সুন্দরী। জীবনে সফল। লোকপ্রিয়, কেরিয়ারিস্ট। সেও শান্তা নীলাম্বরের মত হতে পারে না ? শান্তা তাকে দেখল—"আমি তার ইলুশন মেটাতে চেয়েছিলাম। ঝামেলা এই যে সে কবি।"

"সত্যিই, আমি জানতাম না।" চম্পার কথায় ব্যঙ্গ।

"জানা তোমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের খেয়াল-খুশীর জগৎ নিয়ে তুমি মেতে আছ। মানুষ ত্যাগ চায়। ত্যাগ না করে মানুষকে পাওয়া যায় না। লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে তুমি প্যারিস ছেড়ে এখানে এলে কেন ? এই জন্য যে সে এখানে আছে ?"

"বাজে কথা রাখ ! কে তোমাকে এসব বলেছে ?" চম্পা প্রচণ্ড রেগে গেল। আর অপমান সহ্য করা যায় না।

"একে জঙ্গলী হাঁসের পেছনে দৌড়ান বলা যেতে পারে।"

শান্তার সুরেলা কণ্ঠস্বর।

"তুমি গল্প লেখিকা তাই প্রায় সব ব্যাপারেই কল্পনার আশ্রয় নাও।" চম্পা বলল।

"এখন বিল তোমাকে বিল্ড-আপ করতে চায়।" শান্তা কথা শেষ করে ছবি দেখতে লাগল।

তহমীনা রজা, নির্মলা শ্রীবাস্তব, শান্তা ক্রেগ।

"এই ব্যাপার।" চম্পা নিজের কোট ও হাত মোজা তুলল... "আমাকে ঘৃণা করা উচিত, আমাকে ঘৃণা করা উচিত !—আচ্ছা ভাই, এবার যাই। নারগীশ, সুরেখা, শান্তা! কাল সম্ভবত অফিস আসব না।" দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে ঘুরে বলল, "কাল কেন, আমি সম্ভবত আর কখনো আসব না—গুড্ নাইট !"

বাইরে চেলসীর পথে হাল্কা বৃষ্টি, কুয়াশা। কোণার ফুলওয়ালী

ওভারকোট গায়ে দিয়ে দরজার দিকে মুখ করে কি যেন ভাবছে। দুই পাশে ঝাপসা ঝাপসা ঘরবাড়ী। বহুদূর, উপনগরে তার বাড়ী। বাড়ী পৌঁছে সে দরজায় ব্রিলের চিঠি পেল। লেখা ছিল—"নিউহ্যামে তোমার এডমিশন হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরে তুমি এখানে আসছ। গ্রীষ্মের কয়েকমাস কোনো উদাস ইটালিয়ান অথবা স্প্যানিশ শহরে কাটিয়ে এস। আমি উত্তর দিকে চললাম। রোজমারী অসুস্থ।

···রোজমারী ? ?

বিয়াল্লিশ

কোহিনুরের জানালার ধারে একটা টেবিলে গৌতম ও নির্মলা বসে বসে বৃষ্টি দেখছে। কামাল 'ক্ষমা কর' বলে কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গেল।

"চম্পার বিষয়ে তুমি যা শোনালে—আমার মন খারাপ হয়ে গেল।" গৌতম বলল। সে এখনো চম্পার কথা ভাবছে। নির্মলা নিভৃতে চোখের জল মুছল। কয়েক মিনিট আগেই এই লোকটি তাকে প্রোপোজ করেছে। নির্মলা চুপচাপ বসে ছিল।

তোমরা সবাই, আমরা সবাই তার প্রতি অন্যায় করেছি। বরাবর আমরা তাকে ভুল বুঝেছি। অর্থাৎ—গৌতম একটা কাঁটা উঠিয়ে নির্মলাকে বোঝাতে শুরু করল—চম্পা কখনো ভাইয়া সাহেবকে আপ্পীর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়নি।"

"যাইহোক, এটা আমার নিজস্ব মতামত। তাছাড়া চম্পাবাজীকে নিয়ে আমরা আর আলোচনা করব না।" নির্মলা নিজেকে ব্যস্ত প্রমাণিত করবার জন্য ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। "তোমার চোখে চম্পাবাজী পারফেক্ট। আমরা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই জানি।"

"তোমরা সব সময় ছোটবেলার কথা টেনে আন কেন? যারা তোমাকে বা চম্পা আহমদকে ছোটবেলায় দেখেনি—তারা কি গর্দভ?" গৌতমের চারিদিকে প্রখর আলো। সে নিজেও সেই আলোয় দাঁড়িয়ে, গৌতমের সামনে। কিন্তু দেখ, হঠাৎ কি হল, গৌতম হাত বাড়িয়ে সুইচ অফ করে দিল। গৌতম, মানব চরিত্রের গভীরে পৌঁছতে উৎসুক, তাই চম্পার মত ফ্রেগুকেও পারফেক্ট মনে করে। হে ঈশ্বর তোমার অপরূপ লীলা—নির্মলা ভাবল। কিন্তু গৌতম বলছিল "নির্মলা, তোমার ধারণা ভুল···যাক্ চম্পার কথা যাক। তুমি বলেছ—আমি বাজে লোক কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"চম্পার বদলে নির্মলাকে চাও? না, সরি, গৌতম।"

"নির্মলা···আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর। ও নির্মলা···! স্কুলের ছাত্রদের মত দরদী। কে বলে পুরুষমানুষ বুদ্ধিমান। আরে, তাদের চেয়ে মূর্খ কে? নির্মলা অনুভব করছে, সে বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে—গাছের মত, লতাপাতার মত···ব্যারোমিটারের পারার মত সে উঠেই যাচ্ছে···। তার মধ্যে জ্ঞানের সমাবেশ ঘটছে। নকল আলোর আর প্রয়োজন নেই। আলো নিভিয়ে সে অন্ধকারে চলে যাবে, অন্ধকার যা সমস্ত অনুভূতির চেয়ে উত্তম। সেখানে বসে সে বাইরে তাকাবে। এবার থেকে সে সুলেমানী টুপী পরবে, যার গল্প ছোটবেলায় কদীর ড্রাইভারের কাছে সে শুনেছে।

গৌতম নীলাম্বর, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ! বড় হতে তুমি আমায় সাহায্য করেছ। সুলেমানী টুপী প্রত্যেকে পায়না। আমি পেয়েছি। সুলেমানী টুপী পরার পথ তুমিই আমাকে দেখিয়েছ। হায়, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম। কি করি, আজ তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান বেশী। চম্পা আহমদকে পুজো করে যাও গৌতমজী। সম্ভবত এটাই তোমার মুক্তির পথ।

সেই রাতেই নির্মলা জানতে পারল, এক্সরে রিপোর্টে বলা হয়েছে, সে যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা।

তেতাল্লিশ

চম্পা যে বছর কেম্ব্রিজ পৌঁছল, তলঅত ও নির্মলা সেই বছর কেম্ব্রিজ ছেড়েছে। আজকাল চম্পার কথাবার্তা উঁচু মহল ইংরেজদের মত। কেম্ব্রিজের মেকী জীবনের সঙ্গে সে এখন একাত্ম। রাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবত—সেই চম্পা আহমদ কোথায় গেল? সেই চম্পামালা এখন হিতোপদেশের কাহিনী। বেনারসের বসন্ত কলেজের ছাত্রী অথবা সেই মেয়েটি যাকে আমীর রজা প্রথমবার 'গুলফিশাঁ'য় সাইডরুমে আলু কাটতে দেখেছিল? আমীর রজার কথা মনে পড়তেই তার হাসি পায়।

কোনো ছুটির দিন অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চম্পা এক দেহাতী চায়ের দোকানের বাগানে বসে ছিল। একজন ইটালিয়ান ছাত্র এঞ্জেলো গিটার বাজিয়ে চলেছে। পাশের চেয়ারে মাইকেল বসে বসে উদাসভাবে আপেলের ফুল শুঁকছিল। মাইকেল ঘোষণা করল—সে ব্রিটেন ত্যাগ করে ইস্রায়েল যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে ক্লান্ত হয়ে চায়ের অপেক্ষায় বসে আছে। "আমি এই সবুজ, ছবির মত সুন্দর ব্রিটেন ত্যাগ করে ইস্রাইলের মরুভূমিতে পাথর কেটে কেটে সড়ক বানাবো।" সে বলল। ত্রিল তাকে দেখে বলল—"হ্যাঁ মাইকেল, তুমি এ কাজ নিশ্চয় করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ইহুদী প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ আজকাল ইস্রাইলে পাথর কেটে কেটে সড়ক তৈরি করছেন।"

"ভিজন অত্যন্ত শক্তিশালী।" ডেনিস বলল।

"শক্তিই ধ্বংসের কারণ।" ত্রিল গম্ভীরভাবে বলল। চায়ের দোকানের ফটকে একটা মোটরগাড়ী এসে দাঁড়াল। গৌতম, নীলাম্বর, কামাল, তলঅত ও আরও কিছু লোক চায়ের দোকানের

দিকে এগিয়ে গেল। অর্চার্ডে যারা বসে ছিল, এরা তাদের দেখতে পেল না।

"নূতন চিন্তাধারার মধ্যে শোভনিজম অত্যন্ত বিপদজ্জনক।" ত্রিল মাইকেলকে বলল—"তোমার চাইনিজম, পাকিস্থানীদের ইস্‌লাম, ভারতে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুত্থান।"

"আর্থিক উন্নতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কোথায়? পাকিস্থানীরা এ কথা কিছুতেই বুঝতে পারে না।" গুলশন বলল।

"ঘৃণার সায়কোলজি," ডেনিস বলতে আরম্ভ করল— "আজকের পৃথিবীর পুঁজি—ঘৃণা। যীশু ভুল বলেছিলেন, সংসারের আধার প্রেম। আসল কথা হল, আমরা সবাই হিংস্র পশুর মত একে অপরকে শেষ করতে চাই।"

"আমি বন্য পশু?" মাইকেল উদাস হয়ে বলল—

"আমি হেকা গিয়ে পাথর কুটতে চাই।"

"মাত্র একটি দিনের জন্য দুনিয়ার প্রোপাগ্যাণ্ডা মেশিনারি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কতো শান্তি পাওয়া যেত।"—চম্পা আস্তে আস্তে বলল।

"তা কি করে হতে পারে! প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে আমাদের গোয়েবেল্‌জে'র ছবিতে মালা পরানো উচিত। তুমি গান্ধীর কথা বলছ? এ যুগের সবচেয়ে বড় পয়গম্বর গোয়েবেল্‌জ—ডক্টর গোয়েবেল্‌জ জিন্দাবাদ!" গুলশন বলল।

ডেনিস বলল—"আসলে, অবচেতন মনে আমরা ফ্যাসিস্ট। আমরা সবাই ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করি। রোমান্টিকদের 'মৃত্যুর—আকাঙ্ক্ষা' কথাটির অর্থ আমি খুব ভালভাবে বুঝতে পারি।"

"আমি তো চাইনা সুন্দর অর্চার্ড ধ্বংস হয়ে যাক।" চম্পা বলল।

"অপ্রত্যক্ষভাবে আমরা সবাই ফ্যাসিস্ট। আমাদের সকলের হাতে অদৃশ্য মেশিনগান, মেশিনগানের মুখ অপরের দিকে—চিন্তাধারার মেসিনগান! শুধু বৃদ্ধারা শান্তি চায় কিন্তু পৃথিবীতে বৃদ্ধাদের প্রয়োজন মিটেছে।" ডেনিস চম্পার দিকে তাকাল। চম্পাকে তার বৃদ্ধা, দুঃখী মা'র মত মনে হল।

আমাকে সব সময়, সকলে ধ্বংস করতে চেয়েছে, মাইকেল মাথা উঠিয়ে বলল। 'কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের মৃতদেহের ওপরে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্য অমর সঙ্গীত সৃষ্টি করেছি, নূতন চিন্তার প্রদীপ জ্বালিয়েছি। আমি বন্য পশু? আমি শুধু…"

সড়ক বানাতে চাও, পাথর কুটতে চাও—ডেনিস তার কথার মাঝে বলল—আমরা তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি তোমার বিবেকের পথে এগিয়ে যাও।"

"অন্যের বিবেক ধ্বংস করার ইচ্ছাও অপরাধ। মুসার দশটি আদেশে এই অপরাধের কোনো উল্লেখ নেই।" ভ্রিল বলল—"তাই আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।"

এঞ্জেলো গীটার একদিকে সরিয়ে রাখল—"মাইকেল, তুমি ইহুদী কিন্তু তুমি ইংরেজও। বোমারু বিমানে চড়ে তুমি আমার অনেক সুন্দর শহর ধ্বংস করেছ। তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

"মাইকেল!" সুরেখা বলল—"তুমি ইহুদী কিন্তু ইংরেজও। তাই নিজেকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছ। এখন অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে নিজেকে এশিয়ান বলে ঘোষণা করছ কেননা তুমি জান, ফিলিস্টাইনে তোমার বনিয়াদ খুব মজবুত অথচ তোমার ভিত গোল্ডর্জগ্রীনে। তবুও আমরা তোমাকে ক্ষমা করছি।"

উদাস নীরবতা। ছোট ছোট গাছের আশেপাশে প্রজাপতি উড়ছে। সামনে নদীর বুকে একটা নৌকো। এঞ্জেলো আবার গীটার বাজাতে শুরু করল।

গৌতম নীলাম্বর ও তার বন্ধুরা সোজা চা ঘরে ঢুকল। লাউঞ্জে বসে বসে চা খেল। গৌতম ওয়েটারকে কিছু চিঠি পোস্ট করতে দিল। তারা লণ্ডন থেকে লিডহস্ট যাচ্ছিল। বিল, শান্তা, তলঅত ও নারগীশও তাদের সঙ্গে। তারাও কোনো বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধানে মগ্ন। কামাল জানালার ওপারে দৃষ্টি প্রসারিত করল—

বাগান দেখা যায়, নদী বয়ে যাচ্ছে। শ্বেত তথা প্রিমরোজ পাতার ফাঁক দিয়ে একটা মোটর লঞ্চ দেখা যায়।

"বাইরে চম্পাবাজী ও ত্রিল বসে আছে।" জলঅত জানালার কাছে এসে বলল।

তারা নির্মলাকে দেখতে যাচ্ছিল। স্যানাটরিয়মে সে গত তিন বছর ধরে আছে। তার ফুসফুস অপারেশন করা হয়েছে এবং তার চিকিৎক সার রোনাল্ড গ্রে মনে করেন, কিছুদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। প্রতি শনিবার তার বন্ধুরা লণ্ডন থেকে তাকে দেখতে আসত। গৌতমও প্রায়ই যখন সময় পেত, চলে আসত। অপারেশনের সময় ওয়াশিংটন থেকে হরিশংকরও এসেছিল। গৌতম অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে নির্মলার দেখাশোনা করত। সে ও নির্মলা আর কখনো চম্পা-প্রসঙ্গ টেনে আনত না। জীবন এত ব্যস্ত, এতই তর্কহীন যে পরিচিত সবার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা সম্ভব নয়। এত সময় কোথায়?

গৌতম প্রচুর নাম করেছে। ভারতের বিদেশ নীতি ও আর্থিক সমস্যা বিষয়ক দুটো বই সে লিখেছে। বই দুটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। সে এখন 'সেলিব্রিটি'।

নির্মলার অসুস্থতা গৌতমের জীবনে একটা বিপ্লবের সূত্রপাত করল। কেউ জানেনা মানুষের কাছে এক নিজস্ব নরক আছে, যার নাম আত্মা, সেই নরকে অদ্ভুত-অদ্ভুত রকমের পৃথিবী আছে, লোক আছে। বিশ্বের সেই কোণায় যেখানে 'গৌতম নীলাম্বরের' বোর্ড টাঙ্গানো আছে, বিচিত্র রকমের ঝড় বয়ে চলেছে। সেই ঘরে, যা প্রত্যেক তরুণের হৃদয়ে কোন মেয়ে বসে! প্রত্যেক যুবক, জীবনে মাত্র একবার সেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে একটিমাত্র মেয়ের সিঁথাতে সিঁদুরের রেখা এঁকে দিতে চায়; কিন্তু সেই যুবকের রহস্যকে জানতে পারবে, যার নাম গৌতম নীলাম্বর! তার সেই বাসার দরজা কে খুলবে? কার ছবি তার হৃদয়ে আঁকা? কেউ জানেনা হয়ত সে নিজেও জানেনা। অথবা সে নিজে জানে এবং মনে করে, অন্যের জানার প্রয়োজন নেই।

চুলের চেয়ে সরু এই পুলের ওপরে, যাকে জীবন বলা হয়, নির্মলা

দাঁড়িয়ে আছে। জীবন রসিকতার বস্তু নয়। হৃদয় মহান বস্তু। হৃদয় নিয়ে রসিকতা করা যায় না।

একটি গোপিকার হৃদয়, যা সংসারের কেন্দ্র বিন্দু। "চম্পাবাজী বাগানে বসে আছেন।" তলঅতের দ্বিতীয় অনুরোধ—"চলো তাঁকে দেখে আসি। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।"

গৌতম ঘড়ি দেখল—"না, সোজা লিডহস্ট চল, নয়তো দেরী হয়ে যাবে।"

চা-ঘর থেকে বেরিয়ে তারা সবাই মোটরগাড়িতে লিডহস্ট রওনা হল।

চম্পা দেখল তার সামনে দিয়ে মোটর সাঁ করে চা-ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এঞ্জেলো গাছের নীচে বসে-বসে গীটার বাজাচ্ছে। রোশন, মাইকেল, ডেনিস, সুরেখা ও গুলশন নদীর ধারে বেড়াতে গেছে। চম্পা আরাম চেয়ারে ঝুঁকে ঘাসের পাতা ছিঁড়ল।

"কি ভাবছ?" স্রিল জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না।"

"তোমার বন্ধুরা তোমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ।"

"লক্ষ্য করেছি, তুমি 'ক্রাউড' পছন্দ করনা অথচ ক্রাউডের প্রতি কখনো কখনো তোমার আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে। তুমি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের একটি সংগ্রহ।" স্রিল উদাস হয়ে বলল—"তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হয়।"

ইটালিয়ানদের মত কথা বলছ তুমি!" চম্পা স্মরণ করাল।

"তোমার আর একটা ঝামেলা আছে। তুমি সমালোচনা সহ্য করতে পারনা। ভীরু! তোমার দুর্ব ্যা সম্বন্ধে তুমি সচেতন?" চেয়ার ছেড়ে সে গাছের নীচে এসে বস —"প্রায়ই মিথ্যে কথা বল। ঈর্ষা কর। অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পার না। অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা কর সব সময়।" সে আরও বলল—"চম্পা, সময়ের

সবচেয়ে বড় কারসাজি কি জান ? আমরা একটা কিছুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে করতেই বুঝতে পারি, যুগ পাল্টে গেছে, আমাদের সময় পেরিয়ে গেছে। চম্পা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তুমি যেন সুজাতা মুখার্জি না হও। তোমার এই পরিবর্তন আমি সহ্য করতে পারব না··· আজ থেকে দশ বছর পর, চেলেসীর কোন এক স্টুডিয়োতে যুবক আর্টিস্টরা চম্পা আহমদকে ঘিরে থাকবে। সে তাদের গুরু হবে। মাই গড !"

"আমাকে করুণা করছ ? এই করুণা পাবার আমি যোগ্য নই।

'আমরা সবাই করুণার যোগ্য। তোমার মধ্যে তোমার চরিত্রের মধ্যে এটা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে আমার ভাল লাগে। তোমার হৃদয়ে কোনো জটিলতা নেই এবং সম্ভবত তুমি অন্যকে হয়ত ক্ষমা করতে পার। নয় কি ?"

"হ্যাঁ, সম্ভবত হ্যাঁ।"

হাল্কা বৃষ্টি। চা-ঘরের লাউঞ্জে তারা এসে বসল। মাইকেল ও তার বন্ধুরা লাউঞ্জে বসে আছে। লাউঞ্জের একটি সোফায় কাগজ ও সংবাদপত্র রাখা। গৌতম নীলাম্বর এসব ভুলে ফেলে গেছে।

"তুমি বন্ধুত্ব করতে পার।" ম্রিল বলল—তুমি এই পরিবেশে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে আছ চম্পা, এই কাগজের টুকরোর মত।"

ম্রিল আনমনা হয়ে একটা খাম উঠাল। উপরে গৌতমের ঠিকানা লেখা। খাম ছিঁড়ে ফায়ার প্লেসের দিকে ছুঁড়ে দিল।

"ম্রিল, আমি এখন প্রখর আলোয় দাঁড়িয়ে আছি ?"

"তুমি তো তাই চাও।"

একদা গৌতম নিজে আমীর রজাকে আমার সামনে রেখে ঠিক এই রকম প্রশ্ন করেছিল।

"কিন্তু, সে তোমার সাথে দেখা করেনা কেন ?"

"জানিনা, সম্ভবত তার সময় নেই।" চম্পা নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল।

"তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ !"

সে একটা উঁচু পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে আছে। সারা পৃথিবী

তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।—আমি নিজেকে এভাবে শেষ করলাম কেন?…সময় নেই, আর সময় নেই। নিষ্ঠুর সময় অনেক এগিয়ে গেছে…এগিয়ে গেছে…।

বাইরে বর্ষায় মোটর এসে দাঁড়াল। কয়েকজন বিখ্যাত শেক্‌সপীরিয়ান অভিনেতা লাউঞ্জে ঢুকল। একজন ব্রিলের পরিচিত। ফায়ার প্লেসের পাশে বসে বসে তারা অন্য কথা শুরু করল।

প্রায় একশ একর জায়গা জুড়ে ফুল গাছ এবং সবুজ জঙ্গলে ঘেরা, ছবির মত মনোহারি লিড্‌হস্ট স্যানাটোরিয়াম খুব শান্তভাবে বর্ষায় ভিজছে। এই স্বর্গের বিছানায় শুয়ে অথবা চেয়ারে বসে বসে লোকেরা টেলিভিশন দেখতে-দেখতে শেষ দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করত। অথবা অন্য কোনোভাবে শেষ হবার জন্য কিছু সময় নিয়ে বাইরের পৃথিবীতে ফিরে আসত। এই স্বর্গের এক কোণায় নির্মলার কামরা। বিছানায় আধশোয়া হয়ে নির্মলা খুশীমনে সকলকে দেখছে।

শান্তা, কামাল ও বিল বিছানার একধারে বসে। গৌতম ফুলের বড় ভার্সের কাছে একধারে বসেছিল।

"গৌতমজী!" নির্মলা'র সম্বোধন— "নতুন খবর কিছু ছাড়ুন না।" সে উঠে তার সামনে জানালার কাছে বসল।

"মজলিস মেলার আয়োজন চলছে?" নির্মলা সাগ্রহে তলঅতকে জিজ্ঞেস করল।

"ভীষণভাবে!" তলঅত বলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই যেন কথা হারিয়ে ফেলল। প্রত্যেক বছর নির্মলাই মেলার আয়োজন করত। তারই উৎসাহ ছিল সকলের চেয়ে বেশী। গত তিন বছর ধরে বার্ষিক মেলায় তাকে দেখা যায়নি। "ব্যস, শুধু এই আগস্ট মাসেই তুমি মেলায় থাকবে না।" কামাল বলল "পরের বছর থেকে আবার তোমার নেতৃত্বে আমরা মেলার আয়োজন করব।"

"গতকাল ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা হল।"

গৌতম বলল—"তিনি সম্ভবত আজ তোমাকে দেখতে আসবেন।"

"তিনি তো কয়েকবারই আমাকে দেখে গেছেন।"—নির্মলা বলল। "তাঁর মেয়েদের কি সিচ্যুয়েশন?"

"মন্দ চলছে না" তলঅত বলল।

"আবার শুরু হল স্ক্যাণ্ডাল।" কামালের প্রতিবাদ।

"না, আমি ঠিক এর পরেই প্রফেসর টয়েনবীর কথা বলতাম।" তলঅত বলল।

"মেলায় তাঁকে ডেকেছ?" গৌতমের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ, আমি স্টীফেন স্পেনডারকেও ডেকেছি।" তলঅত মুখ ফুলিয়ে বলল।

"এটা ইনটলেকচুয়ালদের কেনা-বেচার যুগ।"—গৌতম বলল— "আর্টিস্টদের এ যুগে কেনা হয়। প্রত্যেকের একটা মূল্য আছে। কে বলে, দুনিয়ায় আর্টিস্ট্রদের কদর নেই। দেখ, এশিয়ার আর্টিস্টরা একটার পর একটা স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছে।"

"এশিয়ার শিল্পীরা সোভিয়েত দেশ ও চীনও যাচ্ছে।" বিল বলল। সে নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে চাইছিল।

বাইরে দেবদারুর জঙ্গলে সূর্যের প্রকাশ।

"এবার উঠি।" গৌতম বলল—"লণ্ডন ফিরে যেতে-যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে।"

"তোমরা সবাই যাচ্ছ?" নির্মলা ঘাবড়ে গেল "আমি আবার একলা।"

"তুমি একলা থাকবে নির্মলা।" কামাল তার বিছানায় ঝুকে বলল—"আমরা সব সময় তোমার সঙ্গে আছি।"

"আগামী সপ্তাহে সম্ভবত আমি আসতে পারব না। 'পণ্ডিতজী' কোনো কনফারেন্সে যোগ দিতে আসছেন দিল্লী থেকে।" গৌতম অনুনয়ের সুরে বলল।

"হ্যাঁ গৌতম, আমার জন্য তুমি তোমার কাজের ক্ষতি কোরো না।" নির্মলা আনমনা হয়ে বলল।

তারা সবাই গ্যালারী টপকে বাইরে বেরিয়ে এল। জানালায় নির্মলা দাঁড়িয়ে। সে দেখল, বিকেলের সোনালী রঙে দেবদারুর ছায়ায় তারা মিলিয়ে গেল।

চুয়াল্লিশ

বৃষ্টি থেমেছে। চম্পাও ব্রিল দেহাতী চা-ঘরের বাইরে এল। লঞ্চে বসে তারা কেম্ব্রিজ ফিরে এল। নদীর দু পাশে সবুজ ঘন লতাপাতা। চম্পা ব্রিলকে দেখল। কাল থেকে ছুটি শুরু হচ্ছে—নতুন কোনো কথা নেই। সব কেমন একঘেয়ে ঠেকছে, ব্রিল এশ্‌লেও। ব্রিলের কাছেও সে খোলা বাইরের মত। ব্রিলও তার কাছে তাই। ব্রিল তাকে ভালোভাবেই জানে, সেও ব্রিলকে চিনেছে। এমন কেন হয়? সে এখন কোন্ জঙ্গলে গিয়ে লুকাবে নিজেকে? "আও বন-উপবন মে, চঞ্চল মোরে মন মে, কুঞ্জ-কুঞ্জ ফিরে শ্যাম!" রেলিংএ ঝুকে একটা পুরোনো গান সে গুনগুনিয়ে উঠল।

পরের দিন কেম নদীর ধারে, কাঠের হাউস বোটের নীচে সে ও ব্রিল এসে বসল। ব্রিলের সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছিল। হঠাৎ ব্রিলকে খুব আপন মানুষ মনে হল, মনে হল ব্রিল যেন তার স্বামী। চম্পা রোমাঞ্চ অনুভব করল। বাস্তবে ব্রিল তার নয়, অন্য কোনো মেয়ের স্বামী। সেই মেয়েটিকে চম্পা আজ পর্যন্ত দেখেনি। দৃশ্য ফের বদলে গেল। নৌকো বাঁধা একটা উল্টো নৌকার ওপর বসতে বসতে ব্রিল বলল—"আমাকে তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ড বল।"

ব্রিল অনুভব করল, দূর দেশ থেকে আসা এই মেয়েটি সম্ভবত তারই আশ্রয়ে এখানে বসে আছে। অত্যন্ত অবলা। সম্ভবত অতীতের কথা বলতে পারলে শান্তি পাবে। কিন্তু তার নিজের সংসার কোনটা? সংসার সর্বদা পরিবর্তনশীল। চম্পা আহমদকেও ব্রিলের অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়। তার স্ত্রী, রোজমারীর তুলনায় চম্পাকে বেশী পরিচিত মনে হয়। সে ঘাবড়ে গেল। সহসা ব্রিলের মনে হয়, চম্পা আহমদের সঙ্গে নিজেকে সে এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। নিজের উপর এবং এই মেয়েটির উপর তার করুণা হয়।

"তুমি আমাকে নিয়ে উপন্যাস লিখবে?" চম্পা'র প্রশ্ন।

"না। অন্য কেউ লিখবার কথা দিয়েছিল?"

"বিল—বিলিয়াম ক্রেগ।"

"না, আমি উপন্যাস লিখতে চাই না।"

"আমাকে কি খুব অদ্ভুত মনে হয় তোমার ?"

"না। তোমার মত অনেক মেয়ে আছে—বুদ্ধিমতী, কোমল সুন্দরী।"

"এই তিনটি শব্দে আমার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়।" চম্পা মনে মনে বলল। চোখ বন্ধ করে আরেকবার অতীতকে কাছে টানল।—বেনারসের পাড়া, বাড়ী। বারান্দায় খাটিয়া পাতা। বাবা গড়গড়া টানছেন আর মামলা মোকদ্দমার ফাইল দেখছেন ··· লক্ষ্ণৌ আই· টি· কলেজ, কৈলাশ হোস্টেল, 'গুলফিশাঁ'; কিন্তু গুলফিশাঁ তার বাড়ী নয় অথচ 'গুলফিশাঁ' তার বাড়ী হতে পারত।

"চেয়ে দেখ, কে আসছে—তোমার অতীত থেকে বেরিয়ে!" বিল বলল।

চম্পা চোখ তুলল। অনেক লোকের ভিড় থেকে বেরিয়ে কামাল বোট হাউসের দিকেই আসছে।

"হ্যালো চম্পাবাজী, হ্যালো বিল!" কামাল কাছে এসে বলল।

"হ্যালো ?"

"গতকাল সকালে আপনাদের একটা রোড হাউসে দেখেছিলাম।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমাদের হাতে একদম সময় ছিল না।"

"ঠিক আছে, বস।"

কামালও একটা উল্টো নৌকার ওপর বসল।

"আমি বিলকে লক্ষ্ণৌর কথা বলছিলাম।" চম্পা বলল।

"সত্যি!" ভদ্রতার খাতিরে কামাল বলল। মেয়েটি এখনও সেখানেই রয়ে গেল অথচ পৃথিবী কোথা থেকে কোথায় এগিয়ে গেছে। কামাল ভাবল।

চম্পা কামালের মনোভাব বুঝতে পারল। "তুমি আমাকে আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলে না কামাল" সে বলল। "আমি অতীতকে পূজো করি। কিন্তু ··· কিন্তু গ্রীষ্মের দুপুরে খড়ো গন্ধ, ঘোড়ার খুরের সঙ্গীতময় ধ্বনি, গরুর গাড়ীর একঘেয়ে আওয়াজ ··· এ সব,

এসব আমি কি করে ভুলি কামাল? হয়ত আমার বুদ্ধি কম কিন্তু আমি এ সব কিছু সদাসর্বদা অনুভব করতে চাই, আমার কাছে রাখতে চাই। আমি যদি বুদ্ধিমতী হতাম, তোমার দর্শনকে হয়তো স্বীকার করতাম। সেটা হত অন্য কথা। হায় সিরিল, বর্ষার পর চাঁদবাগে ছড়িয়ে পড়া রং তুমি যদি দেখতে—অথবা দুপুরে রামনগরের নিস্তব্ধতা ধূলোভরা পথের একধারে, ছোট্ট উদাস হিন্দু ছেলে, যার মাথায় লম্বা এক টিকি—একমনে নামতা পড়ে যাচ্ছে! না, সিরিল তোমাকে আমি আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড বলতে পারি না! তুমি সম্ভবত বুঝতেও পারবে না।

"আমি তোমাকে বলব!" কামাল সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলতে শুরু করল। সে যেন এক বহুদূরের মোহময় জগতে চলে গেছে। এ সব দৃশ্যের স্মৃতি কামালের চেয়ে আর বেশী কে জানবে! সে যেন তার প্রিয় হিন্দুস্থানে পৌঁছে গেছে।

"শোনো, জ্ঞানবতী কাঁধের ওপর চুল ছড়িয়ে ইমনের খেয়াল গাইত—'আলে নবী, আউলাদে-আলী পর বারি-বারি বাউঁ! জেহরা কে ফরজন্দ হাসান-হুসেন', এখন আমি এর অনুবাদ কি করে করি! বিয়ে-শাদীর সময় কল্যাণপুরের দালানের পর্দা পড়ে যেত আর চৌকাঠের ওপর বসে বসে পেশাদার মেয়ে গাইয়েরা গাইত—'ইস বন্নে পর সায়া আলী কা! মোরা শ্যাম সুন্দর বন্না!'—কোন পশ্চিমী সোসিয়ালজিস্ট এর সৌন্দর্য বুঝতে পারবে?—মোরা শ্যাম সুন্দর বন্না!"

"এবং" চম্পা বলল—আমার বাড়ীতে পেশাদার মেয়ে গাইয়েরা গাইত—'মঙ্গল গাউঁ, টোকে সজাউঁ, গজরা চামেলী কা লাওরী।' চামেলী ফুলের গজরা দেখেছ সিরিল? ... আমার গ্রামে কৃষকরা চাঁদের আলোয় আল্‌হা-উদল গাইত—'আলী-আলী করকে সৈয়দ দৌড়ে, আল্লা খীচ লীন্হ তলোয়ার!'—আর কদীরের ভাইপো, চেহারায় সাদা রং মেখে খ্যামটা নাচ নাচতে-নাচতে গাইত—

খুদ কা শুক্র হ্যায় লায়লা, তিরে দরবার মে আপ;
কি জিস সরকার কা থা ম্যায় উসী সরকার মে আয়!

(ঈশ্বর কে ধন্যবাদ, লায়লা তোমার দরবারে এল। লায়লা যার অধীনে ছিল, তার কাছেই ফিরে এল)।

"চম্পাবাজী!…সেই নৌটংকীর (গ্রাম্য নাটক সমারোহ) কথা তোমার মনে আছে? ক্রিসমাসের সময় তোমাকে আমার গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলাম। সারা রাত কম্বল জড়িয়ে আমরা 'লায়লা মজনু' দেখেছিলাম।"

"হ্যাঁ" চম্পা এখন লক্ষ্ণৌ থেকে পঁচিশ মাইল দূরে, কল্যাণপুরে। সে সেখান থেকেই উত্তর দিল,—"হ্যাঁ।" "মজনু" হাওয়ায় হাত নাবিয়ে জবাব দিল—

তিরা চেহরা মিরা কিবলা, তিরী জুল্‌ফে মিরা ইমাঁ,
তওয়াফে-কাবা করনে কো, তিরে দরবার মে আয়া।

(তোমার চেহারা আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার কেশরাশি আমার ইমান অর্থাৎ ধর্ম, আমি আবার তোমার দরবারে এসেছি)।

"হ্যাঁ!" কামাল বলল। সেও কল্যাণপুরে বসে আছে। তারা সবাই নৌটংকীর মণ্ডপের নীচে শাল ও কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছে। স্টেজে ম্লান গ্যাস ল্যাম্প জ্বলছে। কদীরের ভাগনে 'মাস্টার' ফরীদ যাকে তার সরু গলার জন্য ঝিংগুরবা বলা হত "লায়লা"র সামনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। গ্রামের অর্কেস্ট্রা জোরে জোরে হারমনিয়াম ও তবলা বাজিয়ে চলছে।

মাস্টার ফরীদ গাইল—

জুলেখা কী তরহ, জব তিরা আসিক হুয়া লায়লা!
তো ইয়ুসুফ কী তরহ, বিকনে তিরে বাজার মে আয়া!

(জুলেখার মত লায়লা যখন তোমার প্রতি আসক্ত হল, তখন ইয়ুসুফের মত তোমার বাজারে সে বিক্রী হতে এল)।

সামনের মোড়ায় গৌতম নীলাম্বর বসে আছে। তাঁর পাশে হরিশংকর ও তার পাশে মেয়েরা। গৌতম গম্ভীর ভাবে সামনে ঝুঁকে চম্পাকে ফোক কালচারের বিষয়ে বোঝাচ্ছে। ভোর চারটে পর্যন্ত তারা নৌটংকী মণ্ডপে বসে ছিল। মাটির ভাঁড়ে তারা আখের রস ও চা খেয়েছিল। কামালের পিতা নবাব তকী রজা বাহাদুরের মৌরুসী গ্রাম এটা।

মোড়ায় বসে বসে তারা নৌটংকী দেখল। বাইরে আম্রকুঞ্জে পৌষ মাসের হাওয়া। মণ্ডপে বসে বসে তবলায় কাহারবা শুনল তারা। হঠাৎ একটি মোটর লঞ্চ, একটা ইংরিজি রেকর্ড বাজাতে বাজাতে কেমের তরঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। চম্পা ও কামাল ফিরে এল।

"আমাদের গ্রাম্য নৌটংকীর 'নল-দময়ন্তী' ও 'ইন্দর সভা ও চমৎকার হত।" কামালের স্বর গম্ভীর। সে সিগারেট ধরাচ্ছিল।

"আর, তোমার যূথিকা রায়ের কথা মনে আছে, কামাল?" চম্পা ফিস্ ফিস্ করে বলল। আর সেই বাসন্তী গান—"জোগন খোজন নিকলী হ্যায়।"

"হ্যাঁ" কামাল তার কথায় সায় দিল। শীতকালের দুপুরে রোদে বসে হরিশংকর গাইত—'অগর দেনী থী হ্যামাকো হুরে জন্নত, তো য়হা দেতে' (আমাকে যদি স্বর্গ দিতে চেয়েছিলে তো এখানেই দিতে) এবং "পিয়া মিলন কো যাত থী ম্যায়, সজ ধজ শীষ গুঁধায়ে; লোগ কহত ম্যায় বাবরী, সব জগ হঁসী উড়ায়ে' (সেজেগুজে প্রিয়া মিলনে চলেছিলাম আমি। লোকেরা আমাকে দেখে হাসে, পাগলী বলে)। সে রেগে স্রিলকে বলল—তুমি জান পঙ্কজ মল্লিক কে? পাহাড়ী সান্যাল ও আরজু লখনবী, নারায়ণ রাও ব্যাস ও কানন দেবী কে? তুমি জান এঁরা আমাদের জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে আছে?"

"তুমি কি জান—" চম্পা সক্রোধে বলল "তুমি আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানতে চাইছ অথচ তোমাকে কি করে বোঝাই যে প্যারু কববাল কত বড় গায়ক এবং ফৈয়াজ খাঁ ও দিপালী তালুকদার এবং—"

"এবং তুমি জানই না যে লক্ষ্ণৌ ও আলীগড়ের মুশায়ারা (কবি সম্মেলন) কি জিনিস ও আমাদের জীবনে তার গুরুত্ব কতখানি। জিগর সাহেব ও ফিরাক সাহেব ও আনন্দ নারায়ণ মোল্লা আমাদের কত প্রিয়, কত কাছের লোক!" কামাল বলল।

"কালিদাসের এই শব্দের অর্থ—'নব বিন্ধ্য ও সিন্ধু হয়ে, বকের সঙ্গে-সঙ্গে মেঘের বাণী নিয়ে এগিয়ে চলল'—তুমি কি করে বুঝবে?" চম্পা এখনো রীতিমত উত্তেজিত।

"হালদারের আঁকা ছবি 'অশোক বনে সীতা' আমাদের কেন এত ভাল লাগে তুমি কি করে বুঝবে?" কামাল বলল—"না ত্রিল, তোমাকে বোঝান বড় শক্ত।" সে তাড়াতাড়ি উঠে বোট হাউসের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল। কেম নদী বয়ে বলেছে। হঠাৎ কেম নদী গোমতী নদীর রূপ নিল।

"কামাল, শোন।" চম্পা কিছু ভাবতে ভাবতে বলল—"গভীর রাত। কুকুর ডাকছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কাক-পক্ষীও ঘুমিয়ে পড়েছে। চৌকিদার খরবুজের ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে।"

চম্পা কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল।

"আমরা প্রায়ই হরিশংকরের কামরায় জমা হতাম।" কামাল বলতে শুরু করল—"তার নীচে নদী বয়ে চলেছে। কামরায় বসে আমরা সারা দুনিয়ার সমস্যা সমাধান করতাম। সেই কামরা ও সেই গ্রুপ এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে।···আমাদের কাছে জীবনের অর্থ তখনো কিন্তু খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অনেক পর্দা উঠছিল, পড়ছিল। কখনো প্রখর আলোর মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখনো আমাদের সামনে সব কিছু ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকত। এই মানসিক আলো-ছায়ায় অনেক সময় কেটে গেল। আমাদের মনে হত, মনুষ্যত্বের রক্তে আমাদের হাত লাল। এই রক্ত ধুয়ে ফেলতে হবে। দেখ, কি হল—"সে হাত ত্রিলের সামনে প্রসারিত করল—" এক প্রভাতে আমরা দেখলাম, আমাদের হাত সত্যি সত্যিই রক্ত রঞ্জিত। তাদের হাতও রক্ত রঞ্জিত—যারা ক্লাসিকাল কালচারের জয়গান গাইত! আমাদের মধ্যে এমন অনেক ছিলেন যারা প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মানুষত্বের মূল্য ও ধর্ম আলোচনা করতে করতে তারা এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেলেন।"

"এদের ছাড়া আরও লোক তো ছিল। সত্যিকারের মানুষ, আসল মানুষ"—সে চম্পাকে দেখল। "কদীর ও কমরুণ···?" চম্পা বলল।

কামাল নীরবে তাদের কথা বলবার অনুমতি চাইল। তাদের অত্যন্ত পবিত্র মনে হল।

"হ্যাঁ, কদীর ও কমরুণ, রামঅবতার ও রামদইয়া; আমাদের

গ্রামের একাওয়ালা ও গানওয়ালা, বাগানের মালী ও পাল্কীর কাহার—এরা সব আমাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড, যা তুমি কোনোদিন বুঝতে পারবে না।"

চম্পা এখনো ফিরে আসতে পারেনি। সে শুরু করল—

"হ্যাঁ, আমাদের নদীর কথা বলি। নদীর অপরিবর্তিত রূপ। বড় মিষ্টি নাম আমাদের নদীর—সরযূ, সারদা, মন্দাকিনী, মধুমতী, গোমতী!" কামালের চম্পার কথা আর ভাল লাগছিল না। মেয়েদের নিয়ে এই বিপদ। প্রথমত বেশী কথা বলে। দ্বিতীয়ত, একবার যদি তার মনে ধারণা জন্মায়, সে শিল্পী, ব্যস, আর দেখতে হবে না।

চম্পা নদীর কথা বলছে, কামাল পালাতে চাইছে। নদীর চরিত্র? আমার চেয়ে ভাল একথা কে জানবে? সে ভাবল—আমার সেই বাড়ীর কথা মনে আছে…সেই নদী, সেই গাছপালা, চম্পাবাজী তুমি নিজে…

"বাগানে অমলতাসের গাছ ছিল।" সে বলে চলেছিল— আর বেল ফুলেরও একটি—কামাল, গৌতমকে একবার জিজ্ঞেস কোরো, টুপ টুপ করে পড়ন্ত বেলের কথা তার মনে আছে নাকি?"—এই প্রথম সে গৌতমের কথা স্মরণ করল।

কামাল ভাবছে। আমি একে কি করে বলি যে গৌতম একে ভুলে গেছে। গৌতম অত্যন্ত ভাবুক এখনও এঁরই মত। নদী, সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠি, অমলতাসের গাছ কিছুই ভুলতে পারেনি। ঝামেলার ব্যাপার। কামাল বিরক্ত হয়ে চম্পাকে দেখল। পায়ের ওপর পা রেখে সে ভাবল,—হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েদের এই কমপ্লেক্সে আচ্ছা করে জড়িয়ে রাখা হয়েছে—এক, শুনেছি তারা সতী, তারপর আবার সীতা! গোপীদের ফ্রড চলল কিছুদিন—ছুনিয়ায় এদের আর কোনো কাজ নেই! ব্যস কোনো ভালমানুষকে ধরে পূজো করে যাও। এদিককার সেণ্ট-ওয়েণ্ট মেয়েরাও হয়ত ভাবে, যীশুকে একবার পেলে বেশ জমিয়ে মজা করা যেত! "আমি গৌতমকে জিজ্ঞাসা করব," সে নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে

উঁচু স্বরে বলল—"আমার মোজাও রিপু করাতে হবে। আগামীকাল ইয়ুথ ফেষ্টিভালে জার্মানী যাচ্ছি। রাত্রে লণ্ডন পৌঁছলে তলঅত আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবে।"

"চল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই" ত্রিল উঠল। তারা শহরের দিকে এগিয়ে চলল।

কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে চম্পা হোস্টেলে নিজের কামরার জানালা খুলল। নীচে নির্জন পথ ল্যাম্পের নীল আলো। সেণ্ট জনের ঘড়িতে বারটা বাজল। দূরে জীজাম লেনে কেউ ট্রাম্পেটে করুণ গান ধরল।

বেলা নাইরে, জল্‌দী জল্‌দী!
ও বেলা শোনার কোমর আঁচল ধইরা!
জাদুর কাঠি হাতে লইয়া আইলরে যত বুঝি
বেলা নাইরে জল্‌দী জল্‌দী—
বেলা নাই…।

সময় নেই। সময় নেইরে ভাই। লোকদের দেখ, তাদের চেহারা কিরকম ঘৃণ্য! পালাও! আমি কোথায় যাই? কোনদিকে যাই? আমার বন্ধু, আমার শত্রুদের আমি পথের কোন বাঁকে, কোন সীমারেখার ওপারে ফেলে এসেছি? তারা কোনো পথের চৌমাথায় আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে? ছাতের ঐ পারে, নদীর ঐ পারে কি আছে? আমি—ওটা তুমি, বাকি সব আমার প্রজেক্সন। সামনে লাল চ্যাপেল, ঘণ্টা বাজছে। জঙ্গলের সরু পথে চলতে চলতে আমি দেবদারু গাছের আওয়াজ শুনেছি। কুয়াশা ভেদ করে সেই আওয়াজ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। শীতল, অজানা জলধারায় সাঁতার কাটতে কাটতে তোমাকে আমি স্মরণ করেছি। সামনে লাল ছাতের চ্যাপেল। বসন্ত। সরু পথ ভোরের তারার সঙ্গে ফোটা ফুলে ঢাকা। তারা দুজনে এখনো পৌঁছায়নি। তারা দুজন, যাদের এই লাল ছাতওয়ালা চ্যাপেলে বিয়ে হবে। ঝিলে বর্ষা নেমেছে। আমি চিরদিন—চিরদিন তোমার সঙ্গে রইব।

I loved my love with a platform ticket,
A jazz song.
A handbag, a pair of stockings of Paris Sand
I loved her long.
I loved her between the lines and against the clock.
Not until death
But life did us part.
I loved her with peacock's eyes.
And the Wares of Carthage,
With blasphemy, Camaraderic,
and bravado and lots of other stuff.
I loved her with my office hours, with
flowers and sirens.
With my budget, my latchkey
and my daily bread
And so to London and down the
ever-moving stairs.[1]

পঁয়তাল্লিশ

সেদিন যখন চম্পা হোস্টেল থেকে বাইরে বেরল—দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। সে কোথায়, কোনদিকে যাবে? কি করবে? এই প্রয়োগও সম্ভবত অসফল হবে। সামনে প্রশস্ত বাগান, মাথার ওপর মেঘাচ্ছন্ন নীল আকাশ। সে 'বক্‌সে'র উপর দিয়ে হেঁটে ফিট্‌জ উইলিয়াম লাইব্রেরীর দিকের পুলে এল। সেলাম আলেকুম! এক ইহুদী ছাত্র সাইকেল চেপে যেতে যেতে অপর এক ইহুদী ছাত্রকে বলল। ঈশ্বর তোমার প্রতি যেন করুণাময় হন!"

"ঈশ্বর তোমাদের সকলের প্রতি করুণাময় হন।" চম্পা মনে-মনে বলল।

1 Louis Mac Neice.

জীবন এমনিই ধাঁধাঁর মত। এর জন্য দর্শনের প্রয়োজন নেই। এই সব কামনা, প্রার্থনা একটু সুখের জন্য। সুখের জন্য মানুষ কত নীচে নামতে পারে। এক ইহুদী ছাত্র পুলের ওপর বসে ছবি আঁকছিল। তাকে দেখে সে প্রীত হল। "বসে পড়।" চম্পার প্রতি তার অনুরোধ।

"আমি তোমার স্কেচ আঁকব।" চম্পা ছাত্রটির অনুরোধ রাখল। সে বসল। "আজ শেষ দিন। জানিনা, আগামীকাল তুমি কোথায় যাবে! তোমার স্কেচ আমি আমার কাছে রাখব।" ছবি আঁকতে আঁকতে সে বলল।

চম্পা দেখল, ছেলেটি স্কেচ ভাল আঁকতে পারছে না। তবু ধৈর্য ধরে সে বসে রইল। সম্ভবত এই আমার আসল রূপ, সে মনে-মনে বলল।

"ছবি পছন্দ হল?" ইহুদী ছাত্রটি খুশী মনে জিজ্ঞেস করল। "আমি তোমাকে খুশী দেখতে চাই। কি করে তোমাকে খুশী করি?" ছেলেটি অত্যন্ত সরল।

"তুমি আমাকে খুশী করতে পারবে না।" চম্পার স্বর কর্কশ। (আমরা সবাই ইতর। খুশীর খোঁজে আমরা অনেক নীচে নামতে পারি। সে মনে-মনে ভাবল) "সে কে?" ছেলেটি ক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করল "যে তোমাকে আনন্দ দিতে পারবে সে কে?"

"নির্মম প্রশ্ন বটে!"

"ক্ষমা কোরো!" ছেলেটি উদাস হয়ে বলল।

"আচ্ছা, খোদা হাফিজ, সেলাম-আলেকুম।" চম্পা হাসতে হাসতে বলল।

"সেলাম্ আলেকুম।" ছেলেটি দেখল, চম্পা নদীর দিকে চলেছে। মাইকেল ও ডেনিস সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

"ম্রিলের পাত্তা নেই এখনো।" ডেনিস প্রায় চেঁচিয়ে বলল "না।"

"কোথায় গেছে ম্রিল?" ডেনিস বলল। সরোষে তারা চম্পার দিকে তাকাল।

"ম্রিলের দায়িত্ব আমার নয় ডেনিস।" চম্পার নরম উত্তর।

"ও, চম্পা, আমাকে ক্ষমা কর। সম্ভবত আমি রেগে গিয়েছিলাম। মাইকেলের বিনীত অনুরোধ—"চলো আজ শেষবারের মত 'কোহিনুরে' খাবার খাই।"

"আজ শেষবারের মত···সকলে এই একই কথা বলছে। চম্পা এই আবেগ এড়িয়ে যেতে চাইছে। অথচ আজ কেম্ব্রিজে ছাত্র-জীবনের শেষ দিন।

রেস্তরাঁয় বসে তারা ব্রিলের ব্যাপারে আলোচনা করল না। মানুষ একে অপরের দুঃখের ভাগীদার কেন হতে চায়? এরাও আমার ওয়েল ওইশার। আমি আবার নীচতায় নেমে এসেছি।

কয়েকদিন আগে কথায়-কথায় সে রোজমারী কুশল জানতে চেয়েছিল।

"ভাল আছে সে" ব্রিলের উত্তর। "মেয়েটি অসুস্থ থেকেও চাকরি করে, যাতে আমি কেম্ব্রিজে ঠিক মত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।"

"এবং অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে পার।" চম্পা আনমনা হয়ে বলেছিল। রাগে ব্রিলের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে একলাফে জানালার বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে তার দেখা নেই।

হঠাৎ তাকে বাইরে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখা গেল। ডেনিস হন্ত-দন্ত হয়ে তার দিকে ছুটে গেল। সে কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

"ছেলেমানুষী কোরনা, ভেতরে এস।" চম্পা বাইরে এসে ধমক লাগাল।

"আমার কাছে পয়সা নেই। ভেতরে যাই কি করে?" সে ডেনিসকে বলল।

চম্পা যেন হোঁচট খেল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এই যায়গায় সে ব্রিলকে বলেছিল, তোমার বৌ এইজন্যই চাকরি করে যাতে তুমি অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পার।

ব্রিল চম্পাকে বলল "তুমি শুনে সুখী হবে, রোজমারী আমাকে

এই সপ্তাহে টাকা পাঠায়নি কেননা তাকে লিখেছিলাম, আমি তাকে ত্যাগ করছি।"

"তোমার···তোমার মাথা অর্থাৎ···তুমি পাগল হয়ে গেছ!" চম্পার মুখ দিয়ে কোনোক্রমে কথাগুলো বেরল। সে অনুভব করল মাইকেল ও ডেনিসের চোখে তার প্রতি ঘৃণা! ঠিক এই ঘৃণা, ভর্ৎসনা সে তহমীনা, নির্মলা ও শান্তা ক্রেগের চোখেও দেখেছিল।

"হ্যাঁ।" ব্রিলের বেপরোয়া উত্তর। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে সিগারেট খুঁজছিল।

ডেনিস ও মাইকেল চুপচাপ রেস্তরাঁয় ফিরে এল। চম্পা ও ব্রিলের উপরে বারি ধারা।

"চল যাই। ভিজে কোনো লাভ নেই।"

"কোনো ব্যাপারেই কোনো লাভ নেই।" ব্রিল সেই ভাবেই বলল।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ব্রিল।" চম্পা আবার বলল।

"প্রত্যেকটি ঘটনা জীবনে একবারই ঘটে। ভেব না চম্পা, একটি ঘটনা, সময় বা মুহূর্ত দুবার ফিরে আসে। তোমার জীবন···আমি ···এ সমস্ত ঘটনা। সময়ের ট্র্যাজেডি দেখে তোমার হাসা উচিত নয়।

"চলো, আমি তোমার দিকে যাই।" সে আস্তে-আস্তে বলল।

তারা ফুটপাথের উপর দিয়ে এমন ভাবে চলেছে যেন কবরখানার দিকে চলেছে। পথে পরিচিতের সাথে দেখা হলে ব্রিল দুঃখভরা কণ্ঠে, হ্যালো, হ্যালো বলছে।

"তুমি সত্যিই আমার জন্য···অর্থাৎ" এর পর সেই ভয়ংকর কথা তার মুখ দিয়ে বেরল না। অর্থাৎ? মৃত স্বরে সে বলতে চাইল··· "কেন তুমি এমন নির্ণয় নিলে?" নির্ণয় এবং তার কারণ চম্পা এখনো বুঝতে পারে না কেন ব্রিল এমন করল।

"আজ্ঞে না···তোমার পাগল কুকুর আমাকে কামড়েছিল।" ব্রিল সহজ ভাবে উত্তর দিল।

"কখনো কখনো আমি ভির্মি খাই উন্মাদের মত আচরণ করি। তখনই এই সব কাণ্ড করি।

চৌমাথায় পৌঁছে সে হোস্টেলের দিকে এগিয়ে চলল।

"তুমি তো আমাকে উপদেশ দিতে আমার হোস্টেলে আসছিলে?"

"তোমার সঙ্গে আর কোনো কথা নয় ত্রিল। আমি কোনো রকম সাহায্য করতে পারি না।"

"এই তোমার শেষ উত্তর?" ত্রিল অসহায়।

"হ্যাঁ শেষ উত্তর। এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।"

"আর কতদিন গৌতম নীলাম্বরের পেছনে তুমি দৌড়বে?"

"আমাকে অপমান কোরো না ত্রিল।" চম্পা যেন ক্রোধে জ্বলে পুড়ে গেল।

"ঠিক আছে ঠিক আছে!" ত্রিল নিশ্বাস বন্ধ করে বলল। "রাস্তায় চেঁচিও না চম্পা আমি ক্ষমা চাইছি। ভুল আমার। খোদা হাফিজ!" এক ঝাঁক বৃষ্টি বাড়ির পর্দা কাঁপাল। বাতাসে ভেজা গোলাপের গন্ধ।

সন্ধ্যে বেলা কিছু কাগজ-পত্র নেবার জন্য সে ত্রিলের কলেজ সিডনী সসেক্স গেল। রাতের ট্রেনে অনেকে নিজের-নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা বর্ষা বাঁচিয়ে ফটকের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চদশ শতকের কাঠের ভারী দরজা শেষ বারের মত খুলে বন্ধ হবে। এর পর যখনই এরা এখানে আসবে দেখবে সব কিছু বদলে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে। সে চ্যাপেলে গেল। মালিদের সঙ্গে কথা বলল। এক খানসামাকে থামিয়ে সে খোদা হাফিজ বলল এমন ভাবে যেন আগামী কাল পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে ও সে যুদ্ধ করতে চলেছে।

কলেজ শান্ত নীরব। শুধু বৃষ্টির একটানা একঘেয়ে আওয়াজ ত্রিল এশ্‌লে কমন রুমের দরজার কাছে বসে শব্দ ধাঁধা দেখছে। চম্পা ভেতরে ঢুকল। তবুও সে ধাঁধা দেখছে। চম্পা বসলে সে কয়েকটা শব্দ সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাইল চম্পা। মতামত জানালো।

"ঠিক আছে। সম্ভবত তুমি ভুল বলছ না।" ত্রিল বিশুদ্ধ ব্রিটিশ ধাঁচে উত্তর দিল।

সে চমকে উঠল। তার সামনে এক ব্রিটিশ লর্ডের ছেলে বসে আছে—রুচিবাদী, গম্ভীর, অহঙ্কারী। এই ছেলেটির সঙ্গে কয়েকটা বছর সে বিত্তালয়ে কাটিয়েছে এবং আজ বিদায়ের মুহূর্তে তাকে খোদা হাফিজ বলতে এসেছে। এ সে ব্রিল নয় যে তার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করেছে, কেমে নৌকো বিহার করেছে, মাঠে-ময়দানে দৌড়তে-দৌড়তে গান গেয়েছে। যে চম্পার মন এবং আত্মার ভ্রমর নির্ভয়ে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিল—আজ সকালে বর্ষায় ভিজতে-ভিজতে পাগলের মত তাকে বিয়ে করার প্রার্থনা জানিয়েছিল। এ ব্রিল লর্ড বার্ণফিল্ডের ছোট ছেলে ব্রিল ডেরিক এডবিন হার্বাড এশ্‌লে যে শব্দ ধাঁধা সমাধান করতে করতে জিজ্ঞেস করল—"তুমি এখনো যাও নি? কোন ট্রেনে চলেছ?"

"সাড়ে ছটার গাড়ীতে। চম্পা ঘড়ি দেখে উত্তর দিল।

"তুমি কবে লণ্ডন আসছ?"

"ঠিক নেই। তবে যখনই আসি, তোমার সাথে আর দেখা হবে না। আমি সারা জীবন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইনা।"

চম্পা কোনো কথা বলল না। ভেজা হাওয়া কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সহসা চম্পা খুব সপ্রতিভ হয়ে কথা শুরু করল। বিশ্ববিত্তালয় ছাড়ার পর গ্রুপের অন্যান্য ছাত্ররা যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল—সে বিস্তারিতভাবে সব বলল। "আমি আইন পড়ব।"

"অভিনন্দন। তারপর কি করবে?"

"জ্যোতিষবিত্তা আমি জানি না, তাই '৬২ সালে এবং '৬৫ সালে কি করব কি করে বলি ব্রিল!" তার স্বরে খুশীর আমেজ।

"ঠিকই বলছ।" ব্রিল এখনো পত্রিকা দেখছে।

"তুমি অবশ্য ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে মোটা-মোটা বই লিখবে। দিক দিগন্তে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।"

"হয়ত তাই।"

"অথবা বোর হয়ে ডক্টরেট ছেড়ে ব্যাঙ্ক অফ ইংলেণ্ডে চাকরি নেবে।"

"সম্ভবত।"

"আচ্ছা, এবার আসি।" ঘড়ি দেখতে দেখতে চম্পা বলল।

"তোমার জায়গায় আমি থাকলে দেরি করতাম না।" ত্রিল বলল আর উঠে দাঁড়াল। দরজা অনেক নীচুতে। কয়েকশত বছর ধরে ছাত্ররা খোদা হাফিজ বলে এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ সেও বেরচ্ছে।

ঝুঁকে ত্রিল তার জন্য রাস্তা করে দিল। এতদিন ধরে—গম্ভীর স্বরে, প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে সে বলল—তোমার সাথে পরিচিত হয়ে, তোমাকে জেনে খুব আনন্দ পেয়েছি, খোদা হাফিজ।

সে বাইরে বেরিয়ে এল।

"দরজা পর্যন্ত এসে আমাকে বিদায় জানাবে না?" তার স্বর কেমন যেন একাকিত্বে পূর্ণ।

ত্রিলের উত্তর—না। "শব্দ বাঁধা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

সে ভেতরে ফিরে গেল।

ত্রিল ঠিকই বলেছিল। তার পর থেকে চম্পা আহমদের সঙ্গে ত্রিল এশলের কোনো দিন দেখা হয়নি।

ছেচল্লিশ

খাড়া চড়াই, দূরে অন্ধকারে স্যানাটরিয়মের আলো ঝলমল করছে, ঠিক যেন কোনো আলোকস্তম্ভ অথবা কোনো অজানা স্কাউট ভয়ংকর পাহাড়ের বুকে আলো জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছে। আলো জ্বলছে-নিভছে তেমনি যেমন জীবন আলোকময় হয় আর নিভে যায়। আলোকময় হয় আর নিভে যায়।

বাস থেকে নেমে গৌতম নীলাম্বর আলোয় ঝলমল স্যানাটরিয়মে প্রবেশ করল। স্বচ্ছ গ্যালারি পার করে সে নির্মলার কামরায় ঢুকল।

নির্মলা তাকে দেখে খুব খুশী। একটু আগেই সে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে আবোল-তাবোল চিন্তা করে চলেছিল।

"বিবি।" গৌতমের কথা যেন কণ্ঠে আটকে গেল। স্বার্থপর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্মলা মনে মনে কার প্রতীক্ষায় লীনা?

তাকে দেখেই নির্মলা উঠে বসল। তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়া চুলের গোছা সামলে নিল। বিরক্ত হল, কাছে একটা আয়নাও নেই।

"আহা ··হা—খুব সুস্থ লাগছে তোমাকে নির্মলা—দারুণ গোলাপী· গোলাপী···।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার টেম্পারেচার চার্ট দেখলেই বুঝতে পারবে মশায়। আজও জ্বর একশ। প্রায় মাস খানেক হল, এমনিই চলছে।"

ব্যথিত মন নিয়ে সে নির্মলার পাশে বসল। নির্মলা নিজেকে খুশী প্রমাণ করবার বৃথা চেষ্টা করছিল।

নির্মলা, আমি তোর দিকে ফিরেও তাকাইনি কোনোদিন কিন্তু এখন আমার হৃদয় জুড়ে তুইই রয়েছিস!

কিন্তু ছুটো মেয়েকে সে একই সঙ্গে কি করে ভালবাসতে পারে, সে বুঝে উঠতে পারল না। চম্পা, আর এই মেয়েটি···এই মেয়েটির মধ্যে চম্পার কোনো ভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট্য নেই। সাদা-সিধে, প্রসন্নচিত্ত, সুশীলা, নিষ্কলঙ্ক মেয়ে।

চম্পা এখন 'উইমেন অফ দি ওয়ার্লড'। চিরদিনই তার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ প্রবল। সে স্বয়ং অনুভবী, বুদ্ধিমতীও তবুও সে যেন অসহায়, যেন সে পুরুষের কৃপা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ষারতা। নির্মলা আজ মৃত্যুশয্যায়—ঘরোয়া, অনুভবহীন নারী, তার আকাঙ্ক্ষা ও আশা নিয়ে নিঃশেষ হয়ে চলেছে। গৌতম চম্পাকে ভুলে যাবে। আপ্রাণ চেষ্টা করে সে গত পাঁচ বছরে চম্পাকে ভুলে থাকতে পেরেছে। একই দেশে, একই বন্ধুবর্গে থেকেও সে তার সঙ্গে দেখা করেনি। কিন্তু এখন চম্পার ডাকে সাড়া না দেবার ক্ষমতা তার নেই। এই ডাক সে ম্যাড্রিদ, রোম ও ভিয়েনার অর্কেস্ট্রায় শুনতে পায়। বর্ষার রিমঝিমে, ভোজনালয়ের কোলাহলে, এটলান্টিকের

তরঙ্গে, নিউয়র্কের জনসমুদ্রে সে তার ডাক শুনতে পায়। সে কখনো কখনো পাগল হয়ে যায়। এই ধ্বনি তাকে যেন ধাওয়া করে। নীরবতা তার কপালে যেন নেই চম্পা ধ্বনি ; নির্মলা নীরবতা। চম্পা তাকে কত কথা বলেছিল—তার সব মনে আছে। সেই সব সন্ধ্যা, দুপুর মুহূর্ত, কাল—সব কিছু যেন একটি সুরের শৃংখলা, অটল মজবুত কেননা যখন গান শেষ হয়, সুর পরিবেশে ভাসতে থাকে। সেই সুরের প্রতিধ্বনি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। নির্মলা মৌন। গোমতী মৌন। বর্ষার দুপুরের শান্তি, কুয়াশায় ঢাকা সরষে ক্ষেতের নীরবতা। নির্মলা তাকে কোনোদিন কোনো ব্যক্তিগত কথা বলেনি। চম্পার প্রত্যেক কথা, ইশারা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে এক 'মিসটিক' সম্বন্ধ কায়েম করে।

"...আমাকে একটু শান্তি দাও।" নির্মলার চেহারার দিকে ঝুঁকে গৌতম মনে মনে বলল ও তার মাথায় হাত রাখল।

"গৌতম !"

"হ্যাঁ, বিবি ?"

"সুরেখার নোতুন ফ্ল্যাট কেমন ?"

সে বিস্তারিত ভাবে সুরেখার ফ্ল্যাটের বর্ণনা দিল।

"ভাল হয়ে যাও, স্বয়ং দেখে নিও।"

"নিশ্চয়।" নির্মলা সোৎসাহে উত্তর দিল।

"আজকাল এক নোতুন অভিভাবক টাইপ লোক এসেছেন—'তুগিয়া' ভাগলপুরী।"

"হায় কি আশ্চর্য নাম। ক্র্যাক নাকি ?"

"ভীষণ।"

"চন্দ্রা আছে এখনো ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ !"

"রাত বাড়ছে গৌতম মাস্টার !" অভ্যেসমত নির্মলা কামাল ও হরিশংকরের ভাষায় বলল।

"হ্যাঁ !" সে উঠে দাঁড়াল।

"আরে-রে-রে—একটা কথা শোনো।" সহসা নির্মলা উল্লসিত

হয়ে বলল—"একটা দারুণ খবর আমাকে দাওনি তুমি।"

"কি ?"

কাল তলঅত বলছিল, ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর চম্পাবাজী কেম্ব্রিজ থেকে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। তুমি জান ?"

"না তো !" গৌতম মনে মনে নিজেকে গালাগালি দিল।

"তাই নাকি।" নির্মলা'র সহজ উত্তর। "ভেবেছিলাম তলঅত তোমাকে বলেছে। তুমি তার সঙ্গে দেখা কোরো নিশ্চয়। বেচারী।" সে বালিশে মাথা রাখল।

"সময় কোথায় নির্মলা যে আমি লোকদের সঙ্গে সোশ্যালি মিট করি !" নির্মলার দৃষ্টি এড়িয়ে সে তাড়াতাড়ি বলল—"আচ্ছা, বিবি, খোদা হাফিজ !"

সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

নির্মলা—যার ষষ্ঠ রিপু এখন জাগৃত, বুঝতে পারল, গৌতম মিথ্যে কথা বলেছে। সে চম্পাবাজীর আগমনের সংবাদ রাখে তার আরক্ত চেহারা নির্মলাকে বলে দিয়েছে যে সে চম্পার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবে।

বেড সুইচ অফ করে, বাতি নিভিয়ে সে আবার দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল।

•

গৌতম নির্মলাকে মিথ্যে বলেছিল। সেই দিন লিডহর্স্ট আসার কিছু পূর্বে তার ফোনের ঘণ্টা বাজল।

সে কণ্ঠস্বর চিনল।

"গৌতম···হ্যালো···আরে ভাই গৌতম।"

সে চুপ।

"গৌতম নীলাম্বর।" অন্য দিকে চম্পা প্রায় চেঁচিয়ে বলল—"ব্যাপার কি ? আমার কথা শুনছ ?"

"শুনছি।"

"তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত!" চম্পার কণ্ঠস্বর নর্মাল—"আশ্চর্য, এত বছর ধরে আমি এখানে আছি—তুমি একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করতে পারলে না! আমি কি খেয়ে ফেলতাম তোমাকে?" চম্পা হাসল।

গৌতম নিরুত্তর।

এত স্বপ্রতিভ হয়েও তার মুখে কথা ফুটল না।

চম্পা বলেছিল—"আমি কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে এসেছি এবং জন কার্টারের বাড়িতে উঠেছি। চলে এস কোন দিন।

"হ্যাঁ চম্পা, আমি যাব।" সে কোনোমতে উত্তর দিল।

সে কি করে জানবে যে অন্যদিকে চম্পা তার কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে মেতে উঠবে।

লিডহর্স্ট থেকে ফিরতে-ফিরতে রাত বারটা বেজে গেল। ফ্ল্যাটে পৌঁছে কম্পিত হস্তে সে ফোন উঠিয়ে জন কার্টারের নম্বর ডায়েল করল।

"হ্যালো, কে?" জনের ঘুমন্ত কণ্ঠস্বর।

"মিস-আহমদ আছেন?"

"আপনি কে বলছেন?"

"নীলাম্বর!"

ওহো! হ্যালো মিস্টার নীলাম্বর! মিস্ আহমদ এখন কোথাও গেছেন।

"ওহো!"

"কিছু জরুরী কথা থাকলে ফিরোজ, সুরেখা, জরীনা, অমলা, তলঅত—এদের বাড়িতে ফোন করতে পারেন। হয়ত তাকে পেয়ে যাবেন।"

গৌতমের ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শুনে জন বলল। "অনেক-অনেক ধন্যবাদ নীল। না, তেমন কিছু নয়। গুড্ নাইট।" সে তার মূর্খতা বুঝতে পারল। রিসিভার রেখে সিগারেট ধরিয়ে সে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

সাতচল্লিশ

"আমি একটা বই লিখব। নাম-পোট্রেট অফ এ আর্টিস্ট এজ এ ডনজোয়ান!" কামাল নাটকীয় ভাবে বলল।

সুরেখার বিশাল ড্রইংরুমের মেঝেতে তারা জমিয়ে বসেছে। বসন্ত কাল। আকাশে সূর্য, আনন্দদায়ক রোদ। সুরেখা ড্রইংরুমের দরজার কাছে বসে কিছু সেলাই করছিল। তলঅত ও ফিরোজ রান্না করতে ব্যস্ত। হরিশংকর ওয়াশিংটন থেকে কায়রো যাবার পথে এখানে থেমেছে। "হরিশংকর ও গৌতম বেশ মজায় আছে। ঈবন বতুতা হয়ে ঘুরছে দুজনে। আজ সকালে গৌতম ফোন করেছিল, সে আবার মস্কো যাচ্ছে।" গুলশন বলল।

"গৌতম হুয়েন সাং," কামাল বলল—"প্রায়ই চীন থেকে এখানে আসে।"

বাগানে চন্দ্রা মাথুর গান ধরেছে। চন্দ্রা তাদের পুরোনো বন্ধু, নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লী যাবার পথে এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে যাচ্ছে। ড্রইংরুমের অন্য কোণায় 'তুগিয়ান' সাহেব সুরেখার পতি গুলশন আহুজার সাথে কথা বলছে।

শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর রবিবার। সকাল বেলা চম্পা যখন বাসে চেপে সুরেখার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল বাসের বুড়ো কনডাক্টার তাকে দেখে হেসে বলেছিল—"মাইডিয়ার তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে! তোমার বয় ফ্রেণ্ড তোমাকে দেখে খুব খুশী হবে!"

চম্পা খুব খুশী। গতকাল গৌতম ফোনে কথা বলেছে তার সঙ্গে। অনেক বছর পর তার গলা সে শুনল।

সুরেখার বাড়ি পৌঁছে দেখল আসর প্রায় জমে উঠেছে। খুশী মনে সে সকলের সাথে কথা বলল।

"মিয়াঁ হরিশংকর—আরে ভাই হরিশংকর!" রান্নাঘর থেকে তলঅতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বাগানের দরজায় হরিশংকর দাঁড়িয়েছিল। তলঅতের ডাক শুনে

সে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। "গরম-গরম লুচি ভাজা নাও। চম্পাবাজী কোথায়? তাঁকে প্লেটটি এগিয়ে দাও।"

গুলফিশাঁ'র সেই পুরোনো পরিবেশ আমার এখানে—একদম ঘরের মত-ঘর-যা তার ভাগ্যে নেই। দরজার কাছে বসে চম্পা পুলক অনুভব করল।

প্লেট হাতে নিয়ে হরিশংকর চারিদিকে তাকাল। দূরে দরজার কাছে চম্পা বসে আছে। চম্পাকে দেখে তার সব কিছু মনে পড়ল—বোহেমিয়া এক অলস মানসিক জীবন যার মধ্যে দর্শন আছে, আছে নূতন ফরাসী সাহিত্য। কেম্ব্রিজের বাগান এবং আরও অনেক কিছু! চম্পাবাজী তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি এক কোণা থেকে অন্য কোণায় পৌঁছে গেছ। জানিনা এখন তুমি প্রাণ খুলে হাসতেও পার কিনা। সেই ব্যালেন্স এখনো তোমার মধ্যে আছে কি না। চম্পাবাজী সুরেখা তলঅত ফিরোজদের একবার ভাল করে দেখে নাও—এরা সকলে বুদ্ধিমতী। মেয়েদের মামলা আসলে বড়ই অদ্ভুত। একবারই যদি কিছু হয় তো হতে পারে, না হলে নৌকো ডুবল। "চম্পাবাজী নাও লুচি ভাজা খাও।" সে চেঁচিয়ে বলল।

চম্পার কাছে গিয়ে সে হাঁটু মুড়ে বসল।

"এদের হল কি! সব চুপচাপ কেন?" কথা বলতে বলতে থেমে 'তুগিয়ান' সাহেব গুলশনকে বললেন।

"এদের ঘাড়ে ভাব চেপেছে।" গুলশনের বেপরোয়া উত্তর।

"ভীষণ আনন্দময় পরিবেশ!" 'তুগিয়ান' সাহেব বললেন। সুরেখা দেবী কাপড়ও সেলাই করতে জানেন, আমি জানতাম না।

কামালজী লুচি খাচ্ছেন। চন্দ্রা দেবী বাগানে মুর্গী চরাচ্ছেন। তলঅতজী লুচি ভাজছেন! রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পরিবেশের সঙ্গে ভীষণ ভাবে মিলে যাচ্ছে—শান্ত কাব্যিক মধুর।

"আরে গুরুদেবের উপন্যাসও পড়েছি—!" গুলশন বিরক্ত হয়ে বলল—"তলঅত লুচি পুড়িয়ে ফেলেছ। চা পাঠাও।"

'তুগিয়ান' সাহেব আবার ধ্যানস্থ হলেন।

"হ্যালো হরিশংকর।" কাগজ পড়তে পড়তে চম্পা চোখ তুলল—"ব্যাপার কি?"

"এখন জানতে চাইছেন, ব্যাপার কি! হে ভগবান, চম্পাজী, এত অন্যমনস্কতা ভাল নয়। চা খাবেন?"

"তৈরি করে দাও।"

সে কাপ ওঠাল। চামচা মাটীতে পড়ল।

আমরা একে অপরের জীবনে মিশে বেঁচে আছি এবং লাগাতার একে অপরকে মেরে-কেটে চলেছি! "চম্পাবাজী" হরিশংকর বলল—"আমাদের মধ্যে তুমি গ্রেট, কেননা তোমার হৃদয়ে বিশাল।" সে হঠাৎ আস্তে আস্তে বলল—"শোনো, ইউ. এন. এ একটা ভাল চাকরি আছে, ইণ্ডিয়ার কোটায়, চেষ্টা করি তোমার জন্য?"

"তোমার মতলবটা কি হে? সারা জীবন আমি এভাবেই ঘুরে ঘুরে মরব?"

"এ ছাড়া আর কি করবে?" হরিশংকর বলল। তারপর হঠাৎ সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। তবু মনে মনে ভাবল, মেয়েটি বিশাল হৃদয়া, বাহাদুর। নিশ্চয় খারাপ মনে করবে না।

"অর্থাৎ" সে তাড়াতাড়ি কথা বদলাল—"তোমার মধ্যে প্রচণ্ড আত্ম বিশ্বাস। তুমি তো অন্যের মত নও চম্পাবাজী যে উনুন আর হাঁড়ি সামলাবে।" রান্নাঘরে মেয়েদের ভীড়ের দিকে সে তাকাল। "আমি বলি তুমি এভারেস্টেও চড়তে পার। তুমি সত্যিই গ্রেট চম্পাবাজী।" তার গলা কেঁপে উঠল। চম্পাকে ভীষণ করুণ আর অসহায় মনে হল।

চম্পার দৃষ্টি বাগানের দিকে।

কামরায় অন্য দিকে শোরগোল। তর্ক জমে উঠেছে।

হঠাৎ চম্পার মনে হল, শেষের সেই দিনটি হয়ত এসে গেছে। কামরা নাচছে। বাগানে চন্দ্রা বৃত্তাকারে ঘুরছে। কামরায় বসা লোকেরা পুতুলের মত এদিক ওদিক নড়ছে। 'তুগিয়ান' সাহেবকে সাদা হাঁসের মত দেখাচ্ছে। "আমি পাগল হয়ে যাব।" সে ধীরে ধীরে বলল, তার চোখে জল।

হরিশংকর আগে কোনোদিন চম্পার চোখে জল দেখে নি।

"চম্পাবাজী" সে বলল। ভালবাসাকে নিছক আবেগে বদলে ফেলবেন না। ব্যালেন্স, অনুপাত, সংযম, ক্লাসিক গ্রীক আইডিয়াল আসল জিনিস—অর্থাৎ … "

"কি আজে-বাজে কথা বলে চলেছ ?"

চম্পার হাসি পেল। "আমি ভাল বাসছি না—কোনো প্রাসাদের নক্সা তৈরি করছি।"

"চম্পাবাজী" হরিশংকরের প্রতিবাদ—"তোমার চিন্তাধারা গথিক চিরকালই ছিল। তোমার ভাবনায় বগনারের বোঝা। আগেও ছিল, এখন অনেক বেশী অর্থাৎ তুমি তোমার অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট করে চলেছ। দশ বছর কেটে গেছে কিন্তু তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আছ।"

"হরিশংকর!" চম্পা ঝুঁকে বলল—"আমাকে করুণা কোরো না। আমি আজ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিনি। আমি পরাজয় অনুভব করতে চাই।

ডাইনিং টেবিলে 'তুগিয়ান' সাহেবের কণ্ঠস্বর—"আমরা সবাই এক একটি ছায়া!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।" গুলশন বোর হয়ে সিগারেট ধরাল ও অন্যমনস্ক ভাবে চম্পাকে দেখল।

"কমিউনিস্টরা মার্কসবাদকে বরবাদ করছে।"

'তুগিয়ান' সাহেব, জন কার্টারের দিকে তাকিয়ে অন্য বিষয় ধরল।

'তুগিয়ান' সাহেব বিরাট সোশ্যালিস্ট ছিলেন। সূফীইজ্‌ম তাঁর সাইড লাইন ছিল। হিন্দী ভাষায় অনেক উপন্যাস লিখেছেন। এখন ইংরেজী ভাষায় লিখবার কথা ভাবছেন। তাঁর পুরো নাম হরবংশ রায় 'তুগিয়ান' ভাগলপুরী।

"আমার হজরত আমাকে বলল"—তিনি বলতে শুরু করলেন।

"এঁর এক মুসলমান গুরু শ্রীনগরে থাকেন।" হরিশংকর চুপি চুপি চম্পাকে বলল।

আমার হজরত আমাকে বলল—"বাচ্চা, তুই রাশিয়া চলে যা!"

"নাস্তিকদের আসল সমাজবাদের পথ দেখিয়ে আয়!" তলঅত রান্নাঘর থেকে তাঁর বাক্য পুরো করল।

"ভাই ইনি এঁর হজরতকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলেন মনে হচ্ছে। চন্দ্রা দরজার কাছে এসে বলল।

"মহিলাটি কে?" তিনি সুরেখাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মহিলাটি অত্যন্ত প্রোগ্রেসিভ কিন্তু ডলার উপার্জন করবার জন্য নিউ ইয়র্কে রেডিয়ো থেকে হিন্দী সংবাদ পড়েন। এর বাবুযান এখন এখানে পৌঁছেছে। কামালের উত্তর।

"হ্যাঁ, তা আমি বলেছিলাম আমরা সবাই ছায়া। আমি তুমি ও গৌতম নীলাম্বর। আমার হজরত আমাকে বলেছিল"—

চায়ের দ্বিতীয় রাউণ্ড চলল। সকলে একটু চাঙ্গা হল। চম্পা উঠে বাইরে বাগানে চলে গেল।

"এবার একটা খবর আমিও পরিবেশন করব। শুনেছি শান্তাও বিলের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটছে।"

তলঅত চেঁচিয়ে বলল—"ও বিলের সাথে তার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটবে।"

"অত্যধিক ইনটলেকচুয়ালরা স্ত্রী ত্যাগ করেন আর যদি তাঁর স্ত্রীও ইনটলেকচুয়াল হন তাহলে তো কথাই নেই।" কামাল বেপরোয়া ভাবে বলল।

"আজকাল এঁর ব্যাপার কি?" সুরেখা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল।

"বন্ধুবর গতকাল ব্রিল এশ্‌লেকে সুজাতা মুখার্জির বাড়ীতে দেখলাম। মনের শান্তির জন্য … ?"

তলঅত জিজ্ঞেস করল।

"আমার প্রশ্ন" ফিরোজ মেঝেতে বসে বলল—"মিডিল ক্লাস মেয়েরা এত রোমান্টিক কেন হোত?"

"হোত কি হে? এখনো তারা রোম্যান্টিক। তুমি তো এমন ভাবে বলছ যেন এটা পোস্ট রিভল্যুশন পিরিয়ড এবং আমরা শ্রেফ ঐতিহাসিকদের মত গত শতকের কথা বলছি।" তলঅত বলল।

"আমি ভাবছিলাম"—হরিশংকর কামালকে বলল—"মেয়েদের ব্যাপার বড় অদ্ভুত। ওদিকে তাকাও তিনি নতুন ব্লাউজ সেলাই

করেই খুশী। অনান্য মেয়েরা লম্বা চওড়া গল্প বলেই খুশী। অথচ মেয়েদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। সন্তান প্রসব করেই সারা বিশ্বের উত্তর দায়িত্ব এঁরা নিজের কাঁধে নেয়। বেচারী নিজেকে এক অন্য লোকের হাতে সঁপে দেয়। এঁদের হৃদয় জয় করা কত সহজ কথা। কত ছোট ছোট কথায় এঁরা খুশী। এদেরকে দেবী বানিয়ে রাখা উচিত। এদের কষ্ট দেওয়া অন্যায়।"

তলঅত হরিশংকরের দিকে এল। হরিশংকর আবার অতি-শয়োক্তির কবলে পড়েছে। তলঅত এই অতিশয়োক্তি চারিদিকে দেখতে পায়, গৌতমের চরিত্রে, চম্পার এবং আপ্পীর চরিত্রে। এরা যেন মানুষের এনলার্জড ছবি। তাই কখনো কখনো ফোকাসের বাইরে চলে আসত।

"মিয়াঁ বেশ জমাচ্ছ তো?" তলঅত বলল—"এ সব গল্প অন্য কাউকে বললেই পারতে। কোথাকার দেবী আর কোথাকার দেবতা? —কবিত্ব তুলে রাখ। আর্থিক স্বতন্ত্রই প্রধান অস্ত্র।"

"এখানেই তুমি বুঝতে ভুল কর। আর্থিক স্বতন্ত্র প্রধান অস্ত্র হলে চম্পা বেগম এখন বাগানে ঘুরে বেড়াতেন না।" শংকর বলল।

"উঁহু। তাঁর মাথা খারাপ।" তলঅত বলল।

"নিন, এত যোগ্য মেয়ে কেম্ব্রিজে সবাইকে মাতিয়ে এসেছে, আর তাছাড়া ওকে একবার দেখলেই সবাই প্রেমে পড়ে যায়। আপনি ওকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছেন।"

"কি ব্যাপার, কমিউনিস্টরা কী প্রেম করে না?" 'তুগিয়ান' সাহেব গুলশনকে জিজ্ঞেস করল।

"যত সব।" তলঅত রেগে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

"বিবি!" হরিশংকর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে বলল ও এখন নির্মলার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। তুমি আরও পড়। পি· এইচ. ডিও করে নাও। কে বলে আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন নেই? মন খারাপ করো না।"

"পি. এইচ. ডি করে কি আর হবে। তিনশো টাকার চাকরি—মাত্র তিনশো টাকা।" হরিশংকরের নাকের ডগায় তিনটে আঙ্গুল মেলে ধরল।

"টাকাই কি সব? নূতন হিন্দুস্থান! দেশ গড়ার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।"

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে চম্পা একবার ঘরে উঁকি দিল। সবাই কথা বলতে ব্যস্ত। সে পথে বেরিয়ে এল।

আটচল্লিশ

বরফ পড়ছে। সুজাতা দেবী জানালা বন্ধ করলেন।

স্বামী দেবিকানন্দ গীতার পৃষ্ঠা বন্ধ করে জনসমুদ্রের দিকে তাকালেন। ইনি কামাল ও হরিশংকরের সেই প্রফেসর—যিনি আজ থেকে তের-চৌদ্দ বছর আগে লার্মাটিনেয়ার কলেজ লক্ষ্ণৌ থেকে হঠাৎ গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন। এখন ইনি গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে, দাড়ি রেখে ইয়োরোপ ও আমেরিকা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ও ভাষণ দিচ্ছিলেন।

সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটে পৌঁছে গৌতম দেখল, স্বামীজীকে ইংরেজ মেয়েরা ঘিরে রেখেছে ও সুজাতা মুখার্জি কফি পরিবেশন করতে ব্যস্ত।

সেই দিন সকালে গৌতম মস্কো থেকে ফিরেছে। কামাল তার কেয়ার আফ, হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গায় আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে গৌতমের টেবিলে সেইসব চিঠির উত্তর হাজির। খামগুলো না খুলেই সে কামালকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সুরেখা বাড়ী গিয়ে সে জানতে পারল, কামাল ও হরিশংকর নিজেদের পুরাতন অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে সুজাতা দেবীর বাড়ী গেছে। কিন্তু এরা এখানে নেই। ভেতরে গিয়ে এক কোণায় সে মাইকেলের কাছে বসে গেল।

"ভাই, তোমার স্বামীজীকে আমার নিতান্ত ফ্রড মনে হচ্ছে।" মাইকেল বলল। "জানতে পেরেছি, ধর্ম প্রচার করবার জন্য আমেরিকা এঁকে টাকা দিচ্ছে এবং কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম-এর হয়ে এঁকে ট্যুরে যেতে বলা হয়েছে।"

"তুমি এখনো ইসরায়েল যাও নি ?" গৌতম জিজ্ঞেস করল।

"ব্যস, এবার যাব।"

"সকলে যাচ্ছে।" সুজাতা দেবী মাইকেলের কথা শুনে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন—"নমস্কার, মিস্টার নীলাম্বর।" তিনি বললেন।

"নমস্কার সুজাতাদিদি।"

হাতে অনেক ফুল নিয়ে নার্গিস ঘরে এল—"আলোয় ফুলের রং লাল দেখাচ্ছে। ভেবেছিলাম, এগুলো হলুদে ফুল।" সে স্বামীজীর সামনে ফুল রেখে বলল।

"নার্গিস !" গৌতম বিমর্ষ হয়ে বলল—এ সব ঢং কেন ?

"গৌতম, এসব কালচারের জন্য।" বিজ্ঞের মত সে জবাব দিল।

"কামাল কোথায় ?"

"তারা সম্ভবত লিডহার্স্ট থেকে ফেরে নি।"

"লিডহস্ট ···।" গৌতম রোমাঞ্চ অনুভব করল—"কিন্তু আজ তো রবিবার নয়।"

"হ্যাঁ, কিন্তু নির্মলার দ্বিতীয় ফুসফুসের অপারেশন হয়েছে। তুমি জান না ? ও হ্যাঁ, তুমি তো আজই বাইরে থেকে ফিরেছ।"

সকলেই ফিরে চলেছে—সবাই নিজের নিজের ইসরাইলে ফিরে চলেছে।" সুজাতা দেবী আধবোজা চোখে বললেন—"তোমাদের পুরো পার্টি হিন্দুস্থান ফিরে যাচ্ছে—নার্গিস আজ আমাকে বলল। মাইকেলও চলেছে।"

"সুজাতা দেবী, এই তো দুনিয়ার নিয়ম।" গৌতম বলল – "লোকের যাওয়া-আসা তো লেগেই আছে।"

"আমি জানি, আসা-যাওয়া লেগেই আছে। সত্যি বলতে কি লোকদের যাওয়াটাই সত্য।" এরপর সে নিশ্চয় গুরুদেব টেগোরের উপমা টেনে আনবেন। গৌতম তাড়াতাড়ি উঠল। "নার্গিস ?" সে ফিরে বলল—"কামালকে ভীষণ ভাবে খুঁজছি। তার কিছু প্রয়োজনীয় চিঠি আমার কাছে আছে।"

"বি. বি. সি. ক্যান্টিনে দেখে নাও অথবা 'চিকেন-সরাই'এ দেখ—তাদের সবাইকে পাবে। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করে যাও।"

গৌতম দ্বিতীয়বার ঝুঁকে সবাইকে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে গেল। 'চিকেন সরাই' প্রায় জনশূন্য। একটি মেয়ে দরজার দিকে পিঠ করে বসে কফি খাচ্ছে। গৌতম ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞেস করবার জন্য কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল, বি. বি. সি. ওয়ালা এদিকে তা আসেনি। স্টুল ওয়ালী তাকে ফিরে দেখল। সে চম্পা আহমদ।

"হ্যালো, তুমি এখানে!" গৌতম বলল।

নিজের জায়গা ছেড়ে সে পাশের একটি স্টুলে বসল। "তুমিই তো বলেছিলে পৃথিবী অনেক ছোট। কোথাও না কোথাও আমাদের দেখা হবেই।"

"এখন আর তেমন ছোট নয়।" গৌতমের এই হেঁয়ালী ভাল লাগল না—"প্রত্যেক কথার লিটেরাল অর্থ টেনে বার করা সম্ভবত খুব জরুরী নয়।"

"কথাকে তুমিই তো লিটারেল মনে কর।"

"কি ভাবে?" গৌতমের দৃষ্টি কামালকে খুঁজছে।

"একবার তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। অত্যন্ত অ্যাব্‌সট্রাক্‌ট কথা। তুমি একে বস্তুর দিকে টেনে নিয়ে গেলে। সব দোষ তোমার।" সে একটি আঙুল তুলে বলল। অ্যাব্‌সট্র্যাক্‌ট আলোচনা কোরো না।" গৌতম অত্যধিক বিরক্ত হয়ে বলল—"সুজাতা দেবীর বাড়িতে স্বামী দেবিকানন্দকে দেখে এসেছি। তুমি কামালকে দেখছ।"

"না!" চম্পা ভাবল এই লোকটি প্রতি মুহূর্তে কেমন রং বদলায়। "তুমি আমাকে ফোন করেছিলে, সেই দিন, জন কার্টারের বাড়িতে, ইউরোপ যাত্রার আগে।"

"হ্যাঁ, করেছিলাম।" এই ভাবে ধরা পড়া গৌতমের পছন্দ হল না। "কেননা তুমি কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে আমাকে ফোন করেছিলে।"

গৌতম, তুমি প্রত্যেক কথায় তেড়ে আসছ কেন। আগে তুমি তো এরকম ছিলে না। প্রায় সাত বছর পর তোমার সাথে দেখা। ভদ্রভাবে কথা তো বলতে পার।" "চম্পা!" গৌতম বলল—"আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। কামালের কয়েকটা জরুরী চিঠি আছে। দু'এক

দিনের মধ্যে তাকে সম্ভবত দিল্লী যেতে হবে। নির্মলার দ্বিতীয় অপারেশন হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি তোমার স্বপ্ন নিয়ে মেতে আছে। পৃথিবী তোমার স্বপ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কি করে চলতে পারে !"

"আরে !" সে তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল। "চল, কামালকে খুঁজে বের করি।" গৌতম তাকে দেখল। মেয়েটি বড় অদ্ভুত।

সে 'সরাই' থেকে বেরল এবং সুরেখার বাড়ীতে ফোন করল। গুলশন উত্তর দিল—"কামালের খবর সে জানে না। নির্মলার রিপোর্টের জন্য সম্ভবত স্যার রোজারের বাড়ি গেছে। সুরেখা এখনো রাডা১ থেকে ফেরেনি। কামাল বলেছিল, স্যার রোজারের বাড়ি থেকে সে আমাদের এখানে আসবে। তুমি চলে এস। আমি কলেজ যাচ্ছি। বাড়ীর চাবি প্রতিবেশীকে দিয়ে যাচ্ছি।"

"কেউ লিডহার্স্ট গেছে ?" গৌতমের প্রশ্ন।

"তলঅত ও হরিশংকর গেছে। তুমি যদি যাও, আমার বাড়ি থেকে একটা পার্সেল নিয়ে যেও। নির্মলাকে দেবার জন্য সুরেখা ডাইনিং টেবিলের ওপরে রেখেছিল। তলঅত ভুলে ফেলে গেছে।"

"আচ্ছা, আমি আসছি।"

তারা সেণ্ট জন্স উডের দিকে রওনা হল। আশার বাড়ি থেকে নিয়ে তারা সুরেখার ড্রইংরুমে ঢুকল এবং বাগানের দিকের বড় কাচের দরজা খুলল। অল্প রোদে বরফ চকচক করছে।

"সুরেখা ও গুলশনের বাড়িটি চমৎকার।" সোফায় শুয়ে শুয়ে গৌতম বলল। বাগানের দেওয়ালের ওপার থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছিল। চম্পা ফায়ার প্লেসে আগুন ধরাল।

কামরার এক ধারে বইয়ের র‍্যাক। ঘরে চারিদিকে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের চিহ্ন। দেখেই বুঝতে পারা যায় এটা শিল্পী ও নর্তকীর কামরা। একধারে সেলাই মেশিন ও তরকারির ঝুড়ি। এটা শিল্পীর বাড়ি কিন্তু এখানে বেশ আরামে সময় কাটানো যায়। জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ ও সৌন্দর্য সে খুঁজে বেড়ায়। "আমি এখানে অনেক সুন্দর মুহূর্ত কাটিয়েছি।" সে বলল।

(১) রয়েল একাডেমী অফ ড্রামাটিক আর্ট

"এরা বড় ভাল লোক, না?" সে বলে গেল। "ঘর দেখে গৃহবাসীর ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারা যায়। ভেবে দেখ ব্যাপারটা।" সে উঠে বসল। "আস্টরলীতে জরীনার বাড়িও আর্টিস্টের বাড়ি। সেণ্ট জর্জ উডে কামাল রুলঅস্তের বাড়িকে 'গুলফিশাঁ'র একাংশ মনে হয়। সুজাতা দেবীর ড্রইংরুম সব কিছু কেমন যেন মেকি-মেকি!"

"তুমি মেকি আর আসলে তফাৎ বুঝতে পার?" চম্পা তার কথা কেটে বলল।

"না চম্পা!" সে বলে গেল। "আমরা কখনো আমাদের ব্যাক-গ্রাউণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি না।" সে থামল। "অথচ আশ্চর্য আজ পর্যন্ত আমি তোমার আসল ব্যাকগ্রাউণ্ড দেখতে পেলাম না। 'চিকেন সরাই'য়ের স্টলে বসা তোমাকে দেখে একদম মনে হচ্ছিল না যে তোমার বাড়ি বেনারসে। আমাদের ব্যাকগ্রাউণ্ডের প্রতি আমাদের স্নেহশীল থাকা উচিত। তুমি তা নও।"

"ভুল বলছ!" চম্পা রেগে গেল। "তোমরা সবাই দূরে সরে গেছ। আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি। চিরদিনই ছিলাম, আজও তাই আছি অথচ তোমার অভিযোগ, আমি স্নেহশীল নই।"

"তুমি জান চম্পা" গৌতম বলল, "গত বছর আমেরিকা থেকে আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। সেখানে দেবদারু গাছের নীচে বসে আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। তখন, জানিনা কেন, সব কিছু ভীষণ আনন্দময় মনে হত! সব সময় খুশী-খুশী ভাব। এই হঠাৎ খুশী-খুশী ভাবের কারণ আমি এখনো বুঝতে পারিনা। যাক্ তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি। হয়ত তুমি পাওনি।"

"আমি তোমার কোন চিঠি পাইনি।"

"আবার রোম্যান্টিক হয়ে পড়ছ!"

পাশের আশার বাড়িতে কেউ উঁচু স্বরে গান ধরেছে।

"গৌতম, অভদ্রতা কোরো না!" তার চোখে জল। "কাঁদছ কেন ভাই! জীবনটাই তো অশ্রুদিয়ে লেখা, আবার তুমি কাঁদছ! হাস চম্পা। ভাইয়া সাহেবকে দেখ। আজ তাঁকে দেখলাম, পাশে

তাঁর বেগম। তাঁর চোখ মুখে খুশী ঝলমল করছে। ভাইয়া সাহেবরাই সুস্থ মস্তিষ্কের লোক।"

"বাজে কথা ছাড়!" চম্পা ফায়ার প্লেসের আগুন ঠিক করল।

গানের সুর আরও উঁচু পর্দায় উঠল।

"জানালা বন্ধ করে দাও।" গৌতম বলল।

"হ্যাঁ।" চম্পার উত্তর—"সারা রাত হই-হুল্লোড় চলতে থাকে। এদের আর যেন কোনো কাজ নেই।"

"আরে, রে!" গৌতম চমকে উঠল—"সেখানে সম্ভবত কামালও পৌঁছে থাকতে পারে। এরা কেন রাত জাগছে?"

"কাল সকালে এরা বুডাপেস্ট যাচ্ছে।"

"গান শুনে আমি কেমন যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করি চম্পা বেগম।"

"ওহো: আমি ভুলে গিয়েছিলাম কমরেড গৌতম! কিন্তু তুমিই তো জানালা বন্ধ করতে বলেছিলে।"

তারা এখন 'বোঝ উঠালো—হইয়া, হইয়া' গাইছিল! গৌতম বাইরে এসে বাগানের দেওয়ালের ঐ পারে উঁকি দিল। "না, কামাল নেই।"

"গৌতম মাস্টার!"

"বল ভাই!"

"আমি কি খুব বোকা?"

"না তো! অবশ্য এমন কিছু চালাকও নও।"

ব্যাস, আমি এটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। "এবার আর কোনো চিন্তা নেই।"

"চা তৈরি করতে পারলে ভাল হত।" কিছুক্ষণ পরে গৌতম বলল। চম্পা চুপচাপ রান্না ঘরে গেল। "চম্পারাণী!" গৌতম রান্না ঘরের দরজায়। "তোমাকে কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছে।"

"আর কি করব—নাচব?"

"এটা কোনো উত্তর হল? তুমি তো একদিন চটপট জবাব দিতে পারতে।"

"তলঅত এখানে নেই, থাকলে রান্না করে তোমায় ভাল-মন্দ খাওয়াত।"

"চম্পা, আজে-বাজে কথা না বললেও চলে।" কেটলী ওঠাতে-ওঠাতে চম্পা বলল—"গৌতম, তুমি যদি চাও, আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব, আর কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব না। ভুল আমারই। এত বছর ধরে তোমাকে আবার দেখবার আশা মনে পোষণ করেছিলাম!"

"চম্পারাণী!" গৌতম রান্নাঘরে একটা টুলের ওপর বসল।" আসল কথা জানতে চাও? আসলে আমি নিজেকেই ভয় পাই। বুঝতে পারছি না তোমার সঙ্গে কি কথা বলব, তোমার কাছ থেকে কি শুনব এবং তোমাকে কি শোনাতে চাই! এত সময় কেটে গেছে, স্বভাবতই, আলোচনা করার এমন কোনো বিষয় নেই, যা আমাদের দুজনেরই ভাল লাগবে।"

সে ড্রইংরুমে চা নিয়ে এল।

"এদিকে এস!" গৌতম প্রায় কঠোর স্বরে বলল। নেহাৎ কোনো কথা বলবার জন্য গৌতম চেয়ারে রাখা একটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল—"চমৎকার। কাগজপত্র এই ব্যাগে রেখে দিই?"

"রেখে দাও।"

সে খামগুলো ব্যাগে রাখল।

আবার নীরব।

"এই ব্যাগে তোমার জিনিস রাখা আছে তো? সে গলা পরিষ্কার করে বলল—"যাবার সময় খামগুলো বের করে দিও। নয়তো সব গোলমাল হয়ে যাবে।"

"ব্যাগটি আমার নয়," চম্পা অসংলগ্নভাবে বলল—"সুরেখার। তুমি যা ইচ্ছে তাই রাখতে পার এই ব্যাগে, বাড়ীও নিয়ে যেতে পার। আমার ও তোমার কোনো কিছুই আমাদের নয়—ব্যাগ নয়, কাগজপত্র নয়, বাড়ীও নয়…এমন কি স্মৃতিও নয়—কিছুই নয়; আমাদের আর কিই বা রইল গৌতম যা আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি।…আছে, হয়ত শুধু দুঃখ আমাদের দুজনেরই কপালে

লেখা কিন্তু তুমি স্বার্থপর, দুঃখ নিজের কাছেই রাখতে চাও।"

গৌতম মৌন।

"তুমি কি জান গৌতম নীলাম্বর, গত সাত বছর ধরে আমি তোমাকে দেখিনি, কিন্তু আমি জানি, তুমি সব সময়, জেগে ঘুমিয়ে, উঠতে-বসতে, নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছ।"

"ঠিক আছে! আমার মনে হয়, আমার কথা শোনবার কোনো লোক নেই···হয়ত আছে, আমার কনফেসর। আমার বিবেক আমার কনফেসর। আমি অনেক খুন করেছি। তোমাকে শেষ করেছি। আমার অপরাধ তোমার অপরাধের চেয়ে স্বতন্ত্র। তোমার মধ্যে কোমল অত্যাচার লুকিয়ে আছে। একটা কথা বল," সে থেমে বলল—"পাপ কাকে বলে জান?"

"কাউকে কষ্ট দেওয়া।" চম্পা ভেবে উত্তর দিল।

"এবং?"

"পাষণ্ড।"

"এবং?"

"এবং···এবং, অভদ্রতা।"

"সাণ্ডে স্কুলের পাঠ।"

"কি বললে?" চম্পা তার কথা ভালভাবে বুঝতে পারেনি।

"আমি কষ্ট দিয়েছি। তোমার চোখে এটা পাপ?"

"বিরাট।"

"চম্পারাণী, তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে, পথ চলতে-চলতে এমন অনেক মোড় আসে যখন অন্যকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

"খুনীও খুন করার সময় ভাবে, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তা না হলে সে খুন করে কেন?" গৌতম কথা বলল না।

"সুর উঁচু-নীচু হয়ে যাচ্ছে!" কিছুক্ষণ পর সে বাইরের দিকে কান পেতে বলল—"হারমনি'র দিকে এগোতে-এগোতে থেমে যাচ্ছে।" পিয়ানোর পর্দায় তার আঙুল।

"পিয়ানোর একটা সুর ভেঙ্গে গেছে।" চম্পা বলল।

"আমি জানি। প্রায়ই ইঁদুর বাসা করে পিয়ানোয়। বহরাইচে আমার পিয়ানোয়, প্রায়ই মাঝরাতে একটা মোটা ইঁদুর তারের ওপর দৌড়ে দৌড়ে সিম্ফনী বাজাত।"

"বহরাইচের কথা তুমি আমাকে কখনো বলনি।"

"চমৎকার জায়গা, আমার বাড়ী।"

"আমরা সবাই একে অপরের দয়ায় অথবা করুণায় বেঁচে আছি। সময়ের নাগপাশ আমাদের বেঁধে রেখেছে। এ সব ভাবলে রাগ হয়।" সে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল।

বাগানে ফুলের ওপর জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে।

"এই জুতো দেখ।" গৌতম হঠাৎ একটা পা এগিয়ে দিয়ে বলল। "এর মত জীবন ঠিক খাপে বসে না।" তারপর একটা কাঠের টুকরো সে জানালায় বসে থাকা বেড়ালের দিকে ফেলল। বেড়াল কাঠের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছেড়ে দিল।

"বেড়ালটা মনে হয় 'বোহেমিয়ান'।" তারপর সে চম্পাকে বলল— "এতদিন ধরে বেকার আমার জন্য অপেক্ষা করলে চম্পা। আমি একটা বোগাস লোক।" আগুনের কাছে বসে থাকা চম্পাকেই তার অর্থহীন মনে হল। অর্থহীন, বেকার ও বোকা। আমার মত পাগলের আশায় বসে থাকার কোনো মানে হয়? অত্যন্ত বোকা ও অসহায় মেয়ে। বুর্জোয়া দার্শনিক। এর মাথার অস্ত্রোপচার করলে অনেক অপ্রয়োজনীয় মাটি পাওয়া যাবে। হাজার বছরের পুরোনো মাটি—টেরাকাটা।" তদঅত অনেক বিখ্যাত লোকের মাথা গড়েছে।—সে উঁচু স্বরে বলল—"তুমি তোমার মাথা তাকে দিয়ে গড়িয়ে নিতে পার। এখনো সময় আছে। তুমি কোথাও যাচ্ছ না তো?" গৌতম জিজ্ঞেস করল।

"এখন নয়। আমরা একটা দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম। ফিরে যাবার সব দরজা বন্ধ হয়েছে।"

"তোমার নিজেকে এত নিরীহ মনে করা উচিত নয়। প্রত্যেকবার তুমি ধরা পড়ে যাও। তোমার মনে হতে পারে, তুমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ তাই সব ব্যাপারই খুব সহজ সরল। তোমার ধারণা

সম্ভবত ভুল। তোমাকে এখনো অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।"

সে জানালার কাছে দাঁড়াল। মুহূর্তগুলো ঘুরছে, চক্কর কাটছে, নাচছে। চম্পা মৌন, স্থির হয়ে আগুনের কাছে বসে রইল। সময়ের আবর্ত দূরে—আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ল—শেষ হয়ে গেল। শেষ বরফের টুকরোর উপর আছড়ে পড়া আলো কামরায় ছড়িয়ে পড়ল। প্যাটার্ণ বদলে গেল। কামরার প্রয়োগে বেড়ালও আছে। হাওয়াও জানে। বহুদূরের পথ, মোটর, দোকান—সকলে জেনেছে।

'সব কিছুর অস্তিত্ব কয়েকবার পড়া একটি বইয়ের মত। শেষ পর্যন্ত আরও কয়েকবার পড়তে হবে'—চম্পা মনে মনে বলল।

"আমার সঙ্গে সব সময় দুটি পৃথিবী রয়েছে। একটি পৃথিবীতে অন্যরা সবাই রয়েছে। আর একটিতে শুধু তুমি আর আমি। আমাদের মাঝখানে একটা সেতু। যেদিন এই সেতু ভাঙবে সেদিন কি হবে?"

"তুমিই এই সেতু ভাঙবে।"

"না—লোকেরা চারিদিকে মেসিনগান লাগিয়ে রেখেছে। কামান লুকিয়ে রাখা হয়েছে ঝোপে। আমার মনে হয় একদিন এই পৃথিবী পাতালে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমি একলা বাইরে হাত পা ছুঁড়তে থাকব। এসব ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।"

"তুমি তোমার স্পটলাইট নিয়ে স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছ। যখনই কোনো ভাগ্যহীন স্টেজে এসে পড়ে, তুমি ছোটলোকের মত তার দিকে আলো ছড়িয়ে দাও।"

"আমি নিজে সেই প্রখর আলোয় দাঁড়িয়ে আছি।"

"না, তুমি পর্দার পিছনে লুকিয়ে আছ। কোনোদিন কোনো টর্চলাইট তোমার মুখে পড়লে কি হবে? সেইদিন তুমি দৌড়ে পালাবে। জানালায় তুমি তোমার পরিচিতদের মুখ দেখবে। এই ভবঘুরে বেড়ালের মত, পা টিপে-টিপে তুমি আসবে। জানালার কাছে তোমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব—বোগীম্যান।"

"আর সেই সময় তুমি আমায় জানালায় উঁকি দিতে দেখবে—যোগীম্যান!"

তারা আর কোনো কথা খুঁজে পেলনা।

সে ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখল। তারপর জানালার দিকে চলে গেল।

"আজ ভীষণ বরফ পড়েছে।" জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৌতম একটা জেনারেল স্টেটমেণ্ট দিল।

"আরও পড়বে। এরপর বরফ মৃত্যু পর্যন্ত, অনন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।" চম্পা মনে মনে বলল।

"সুরেখার বাগান কত সুন্দর।" গৌতমের দ্বিতীয় স্টেটমেণ্ট।

"আমি ভাগ্যহীনা।. শুনেছি কিছু কিছু লোকরা ভাগ্যবান।" চম্পা নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

হঠাৎ গৌতম চমকে উঠল। সারাদিন কেটে গেছে, সূর্য ডুবেছে, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। আমি এখনো এখানে। "আমি এখানে আমার অমূল্য সময় কেন নষ্ট করছি?" তার রোগ সে গ্যালারী'র দিকে এগিয়ে গেল। ডাইনিং টেবিলে রাখা পার্শেল হাতে নিল ও প্রায় দৌড়ে বাইরে এসে মোটরে লিডহর্স্ট রওনা হয়ে গেল।

গৌতম চলে গেলে, চম্পা ব্যাগ থেকে কামালের নামে লেখা লম্বা লম্বা সরকারী খাম বের করল। গৌতম ভুলে ফেলে গেছে। সে চিঠি খুলল।

প্রত্যেকটি টাইপ করা চিঠিতে কামালের চাকরির আবেদনের উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

ঊনপঞ্চাশ

"তলঅত—চা" চন্দা চেয়ারে বসে বলল।

তলঅত চা ঢালল।

সুরেখা মনোযোগ সহকারে রেডিও টিউন করছিল। বাগানের দরজা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে সকালের নরম রোদ। সুরেখা সেখানে ইজেল রেখে একটা ছবি আঁকতে শুরু করল। প্রতিবেশী জানালা দিয়ে উঁকি মেরে একটু চিনি চাইল।

সংসারের সব কাজ গতানুগতিকভাবে চলছে। নির্মলার মৃত্যুর পর সংসারের কাজ সম্ভবত আরও শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। সবাই ব্যস্ত। এত ব্যস্ত সম্ভবত এরা কখনই ছিল না। তলঅত কাগজে রিপোর্ট লিখত, ফিরোজ বই বগল দাবা করে রোজ বিশ্ববিদ্যালয় যেত। কামাল, সুরেখার ড্রইংরুমে আধশোয়া অবস্থায় আবেদনপত্র লিখে যেত, একটার পর একটা। হরিশংকর এক নতুন কাজে ব্যস্ত।···সে পাখির পালক কুড়িয়ে বেড়াত।

দশ দিন হল নির্মলা মারা গেছে। কিন্তু এদের দেখে মনে হয় নির্মলা কয়েকশো বছর আগে মারা গেছে। সময় রবারের টুকরোর মত এগিয়ে চলেছে।

যখন রবারের এই টুকরোটি ছিঁড়ে যাবে, সেদিন কি হবে?

"নির্মলার ত্রয়োদশীর জন্য চিন্তা করা উচিত।" পাখির পালক নাড়তে-নাড়তে শংকর এমনভাবে কামালকে বলল, যেমন বলত— "এবার আমাদের নির্মলার বিয়ের জন্য চিন্তা করা উচিত।"

"সম্ভবত হ্যাঁ!" কামাল আস্তে আস্তে বলল।

"এখানে কোনো পণ্ডিত থাকলে জানতে পারা যেত, আজ আমাদের কি করা উচিত।" তলঅত হরিশংকরের মত অসংলগ্নভাবে বলল। জীবনের ভাল মন্দের পাট চুকিয়ে নির্মলা চলে গেছে। তবু তার কাজ হয়ত এখনো বাকি—মৃত্যুর পরের কাজ।

ফোন বেজে উঠল।

সুজাতা দেবী জিজ্ঞেস করছিলেন। তোমরা ত্রয়োদশীর ব্যবস্থা না করে থাকলেও চিন্তা নেই। স্বামী দেবিকানন্দজী বলছিলেন যে তাঁর সেণ্টারে…

"আজ্ঞে হ্যাঁ"…ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।" কামাল রিসিভার রেখে দিল।

মৃত্যুও স্বামী দেবিকানন্দের মত ক্রুড।

আবার সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। তলঅত একটা প্রবন্ধ টাইপ করতে লাগল। সুরেখা গ্যালারীতে নাচের রেওয়াজ শুরু করে দিল। হরিশংকরের পালকের এলবাম দেখতে লাগল।

সময়ের নীরবতা কামানের গুলির মত গর্জে উঠল। তিনটে বাজল। কামাল চোখের ভাষায় হরিশংকরকে বলল "ডেথ সার্টি-ফিকেটের জন্য স্যার রোজারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন।" "নিয়ে এস।" হরিশংকর ঠিক সেইভাবেই উত্তর দিল। "লিডহর্স্ট থেকে নির্মলার জিনিষপত্র আনতে হবে।" তলঅতরে শুধাল।

"কিন্তু আমরা লিডহর্স্ট কি করে যাই?" কামালের বিরোধ।

হরিশংকর এই মূক ভাষাকে ডি-কোড করল—হ্যাঁ, আমরা লিডহর্স্ট যাব। চল, আমরা মার্চ করি, অস্ত্র-শস্ত্র সামলাই, লিডহর্স্ট রওনা হই। নির্মলার অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ নিয়ে আসি. তার এসবের প্রয়োজন নেই।

তারা দল বেঁধে লিডহর্স্ট রওনা হল।

এখন শেষবারের মত তারা লিডহর্স্ট ছেড়ে আসছে।

সেণ্ট জজ উডে পৌঁছে কামাল নির্মলার জিনিসপত্র গেস্ট হাউসে রেখে দিল, যেখানে হরিশংকর উঠেছে।

সবাই যখন ফিরে গেল, তলঅত চুপি চুপি গেস্ট রুমে ঢুকল।

হরিশংকরের পালকের এলবাম একপাশে রাখা। কামরায় রাখা সব কিছু ল্যাম্পের আলোয় উদ্‌ভাসিত। আবলুসের ফার্নিচার, ভিক্টোরিয়ান ঢংয়ের উঁচু সাইন বোর্ড, একশ বছর পুরোনো তাম্রমূর্তি; পুরোনো সংবাদপত্র-পত্রিকা! প্রায় জীর্ণ এক সোফা।

তার পায়ের কাছে নির্মলার জিনিসপত্র। চারি পাশে ছড়ানো

তাদের পুরোনো আসবাব। অর্থহীন, মূল্যহীন। যেন নির্মলার জীবন এক কাবড়ীর দোকান। এসব জিনিস একবার বিক্রী করে দেখ। নিজের জীবনকে একবার কাবড়ী মার্কেটে নিয়ে যাও। দাম নিশ্চয় পাবে। দাম—মৃত্যু।

মৃত্যু! হঠাৎ তার কানে আবার একটি কামান গর্জে উঠল। মৃত্যু!

এক কোণায় একটি ছোট পাত্রে নির্মলা শ্রীবাস্তবের চিতাভস্ম। হরিশংকর এই চিতাভস্ম দেশে নিয়ে যাবে, গংগায় বিসর্জন দেবে। কামালের সাথে সে বেরিয়েছে—নির্মলার মৃত্যুর শেষ লৌকিকতা সারতে। শেষ লৌকিকতা—ডেথ সার্টিফিকেট, গীতা পাঠ, প্লেনের টিকিট।

প্রত্যেক জিনিস যথার্থ। এই পাত্রটিও তেমনই যথার্থ যেমন চেয়ার, টেবিল, সোফা। কোন্ মূর্খ বলে, মৃত্যু মানুষকে এক আলাদা জগতে নিয়ে যায়?

মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য, সেকেণ্ড রেট জিনিস আর কি হতে পারে?

ভেবে দেখুন, অন্যের মৃত্যু দেখে মানুষ কান্নাকাটি জুড়ে দেয় অথচ একদিন তাকেও মরতে হবে।

আমি বলি, কান্না কেন? নির্মলার জন্য অশ্রু বিসর্জন করার কোনো অর্থ নেই। একটি ইডিয়ট মেয়ে। এখান থেকে চলে গেল। এমন কিছু অসাধারণ জীবনযাপনও করতে পারেন নি। আপনি! জীবনের যে কটা দিন পেয়েছিল—পরিশ্রম করে কাটাল। ফার্স্ট ডিভিসন পাবার জন্য রাত জেগে পড়া। তারপর দেশ এবং বিশ্বের মঙ্গল কামনা। প্রত্যেক তর্কে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত। ফার্স্ট ক্লাস পাবার পর কেম্ব্রিজ আসার জন্য বাড়ীতে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল মেয়েটি। তার বাবা অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে মেয়েকে বিলেত পাঠালেন। আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলো মেয়েটি এখানে এসে। কয়েকদিন বিশ্বাসই করতে পারল না, সে কেম্ব্রিজে। প্রোগ্রাম—এখান থেকে লেখাপড়া শেষ করে একটা ভাল চাকরি যোগাড় করতে হবে, বাবার ধার শোধ করতে হবে, ভইয়নের জন্য

বৌ যোগাড় করতে হবে। পয়সা জমা করে আডটার মঙ্গোলিয়া ও ম্যাক্সিকো বেড়াতে যাবেন। মনে মনে ক্ষীণ আশা—একদিন নিজের একটি বাড়ী হবে, একটা ছোট বাগান ···। মেয়েটির ভবিষ্যত চিন্তা এইটুকুই।

কেম্বিজে প্রায়ই তাঁর জ্বর আসত। তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হল। কয়েক বছর সেখানে কাটাবার পর তিনি একদিন তাঁর শরীর ত্যাগ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিলেন।

বাঁধাধরা এই মৃত্যুর জন্য কান্নাকাটি করা কি যুক্তিযুক্ত! নিশ্চয় না। তলঅতের হাসি পায়। অতীতে এর চেয়ে বড় কৌতুক আর সে পায়নি।

সে কামরায় এক চক্কর ঘুরল। ফ্ল্যাটের এক কোণা থেকে অপর কোণায় ঘুরে বেড়াল। বাগানের ধারে রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। জানালায় চন্দ্রা ও সুরেখার ছায়া। ঘুরে ফিরে সে আবার হরিশংকরের কামরায় এল। মেঝেতে বসে নির্মলার জিনিষ একটা জায়গায় জড়ো করতে চাইল। আনমনা ভাবে বই খাতা-পত্র উলটাল। বইয়ের বাক্সের ওপর গীতা রাখা। হাতে গীতা নিয়ে সে ড্রইংরুমে এল। ল্যাম্প জ্বালিয়ে সে পড়তে শুরু করল :

"······সাহস যুগিয়ে কষ্ট সহ্য কর!"

"শরীর নশ্বর, কিন্তু শরীরের ভেতর যে আত্মার বাসা, সেই আত্মা অমর। অতএব যুদ্ধ কর। আত্মাকে কেউ বধ করতে পারে না। অস্ত্রাঘাতে আত্মা নিহত হয় না। অগ্নি, বায়ু, জল আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না। জন্ম নিলেই মৃত্যু অনিবার্য! তেমনিই মৃত্যু হলেই জন্ম অনিবার্য। এর জন্য দুঃখ করার কি আছে?"

"সুখ ও দুঃখ, লাভ-হানি, হার-জিৎ সব অবস্থায় সমানভাবে তুমি যুদ্ধ কর।"

"ইডিয়ট।"

সশব্দে বই বন্ধ করে সে উঠল। আবার গেস্ট রুমে ঢুকল। মেঝেতে বসে নির্মলার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করল— শাড়ী, জুতো, চুড়ী, মেক-আপের জিনিস, হ্যাণ্ড ব্যাগ, যার মধ্যে

আজে-বাজের জিনিস ভরা অর্থাৎ বাসের টিকিট, লণ্ড্রীর বিল, পুরোনো খালি লিপ্‌সটিক, ইয়ার রিং, পিন, পয়সা ইত্যাদি। সব কিছুই কিন্তু চার বছর পুরোনো। তলঅত নির্মলার বইপত্র বাক্সে প্যাক করতে চাইল। একটা বই থেকে একটি ছবি মাটিতে পড়ল। সে ছবিটি তুলল।

ছবিটি গৌতম নীলাম্বরের। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে, বরের ছবি হিসেবে সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠিতে পাঠান হয়েছিল। শূন্য দৃষ্টি দিয়ে সে ছবিটি দেখল তারপর আবার যথাস্থানে রাখল।

হলে পদধ্বনি। ছেলেরা ফিরে এসেছে।

সেই রাতে যখন হরিশংকর ঘুমিয়ে পড়েছে, তলঅত চুপি চুপি আবার সেই ঘরে ঢুকল। গৌতমের ছবি নিয়ে নিজের কামরায় এল ও ছবিটিকে আচ্ছাকরে জুতো পেটা করল। তারপর সে যেন শান্তি পেল। কিন্তু এই শান্তি বড় অদ্ভুত রকমের কেননা পরক্ষণেই তলঅত মাটিতে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পঞ্চাশ

পৃথিবী শ্বেত বরফের আবরণে ঢাকা। পথের ধারে গাছপালা দেখে মনে হয় কোনো শিল্পী বিস্তৃত ক্যানভাসে চায়না শ্বেত রঙের উপর। এলোমেলো ভাবে কালো রেখা টেনেছে। গাছপালার পিছনের বাড়ী-গুলো থেকে এক উদাস পীতাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড শীত। সেই বিস্তৃত ক্যানভাসের এক কোণায় একটি সুন্দর দোতলা কটেজ; সামনে ছোট্ট বারান্দা; বারান্দার লাল ইঁটের দেওয়ালে লণ্ঠন বসানো। জরীনা মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে প্যাণ্ট পরে, বাইরের স্টোর থেকে কাঠ নিয়ে শীতে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ভেতরের ঘরের ফায়ার প্লেসে আগুন ধরাল। তখন পৃথিবী সুরক্ষিত মনে হল। জরীনা হুসেন এখানে মা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। তার মা ইংরেজ

কিন্তু লক্ষ্ণৌই ঢংএ কথা বলেন। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। জরীনার বন্ধুরা সেখানে প্রায়ই আশ্রয় নিত। তিনি তাদের সঙ্গে বোনের মত ব্যবহার করতেন। জরীনার বাবা লক্ষ্ণৌর ব্যারিষ্টার; ব্যারিস্টার সাহেবের পত্নী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কয়েক বছর ধরে লণ্ডনে আছেন।

এখন জরীনা চেয়ারে বসে একটি রুশ পত্রিকা পড়ছে।

গ্যালারীর ঘণ্টা বাজল। জরীনা পর্দা সরিয়ে দেখল। বরফে ভেজা জুতো, গায়ে ওভারকোট, হাত দুটো ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে গৌতম দাঁড়িয়ে আছে। জরীনা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। হাতে ছোট্ট সুটকেশ নিয়ে সে বারান্দায় উঠে এল। "এটি পঞ্চম শহর। এখানেও আলো জ্বলছে। ভেবেছিলাম, এই জায়গাটি একটু অন্য রকমের হবে।"

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তোমার ধারনা ভুল প্রমাণিত হল। ভেতরে এস!" জরীনার উত্তর।

"বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তাদের ভেতরে ডাক।"

"কি করে ডাকি? আলোয় তুমি তাদের চেহারা দেখতে পাবে না।"

"তারা কি?"

"অসংখ্য ভূত, শব, আত্মা। এরা আমার বন্ধু। বাইরে অন্ধকারে দাঁত বের করে হাসছে। এরা সর্বদা আমার সাথেই থাকে।"

"আমি তাদের ভয় পাই না।"

"ভয় পাবার কোনো কারণ অবশ্য নেই, কেননা আমরা সবাই শবের রূপ ধারণ করি। কিন্তু—"সে হাত নাড়িয়ে বলল—"ভেবেছিলাম, জায়গাটি অন্যান্য জায়গার মত নয়, এখানে অন্ধকার পাব; কিন্তু তুমি এখানে আলোর মেলা বসিয়েছ। আলোয় তুমি কি খুঁজতে চাও ভাই?"

সে ক্লান্ত হয়ে নিজের সুটকেশের ওপর বসে পড়ল। জরীনা গ্যালারীর দরজা খুলল।

"ওয়েলকাম গৌতম! তুমি ফিরে এসেছ। আমরা সবাই তোমার জন্য চিন্তিত ছিলাম।" -

"ধন্যবাদ।"

"বলতে চাই—ওয়েলকাম হোম!—তোমার 'হোম' যেখানে থাক; যাত্রার পর যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়, সেটাই হোম।"

"ঠিক আছে।" সে হাত নেড়ে বলল, "তোমার স্বাগতম স্বীকার করলাম।" সে চারিদিকে তাকাল—"বাড়ীটি তোমার সেই পুরোনো বাড়ী মনে হচ্ছে না তো, যেখানে তুমি থাকতে—আর্টিস্টের বাড়ী।"

"এটা সেই বাড়ী।"

"আচ্ছা?" সে অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, তুমি যখন বলছ, তখন স্বীকার করে নিচ্ছি। জরীনা, আমি কি উন্মাদের মত আচরণ করছি?"

"না তো!" সে ঘাবড়ে উত্তর দিল—"তুমি ভীষণ ক্লান্ত।"

"দিনের পর দিন পালাতে পালাতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায়। জানিনা কত লক্ষ, কত কোটি মাইল আমাকে চলতে হয়েছে।"

"কোথায় ছিলে?"

"কেন বলবো?" সে শিশুর মত উত্তর দিল।" কয়েক রাত আমি ক্ষেতে-খামারে কাটিয়েছি। নৌকো চড়ে নদীর বুকে ঘুরে বেড়িয়েছি। স্টেশনের ওয়েটিংরুমে লুকিয়ে বেড়িয়েছি। পুলিশের নজর বাঁচিয়ে আমি পালিয়ে বেড়িয়েছি—আজ হঠাৎ চিন্তা করলাম, একজন ভদ্রলোকের মত, বীরের মত আমি আমার অপরাধ স্বীকার করব।"

"পুলিশ?"

"হ্যাঁ, তুমি জান না?"

"না তো?—কি?"

"জরীনা বেগম···!" সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল।" আমি দুটো খুন করেছি। তারপর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কোথাও মাথা গুঁজবার জায়গা পাই নি। সব বন্ধুদের দরজা বন্ধ। তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম একবার এদিকেও দেখে যাই।"

"ভেতরে চলে এস গৌতম। প্রচণ্ড হাওয়া।"

"কিন্তু তুমি পুলিশকে খবর দেবে না তো?"

"কখনো না।"

"না, আমি বাইরেই বসব। কামরার ছাত আমার ভাল লাগে না।"

জরীনা স্কার্ফ জড়িয়ে বরফের আক্রমণ থেকে বাঁচতে চাইল।

"শোনো জরীনা বেগম।" সে সেইভাবেই বসে বসে বলল—"আমি স্বীকার করতে চাই, দুটো খুন করেছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে দুজনকে খুন করলাম, তারা বুঝতেই পারল না যে আমিই তাদের শেষ করেছি।" হঠাৎ তার স্বর স্বাভাবিক হয়ে গেল।" সেদিন সুরেখার বাড়ী থেকে পার্সেল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগেই নির্মলা মারা গেছে। সেই রাতে শহরে ফিরে আমি যখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, চেলসীর এক পারে চম্পা আহমদকে দেখলাম। সে আমাকে চিনতে পারেনি কেননা সে ড্রাংক ছিল। তাই, "সে গর্ব করে বলল—" এই খুন করার ব্যাপারে আমি মাস্টার।"

বরফের ঝড়ো হাওয়া ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সেই সময় তীর বেগে একটা গাড়ী তাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। কামাল ও হরিশংকর নামল।

"জরীনা।" তারা চেঁচিয়ে উঠল—গৌতম এখানে এসেছিল?"

তারা সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠে এল।

"স্বামীজীর সেণ্টারে জানতে পারলাম, গৌতম আস্টারলী'র দিকে এসেছে।" কামাল বলছিল।

কিছুক্ষণ পরে তারা দুজনে মিলে অজ্ঞান গৌতম নীলাম্বরকে গাড়ীতে কোনো রকমে তুলে নিয়ে গেল।

"কেউ আসেনি।" সুজাতা দেবী দরজায় এসে বলল। "তিনজনই নাস্তিক। স্বামীজী স্বয়ং সব ব্যবস্থা করেছেন। ফুল আনিয়েছেন। সুইস কটেজ থেকে এক কীর্তনীয়ার দল এসেছে কিন্তু এরা শান্তি খুঁজতে চায় না।"

"এখন এরা কি করছে জান? বাড়ীতে অথবা সেই ইণ্ডিয়ান ভাণ্ডারের ফ্ল্যাটে জড়ো হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাস খেলছে —আশ্চর্য।" এক ভক্ত-বুড়ী জানালা দিয়ে মাথা বের করে বলল।

চম্পা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

"মনে হয় তুমি কাউকে খুঁজছ।" অন্য বেদান্ত-ভক্ত ভদ্রমহিলা বলল। "দেখ, সে এখানে উপস্থিত। তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে ডাকছে।" তিনি কৃষ্ণের একটি ছবির দিকে আঙুল তুললেন। "এঁকে খুঁজে পাবার জন্য, দেখবার জন্য তৃতীয় চোখ চাই। তোমরা ভারতীয়রা তা হারিয়েছ।"

চম্পা এক দৌড়ে নীচে। পথে এসে নিজের চেহারা হাত দিয়ে স্পর্শ করল চম্পা। তার মনে হল সমস্ত পথচারী তাদের তৃতীয় নয়ন দিয়ে তাকে দেখছে। দৌড়ে ৭৩ নম্বর বাস ধরল সে।

সেণ্টারে স্বামী দেবিকানন্দ লেকচার শুরু করেছেন। যোগ বিষয়ক তাঁর লেকচার শুনে, ভক্ত-বুড়ীরা বাড়ী ফিরে পড়ে থাকা বাসন পরিষ্কার করবে, কৃষ্ণের কথা একবারের জন্যও মনে পড়বে না।

বাস থেকে নেমে সে হিন্দুস্থানী ছাত্রদের কেন্দ্রের দিকে এল।

হলঘরে ছাত্রদের নূতন দল খোশগল্পে মশগুল। "আমি চম্পা আহমদ।" সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

"ইয়েস?"

এক মাদ্রাজী ছাত্র জিজ্ঞেস করল।

সে দুঃখ পেল। তার নামের আর কোনো মহত্ব নেই। তাকে কেউ চেনে না। সে এখানে অপ্রয়োজনীয়।

"এমনিই আপনাদের সেণ্টার দেখতে চলে এলাম।"

ছাত্ররা তাকে সন্দেহের চোখে দেখল।

চম্পা আবার পথে নেমে এল।

স্ট্র্যাণ্ডে পৌঁছে সে ইণ্ডিয়া হাউসে এল। ক্যান্টিনে সব সময়ই হৈ-হল্লা চলতে থাকে। এরপর সে চিকেন সরাই গেল। সেখানে কামালের সঙ্গে দেখা। কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে কাউকে ফোন করছিল। তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে কামাল বাইরে বেরিয়ে গেল। আবার বাইরে গিয়ে সে বি.বি.সি'র ক্যান্টিনে উঁকি মারল। "আমি চম্পা আহমদ" টেবিলের আশে-পাশে বসে থাকা লোকদের সে বলতে চাইল, পারল না। সে বাইরে এল।

সামনেই আণ্ডার গ্রাউণ্ড। সিঁড়ি ভেঙ্গে সে অন্যমনস্কভাবে নীচে নামল এবং মেডাবেলের টিকিট নিল। কয়েক মিনিট পর মেডাবেলের প্রশস্ত পথে, একটা গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু দূরেই একপাশে সুরেখা ও আশার বাড়ী, অন্যদিকে তলঅত ও কামালের ফ্ল্যাট। স্টেশনের সামনে একটা আধুনিক ফ্ল্যাটে শংস্থা ও বিল ক্রেগ থাকত।

ঠিক সেই সময় থলি হাতে গ্রসারের দোকান থেকে সুরেখা বাইরে এল—"হ্যালো চম্পা!" সে চেঁচিয়ে বলল, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস! এস!"

সুরেখার সঙ্গে সে চুপচাপ এগিয়ে চলল।

ড্রইংরুমের প্রশস্ত দরজার বাইরে এখনো দিনের আলো। অনেক হলুদ পাতা সেখান থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে—পোর্চের সিঁড়ির উপরে। বাইরে সবুজ ঘাসের ওপর রাখা বেতের চেয়ারের নীচে কয়েকটি পাতা হাওয়ায় কাঁপছে। ঘাসের উপর সোনালী নরম রোদের বৃত্তাকার আভা। কে জানে, মানুষ কি চায়?

"চম্পা আরাম করে এই সোফায় বস!" তরকারি কড়ায় ঢালতে ঢালতে সুরেখা বলল।

"সোফায় বসলে কামরার কমপোজিশন সে রকম হবে না, যেরকম সেদিন ছিল।" চম্পা আপন মনে বলল।

"সেদিন……কোন দিন?…… কি রকম ছিল?" সুরেখা একটার পর আরেকটা প্রশ্ন করে চলল।

"কি জানি?"

বাইরে শীত, বরফ, ঠাণ্ডা হাওয়া! সুন্দর পরিবেশ।

"কাল…" বালতি থেকে কয়লা রাখতে-রাখতে বলল—"অনেকে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।"

"বাড়ী?" চম্পা বিস্মিত হল।

"হ্যাঁ—হিন্দুস্থান।" সুরেখা ছাই ঘাঁটছে।

"কারা?" তটস্থ হয়ে চম্পা জিজ্ঞেস করল। আর এদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? ঠাণ্ডা হাওয়ার মতই সে ছড়িয়ে আছে চারিদিকে! আর কারুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।

কোমরে শাড়ী গুঁজে সুরেখা আবার তরকারি কাটতে বসল।

"সকলেই—" সে উত্তর দিল। "হরি ফ্লাই করছে। কামাল পরশু জলের জাহাজে রওনা হবে। গৌতম আজ সকালে নিউইয়র্কে চলে গেছে।"

বাইরে সারি সারি ঘরের ও পাশে সূর্য ঢলে পড়েছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার। শীতের অন্ধকার যেন ঝুপ করে নামে আর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। সে সুরেখাকে সাহায্য করতে রান্নাঘরে চলে গেল। আবার জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারল। কামরায় সন্ধ্যের আমেজ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। রাত সারা ঘরে ছড়ান। সে আবার ঘরে গেল কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। ছায়া অন্য রকমের। রং, পরিবেশ, সুর সব মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে। সময় জানালা দিয়ে পালিয়েছে। তার এক টুকরোও পেছনে ফেলে যায়নি। সুরেখার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সে কামালের ঘরে আলো দেখতে গেল।

"আমাকে ছেড়ে যেও না—আমাকে ছেড়ে যেও না—আমাকে ছেড়ে…!" সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে চাইল, পারল না। ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে রওনা হল। চম্পা জন কার্টারের গলিতে পৌঁছল। দরজার কাছে গিয়ে আলো জ্বালাতে চাইল।

কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার তাকে স্বাগতম জানাল। জানালায় রাখা জরানিয়মের গাছের ওপর সে ঝুঁকে পড়ল। এতদিন রাত আমার বিরোধিতা করত—সে ভাবল—এখন হয়ত সেই আমার বন্ধু। উঁচু বাড়ীর ছাতের ওপর দিয়ে শীতের হিমেল হাওয়া বরফের ভারে নুয়ে পড়া পাতা। পৃথিবীতে রাতের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। এখন আমি সত্যিই স্বতন্ত্র। সে হাসল। পায়ের তলায় শক্ত জমি—এই জমির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে আমাকে মৃত্যুর কোলে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। আমার পা আমাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে। আমার হাতে রাতের লাগাম তার হাতেও সেই লাগাম ধরে আমি দিন পর্যন্ত পৌঁছে যাব। হে রাত্রি, বন্ধু আমার কেমন আছ তুমি? আমি তো তোমাকে অনেকদিন ধরে জানি। বর্ষায়, পূর্ণিমায়, ফাল্গুনে, পরীক্ষার পড়ার সময়, অজানা দেশে ট্রেনে যেতে যেতে তোমার স্বরূপ আমি দেখেছি। সময় আমরা একসঙ্গে মিলে কাটিয়েছি। আমি জানি, একদিন তুমি জিতবে।

আর তুমি গৌতম নীলাম্বর! তোমাকে আমি তোমার স্বপ্নের হাতে সঁপে দিলাম। আমি সম্ভবতঃ বাস্তব, তুমি স্বপ্ন। স্বপ্নই দেখে যাবে।

রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে চলল। শীত বাড়ছে। নীরবতার তরঙ্গ দেওয়াল ছুঁয়ে যাচ্ছে। সময় বলল—আমাকে চিনবার চেষ্টা কর। তোমার পিছু আমি ছাড়ব না। তুমি ভেবেছিলে, পল, মুহূর্ত নিজের জায়গায় স্থির থাকবে। তোমার ধারণা ভুল। আমি যাচ্ছি…প্রতি মুহূর্তে আমি অদৃশ্য হয়ে চলেছি পর্দার পেছনে, স্তরে স্তরে লুকোনো অন্ধকার। এগিয়ে চলেছি। আমিই সীমারেখা; তুমি এর আগে যেতে পার না। ফিরে এস। সামনে ফটক, তারপর অন্য দেশ। আরও এগিয়ে যেতে হলে নতুন প্রমাণপত্র যোগাড় করতে হবে। নতুন কাগজপত্র সই করতে হবে কেননা এর পর এক নতুন পরিবেশ আরম্ভ হচ্ছে। আমি এখন পর্যন্ত অনেক মোহ ভেঙেছি। তোমার মোহ তো খুবই তুচ্ছ। আমাকে চেন। আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে চলব। আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে পার না। লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে…আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না।

তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, কত তাড়াতাড়ি তুমি সীমারেখার কাছে পৌঁছেছো। সমাধানের জন্য তুমি বিচলিত হচ্ছিলে। দেখ, আমি সব সমস্যার সমাধান মুহূর্তের মধ্যে করতে পারি। তোমার সমস্যার সমাধান মুহূর্তের মধ্যে করে দিলাম। আমার জন্যই সবকিছু আপনা-আপনিই হয়ে যায়।

এখন তোমাকে আরও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ভয় নেই, কি ভাবে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

হাওয়ার দাপটে জানালার পর্দা কেঁপে উঠল। কামরা কুয়াশায় ভরে গেল। তখন চম্পা বুঝতে পারল, সে শীতে কাঁপছে। তাড়াতাড়ি সে জানালা বন্ধ করল। নিজের কামরায় ফিরে গেল।

বাহান্ন

"আপ্পী'র বিয়ের সময় আমি একটা চমৎকার শাড়ী কিনব" নির্মলা বলেছিল।

"আমি কোনো কথা বললাম না।"

"নতুন ঢং-এর বর্ডার দেওয়া শাড়ী আমার মোটেই ভাল লাগে না।" বুড়ীদের মত মালতী বলল। মালতী রায়জাদার ষোল বছর। নির্মলা তার চেয়ে এক বছরের ছোট। আমি নির্মলার চেয়ে এক বছরের ছোট। এরা বিজ্ঞের মত, কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করল। আমি যেন কিছুই জানিনা। তারপর হঠাৎ তলঅত চুপ হয়ে গেল। "দেখ," সে বলল, "আমি আজ অনুভব করলাম, আমার অতীত কেবলমাত্র আমার জন্যই মহৎ। অন্যের জন্য, পৃথিবীর জন্য তার কোনো গুরুত্ব নেই।"

"আমার অতীত কেবলমাত্র আমারই। কামাল তলঅতের কথার পুনরাবৃত্তি করল।

"এবং পৃথিবী কেবলমাত্র 'আজ' নিয়ে ব্যস্ত।" হরিশংকরের কথা।

কিন্তু গতকালই আজ, অর্থাৎ বর্তমান। এই বর্তমান গতকালের মধ্যেও আছে, আগামীকালের মধ্যেও। সময়ের এই গোলকধাঁধা আমাকে অস্থির করে তুলেছে।" তলঅত উদাসভাবে বলল— "সময়ের হাতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। তোমরা কেউ আমাকে সাহায্য করছ না কেন?"

"সময় সব সময়ই বর্তমান। সময় বরাবরই 'আজ'।" তলঅত বলল।

"তলঅত বেগম, সম্ভবত আইনস্টাইনও তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।" হরিশংকর বলল।

১৯৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরের এক বিকালে এরা লণ্ডনের সেণ্ট জর্জ উডে বসে গল্প করছিল। জানালার কাঁচে এদের ছায়া নানা আকৃতি বানাচ্ছিল। পথে গাড়ী চলছে। রেডিও থেকে কোনো কনসার্টের সুর ভেসে আসছে। সময়ের বিশাল প্রাচীর, পথ, গলি, নানা ধ্বনির ও গোলকধাঁধায় এরা আবদ্ধ হয়ে বসে রইল।

সময়ের এই গোলক ধাঁধায় ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাড়াওয়ালী কুঠীর বারান্দায় বসে তলঅত ও নির্মলা কথা বলছিল। এই তলঅত ও সেই তলঅতে কোনো তফাৎ নেই কিন্তু মনে হয়, দুই তলঅতের যেন দুই পৃথক অস্তিত্ব। মহাত্মা বুদ্ধ, শাক্যমুনি বলেছিলেন— 'মানুষ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। মানুষ কৈশোরে এক রকম, যৌবনে আর এক এবং বার্ধক্যে অন্য রকম। এই মুহূর্ত আগে তুমি যা ছিলে, এখন তা নও। এখন যা, পরমুহূর্তে তা রইবে না।' দূর পাহাড়ে গ্লেশিয়ার ভেঙ্গে গড়ছে। হাওয়া, অন্ধকার— তরল সময়—বরফে জমে থাকা সময়।

"আমরা আমাদের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে আশ্বস্ত হতে চাই," হরিশঙ্কর বলল—"কেননা আমরা আমাদের ভয় পাই।"

"আমরা সময় ও অন্ধকারকে ভয় পাই কেননা সময় একদিন আমাদের হত্যা করবে এবং অন্ধকার আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল হবে।" তলঅত বলল।

"এবং গৌতম নীলাম্বর পর্যন্ত কতো ভীতু।" কামাল বলল।

"গৌতম নীলাম্বরের প্রসঙ্গ ছাড়। তুমি আসল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। স্থির করতে হবে, জীবনে আসল জিনিসটা কি।" হরিশংকর বলল—"আমি চৌদ্দ বছর আগেও ছিলাম; বেঁচে থাকলে চৌদ্দ বছর পরেও হরিশংকর হিসেবে স্বীকৃত হব। ততদিনে, সময়ের ঝড় আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাবে। গিনি-পিগে'র মত প্রায় অস্তিত্বহীন আমরা শেষ হয়ে যাব; এ ছাড়া অন্যেরাও যাদের নিয়ে এই কাহিনী।

সময়ের একটি নক্সায় ঘেরা তলঅত এক জায়গায় বসে আছে, সেই তলঅত, সেই নক্সায় ঘেরা হয়ে, আরেক জায়গায় বসে, এবং এই দুই বিন্দুর মধ্যে অনেক বছরের ব্যবধান। এই ব্যবধানে মানুষ কেবল এগিয়েই যেতে পারে—আগে, আরও আগে···। পেছনে যাওয়া অসম্ভব। মনে হয় অসংখ্য তলঅত, অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে, অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে—দর্পণের ভাঙ্গা টুকরোর মত, চেহারা একটাই কিন্তু প্রত্যেক টুকরোয় পৃথক পৃথক প্রতিবিম্ব।

কামাল যেন স্টেজের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে টেবিলের ওপর বসে পড়ল। মাছির দৃষ্টি দিয়ে সে সবাইকে দেখল। মাইকেল ক্রেগ জরীনা গৌতম নীলাম্বরকে এয়ারপোর্ট পৌঁছে দিয়ে তারা ফিরে এসেছিল ও কামালের কামরায়, কামাল ও হরিশংকরের বাঁধা জিনিসপত্রের ওপর বসে আড্ডা মারছিল।

গৌতম, জরীনার বাড়ী থেকে ফিরে এসে কামালের বাড়ীতে প্রায় পনের দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে রইল। সারাদিন তাস খেলে কাটত। গৌতমের সুস্থ হতে না হতে, কাশ্মীর কেসের জন্য তার নিউইয়র্কে যাবার আদেশ এল। লণ্ডনে, কামাল ও হরিশংকরের এটা শেষ দিন। হরিশংকর রাত্রে এয়ার ইণ্ডিয়া প্লেনে ফ্লাই করবে। কামাল আগামীকাল ভোরে বোট ট্রেনে রওনা হবে। মাইকেলও যাচ্ছে।

তলঅত দ্বিতীয়বার ক্যালেণ্ডার দেখল। ১৯৫৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর। সে রোমাঞ্চ অনুভব করল—"মাইকেল দরজা বন্ধ কর।"

মাইকেল উঠে দরজা বন্ধ করল। এদের তলঅতের খেলনার

মত মনে হয়—সিপাহী, যার হাতে বন্দুক ছিল (মাইকেল) ; শ্বেত দাড়ীওয়ালা চীনী দার্শনিক (হরিশংকর) ; মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের দরবারের নর্তকী (সুরেখা) ; গোলগঞ্জের পককেশ নবাব কম্মণ (কামাল) । এদের সবাই দেওয়ালীর পুতুলের মত মনে হয়। লক্ষ্ণৌর কুমোর এই পুতুল গড়েছিল। (একটি পড়ে ভেঙ্গে গেছে)। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভিস্তি জল ছিটাতে আসবে। সিংহাসন পাতা হবে, রাজা বসবেন। তারপর এরা সবাই বসবে।

"আমি একদম ঠিক ছিলাম।" সে নিজের কথা বলে গেল, "কিন্তু হঠাৎ আমার পরিবেশ আমাকে ভয় দেখাতে লাগল।"

কামাল যেন কিউ নিয়ে বলতে শুরু করল—"নতুন কথা জানতে পারলাম, পৃথিবীতে ভীষণ গণ্ডগোল চলছে।"

"কিছু বুঝতে পাবার আগেই আমি শব্দের সমুদ্র পার করে, চিন্তা-রাজ্যের ভয়ানক পথে পা দিয়েছি।"

"শব্দ কি? সত্য কি? বই থেকে জানতে পারি—শব্দ ভুল, অর্থহীন! সত্য বলে কোনো জিনিস নেই। প্রত্যেক জিনিস বেকার। কখনো দেখেছি, বৃহস্পতি রাক্ষসদের নিজের বিদ্যা শেখাচ্ছে, কখনো আমার নিজেকেই এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী মনে হয়েছে, অথবা রূপকথার গল্পের কোনো ডাইনি, যে জ্ঞান রূপী ঝাঁটায় চড়ে অন্ধকারে উড়ে চলেছে।"

"অন্ধকারে আরো অনেক ঝাঁটা উড়ে চলেছে। তার ওপর হাজার হাজার মেয়ে বসে আছে—তহমীনা, নির্মলা, জন কার্টার, ফিরোজ, চম্পা, জরীনা এবং আরও অনেকে। ঝাঁটাগুলো এত উপর দিয়ে উড়ে চলেছে যে এদের নীচে ফিরে আসা অসম্ভব। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীর আকাশ ঝাঁটায় ছেয়ে গেছে।"

"এদের মধ্যে চম্পার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখছিল।"

"এখন আপনি যদি একটা ঝাঁটার উপর বসে ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে নিশ্চয় আপনি পথ ভুলবেন। আপনার ঝাঁটা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়বে।

স্বপ্নের ঘোর, মধ্যযুগের ভক্তের মত সে গান গেয়ে বেড়াত। সে গির্জায় গেল। সন্ন্যাসিদের দেখল, তারা কতো সুখী। নিজের হৃদয়ের মধ্যে লুকোনো ঈশ্বর, ও জীবনের প্রতীক ঈশ্বরকে কল্পনায় তুলনা করল। সে সম্ভবত খুব আনন্দ পেল। সেই আনন্দ, সেই সুখকে তুমি মাপতে পারোনা। কেবল একটু সুফী ভাবধারার প্রয়োজন ছিল। ভোরবেলা উঠে ভৈরবী গাইলেই সেই প্রয়োজন মিটত…… গৌতম নীলাম্বরের মত সে প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে লুকোনো রহস্যের সন্ধান পেত !"

কথা বলতে বলতে তারা কামরার বাইরে, পথে এল। কামাল নাক উঁচু করে কুয়াশা শুঁকল।

"প্রত্যেক জিনিসের পেছনে একটা রহস্য লুকিয়ে থাকে, আমিও একথা বুঝতে পারি। ঠিক এই কারণে আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি।" মাইকেল শূন্যে হাত উঁচু করে চলল !

"হ্যাঁ।" তলঅত বলল। তারা মাথা নীচু করে, মাটি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে।

গোধূলির কনে দেখান আলোয় তারা হীথের দিকে এগিয়ে চলল। ছোট ছোট বাড়ীর ব্যাক গার্ডেনের জানালায় লোক, সরু গলি, গলির মোড়ে চা-ঘর। মেয়েরা অফিস থেকে ফিরছে।

পাহাড়ের ওপর পৌঁছে তারা ছবি দেখে আরও মুগ্ধ হল।

নীচে মেলা। জিপসী মেয়েরা হাতের রেখা দেখে ভাগ্য বলছে। বাচ্চারা বাদাম ও আইসক্রীম খাচ্ছে।

"আমাদের আস্পর্ধার বলিহারী, আমরা অন্যকে আমাদের স্বপ্নে শামিল করতে চাই !" মাইকেল বলল।

"হ্যাঁ ? তলঅত আবার বলল— "আমার অতীত, আমার সময়, আমার স্বপ্ন শুধুমাত্র আমার। কিন্তু মনে থাকে যেন…" সে তাড়াতাড়ি বলল—"আমি একজন একলা লোকের কথা বলছি। ভবিষ্যতে তো আমাদের সকলেরই এক।"

একটা কাঁকড় উঠিয়ে মাইকেল তাকে মারল—"খোদার দোহাই এই পার্টি লাইন চালিও না। ভবিষ্যত প্রত্যেকের জন্য সমান নয়।

ভবিষ্যত আমাদের সকলকে গ্রাস করবে ঠিকই কিন্তু গ্রাস করার ভঙ্গি হবে পৃথক।"

"ও মাইকেল ?" তলঅত শিশুর মত বলে উঠল—"আমার ভীষণ ভয় করে।"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে ভয় দেখাবার জিনিসের অভাব আছে নাকি ? সুন্দর দৃশ্য, চমৎকার বাড়ী। ব্যাগ খুললেই রকমারি কাগজ উঁকি দেয়। ব্যাংকের চিঠি, শেয়ারের কাগজ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রিপোর্ট, যার ওপর লেখা নাম—লর্ড সিনহা, স্যার বীরেন মুখার্জি, শ্রীথপর। এই সব নামের আড়ালে আর একটি জগৎ লুকিয়ে আছে। অট্টালিকা; টাকা, আর্থিক সমস্যা, হরতাল, অনাহার, মজুর বস্তী, সিটি অফ লণ্ডন, ক্লাইভ রো কলকাতা, চৌরঙ্গী, টাটানগর, এনড্রু ইয়ুল, কলকাতা।

আমি ভয়ে ভয়ে এই কাগজগুলোর ওপর সই করি, এই কাগজ আমার আর্থিক প্রাচুর্যের প্রমাণ। এ সব কেন ? লাভ কি এসব থেকে ? রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করে এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হতে আমি চাই নি। কাগজের টুকরো—টাকা, টাকা, টাকা। হঠাৎ টাকার মাহাত্ম্য আমার কাছে ভীষণ ভাবে কমে গেছে। লোকেরা বলল আধুনিক রইসরা এরকমই হয়। আমার এসব শুনে ভীষণ হাসি পায়।" তারা পাথরের ওপর বসে পড়ল। নীচে ঝিলের ডুবন্ত সূর্যের আভা কাঁপছে। মুক্তি সৈনিকের একটি দল ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে চলে গেল।

কামাল ঝিলের ধারে একলা দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে তাকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছে।

সহসা তলঅতের অট্টহাসি।

"আমি একবার নির্মলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রানী বিবি, তোমার কিসের ভয় ? নির্মলা উত্তর দিয়েছিল, আমি আমার স্বপ্নকে তার হাত থেকে বাঁচাতে চাই। সে আমার স্বপ্ন চেনে, জানে। ভেবে হাসি পাচ্ছে, নির্মলার স্বপ্ন তার সঙ্গেই চলে গেল। গৌতম জানতেই পারল না।

"আমাদের জন্ম অজ্ঞানে, আমরা অজ্ঞানের মধ্যেই বেঁচে থাকি এবং তার মধ্যেই মারা যাই—আসল সিদ্ধান্ত এই।"

কামাল তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মাইকেল গাছের পাতা ছিঁড়ছে, মেলার সঙ্গীত শেষ হয়েছে। শীত বাড়ছে।

"আমরা অজ্ঞানের যে নগর গড়ে তুলেছিলাম, তার দেওয়াল. দর্শনের ইঁট দিয়ে তৈরি। তলঅত নিজের কথা বলে চলল—"একদিন সিঁধ কেটে মৃত্যু আমাদের নগরে প্রবেশ করল।"

"একবার ফরেনবরায় এয়ার ফেষ্টিভেলের সময় বেচারা জন ডেরী ধ্বনির সীমার উর্ধ্বে উড়বার প্রয়াসে প্রাণ দিয়েছিল। তার প্লেন আকাশেই টুকরো টুকরো হয়ে মেলায় ভেঙ্গে পড়েছিল। অনেক লোক মারা গিয়েছিল। আকাশ থেকে প্লেনের জ্বলন্ত ভগ্নাবশেষ যখন মাটিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, আমি তখন নিজেকে বাঁচাবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি পাগলের মত জরীনা ও চন্দ্রাকে খুঁজছিলাম। ভয় ছিল, তারা মরে যায়নি তো! সেই মুহূর্তে আমার জীবনের চেয়ে তাদের জীবন আমার প্রিয় মনে হল। নিজের কথা আমি ভাবিনি।

"তাই নির্মলা যখন মৃত্যু বরণ করল, আমার বিশ্বাস, সে ভয় পায় নি।...অবশ্য মানুষের জীবনে মৃত্যুই এমন একটি অনুভূতি যার সঙ্গে মানুষ অন্যকে জড়াতে পারে না। তাই নির্মলাকে আমরা একলা ছেড়ে দিলাম। বেচারা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।"

"বেদান্তে অস্তিত্বের চারটি-অবস্থার কথা লেখা আছে—জেগে থাকা; স্বপ্ন; স্বপ্নবিহীন নিদ্রা; ও মৃত্যু।"

নীচ থেকে কামালের গানের সুর ভেসে আসছে। গাছের পাশে চাঁদ উঁকি মারছে।

"মানুষের চিন্তাধারা ও অস্তিত্বের যাত্রার উদ্দেশ্য এক।" শংকর বলল।

"মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবে। মৃত্যুকে কে গ্রাস করবে? হাওয়া আমার নিঃশ্বাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সূর্য আমার দৃষ্টিকে আলোর আবরণে ঢেকে ফেলবে। চাঁদ আমার মস্তিষ্ককে শীতল করবে।

আত্মা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আমার শরীরের রোম আগাছার রূপ ধারণ করছে। মাথার চুল থেকে গাছপালা গজাচ্ছে।" পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তলঅন্ত আবার বলল।

গভীর নিদ্রা, গভীর জল, গভীর স্বপ্ন! হরিশংকর বলল "ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু মৃত্যু বাকি।"

"শরীর ভাবে, অনুভব করে, সে শেষ হলেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়। আগুন, শীতল জল, ঠাণ্ডা হাওয়া—সব কিছু স্ব-স্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আপনা-আপনিই জন্ম নিয়েছে। গৌতম চম্পাকে বলেছিল—'তোমার শরীর, তোমার বুদ্ধির চেয়ে যদি পৃথক এক সত্ত্বা হয় তাহলে তাকে পৃথক করে দাও এবং শুধু তুমি আমার কাছে এস—কিন্তু তুমি এমন করতে পারবে না!" বস্তুবাদী গুলশন বলল।

"এখন অনেককে মরতে হবে। আমি তাদের আগে চলেছি। অনেকে মরছে। পেছনে তাকিয়ে দেখি, যারা মারা গেছে তাদের কি হয়েছে! সামনে দেখি, যারা আমার পর মারা যাবে, তাদের কি হবে!" হরিশংকর বলল।

"চিউঁটা চড়ী পাহাড় পর, কানোঁ মেঁ হাথী লটকায়ে
এক অচম্ভা হামনে দেখা, নইয়া বীচ নদীয়া ডুবী যায়।"

(পিঁপড়ে পাহাড়ের উপর চড়ছে, তার দুই কানে হাতী ঝুলছে। আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখেছি, মধ্য নৌকায় নদী ডুবছে।)

কামালের গান ভেসে আসছে। হাওয়ায় যেন তার গান দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। "আমার মূল্য কি? আমি এখন পর্যন্ত কি করেছি?" সুরেখা বলল।

"আমি যা কিছু করি—মনে হয়...সৃষ্টির কুহেলিকা'র সঙ্গে আমার কাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই মহান ঘটনাকে লুকোবোর জন্য আমি হাসি। তোমাকে অবশ্য বলে দিই"—মাইকেল আঙুল উঁচু করে বলল—"আমার পরিণতি হবে অত্যন্ত করুণ।"

"কি করি! কি করি! কি করি!" ভয়ানক কোরাসের মত পাহাড়ে গায়ে তার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল। "কোনো আমেরিকান

নিগ্রোকে ডাকো—কোনো জার্মাণ ইহুদীকে পেশ কর—কোনো আরব উদ্বাস্তুকে হাজির কর। কোনো পাকিস্থানী ও হিন্দু ছিন্নমূলকে ডেকে নিয়ে এস—তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি অপরাধ করেছিলে, কার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছ তোমরা?" গুলশন বলল।

"আমি আছি তোমাদের সামনে।" মাইকেল বলল।"

"ইসরাইলের নূতন গায়ক! তোমার কাছ থেকে আমরা শুধু ডিসেরার গীত শুনতে চেয়েছিলাম," তলঅত বলল—"কিন্তু তুমি বন্দুক তুলে ধরেছ!" "হাজার হাজার বছর ধরে আমরা কেঁদে বেড়িয়েছি। মরুভূমির ক্ষুধা, ক্রোধ ও অত্যাচার সহ্য করেছি। আমি তলঅতের কথা আবার বলতে চাই—কষ্ট সহ্য করাই কি অপরাধের প্রমাণ?"

"তাদের স্বরে আত্মার নিঃসঙ্গতা! গভীরতার নিঃসঙ্গতা, দুঃখ, সন্দেহ, প্রলোভন এবং পাপের নিঃসঙ্গতা! কোনো আকর্ষণে জড়িয়ে পড়ে মানুষ নিজেকে কত নিঃসঙ্গ মনে করে!" মাইকেল বলল।

"জঙ্গলে একহাজার যোগী বসে বসে ভজন করছে। আমি তাদের স্বর শুনেছি!" হরিশংকর বলল।

"ফিলিস্থানের সবুজ ক্ষেতে আমি গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলাম!" মাইকেল বলল।

"আমি তোমার গান শুনেছিলাম।" তলঅত বলল। ইতিহাসের সজীব অনুভূতি আমার মাথার উপরে তলোয়ারের মত ঝুলছে। আমি আমাকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারিনা।

"কি করি? কি করি? কি করি?" সকলে একসঙ্গে বলল।

বই যেমন ছিল, তেমনিই রয়েছে, হাজার হাজার লোক বই পড়েছে। নতুন বই ছাপা হচ্ছে। প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। নতুন গল্প লেখা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রভাতে পাহাড়ের উপর আলো ছড়িয়ে পড়ছে। দাউদের গান গাওয়া হচ্ছে। আমার রুবাইয়েৎ বলল—'মানুষের উচিত জল না খায়। যদি খায় তাহলে তার নিজের রক্ত তার মাথায় উঠবে।'...কিন্তু মানুষ তৃষ্ণার্ত। সে কি করবে? তাকে বলো, মানুষকে বলো—দাউদের সঙ্গে সাতটি ধ্বনির বার বার

উচ্চারণ করুক। খোদার আওয়াজ জলের উপরে—এই আওয়াজের মহিমায় লেবনানের দেবদারু গাছ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই আওয়াজ থেকে আগুনের হল্কা বেরোয়। এই আওয়াজ মরুভূমি কাঁপে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যায়, এবং তার পরিপূর্ণতার পূজারী বলে—'পবিত্র হোক! পবিত্র হোক! পবিত্র হোক!' কিন্তু তুমি বল—আমি তৃষ্ণার্ত। আমি তৃষ্ণার্ত।" মাইকেল বলল।

"সারা জীবন মানুষ কোনো না কোনো ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়—প্রেমের ক্ষুধা, পেটের ক্ষুধা, শান্তির ক্ষুধা। ক্ষুধা থেকে মানুষের জন্ম।" বস্তুবাদী গুলশন বলল—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, ভূত। আমি সবচেয়ে আগে এই ভূতের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। অন্য মুক্তি এমনিতেই পেয়ে যাব।" কামাল গান গাইতে গাইতে ওপরের দিকে এল।

"পাপ বোধ আমাদের কাছে নিয়ে আসে। ভদ্রতাবোধ আমাদের সর্বনাশ করল! হায়! আমরা এ জীবনে যদি দু-একটা পাপ করতাম! ভদ্রতাবোধ, আমাদের একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আমরা কেউ কোনদিন যদি এই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলি—দেখবে চিরদিনের জন্য আমরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ব!" হরিশংকর বলল।

"এরকম কখনো হবেনা!" তলঅত বলল।" আমাদের কালচার, আমাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড, উচ্চ মোরাল কোড, চিরদিন আমাদের বাধা দিয়েছে।"

"না তলঅত বেগম!" হরিশংকর বলল, "আমাদের কালচারের বাঁধন অনেক আগেই ছিঁড়ে গেছে; যার একধারে তুমি এবং অন্য ধারে আমি শূন্যে দুলছি!"

"নিজের ভূতদের ভুলে যাও! নিজের ভূতদের ভুলে যাও!" গুলশন বলল।

"তারপর কাঁচের দরজা খুলল। যারা ভেতরে আসছিল, তাদের মধ্যে চম্পাও ছিল। সে 'হ্যালো' বলে আমার কাছে এল। এটা 'মুর্গী সরায়' এবং আমি জাহাজ দপ্তরে ফোন করছি। বর্তমানে

আমি খুব নিরাপদ আছি। আমার চারিদিকে পাথরের ইমারৎ। পায়ের নীচে শক্ত জমি। তবু আমি ভয় পেলাম। চম্পাবাজী আমার সামনে উপস্থিত। সময় কেটে যাচ্ছে। সময়ের প্রবাহ তাঁর অস্তিত্বে। আমার মনে হয় আমাকে দেখে তিনি খুশী হতে পারেননি—রাগও করতে পারেননি বিরক্তও হননি। আমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যেতে চাই। আমি তাকে কিইবা বলতে পারি!

"আমার মনে হল, সে আমাকে বিশেষ কিছু বলবে, কিন্তু সে চুপ। সিনেমা হল থেকে যারা বাইরে বেরিয়ে আসছে—তারা উদাস। আলো উদাস। সঙ্গীত কাঁদছে। সময় ঘষটাতে ঘষটাতে চলছে। কাঁচের বড় দরজায় নাক সিঁটিয়ে সে দাঁড়িয়ে বাইরের ট্রাফিক দেখছে। তাড়াতাড়ি আমি তাকে 'খোদা হাফিজ' বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

"এখন সে আমার অনেক পেছনে। আমি বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছি। আমি এত ক্লান্ত কেন? আমাকে চুপচাপ বসতে দাও।" একটা পাথরের ওপরে বসতে বসতে কামাল বলল।

"চোরের মত আমরাও নিজের নিজের দেবতাদের ডাকলাম। কিন্তু দেখ, দেবতারাও ফাঁকি দিল।" তলঅত বলল সবুজ রঙের কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই কুয়াশায় বয়ে চলেছে। "আমি আঁধারের কোণায় আলো এবং ভয়ের সঙ্গমে পা ঠেকিয়ে, সোনার রঙে রাঙানো ভগবান প্রজাপতির মত জিনিসের ফের নামকরণ করছি।" তলঅত বলল।

"দেখ।" পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে সে দিগন্তের দিকে আঙুল উঠাল—"মাইকেল, ওইদিকে তোমার যেরুজালম! আমাদের সকলের যেরুজালম!"

"যেরুজালম দুই ভাগে বিভক্ত!" হরিশংকর বলল। "এবং পাহাড়ের গায়ে গায়ে হজরত দাউদের গীতিকার আর্তনাদ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যীশুর সঙ্গে আমাদের ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। যীশুর বদলে আমাদের ক্রুশবিদ্ধ করা উচিত—কেননা

আমরা চোর। আমরা ঈশ্বরের খুশীর ভাণ্ডার থেকে খুশী চুরি করতে চেয়েছিলাম!"—তলঅত বলল।

"আমার এখন কিছুই মনে পড়ছে না। ফেলে আসা বছরগুলি আমার চারিপাশে সারস পাখির মত উড়ছে। ঘুমন্ত বাড়ীর চিমনির ওপর দিয়ে চাঁদ গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইস্ট-এংগিলিয়ার জঙ্গলে ভীষণ হাওয়া বইছে। সমুদ্রের কাল জলের ওপর রাতের পাখি চক্কর কাটছে।

"আমার সামনে দিয়ে ভিড় এগিয়ে চলেছে। ঝিলে নৌকা বইছে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার জাহাজ খুঁজছি। আমাকে এমন একটা জাহাজ খুঁজে বের করতে হবে, যা নিঃশব্দে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করবে। সেই জাহাজ শুধু সেই দিকেই যাবে, যেদিকে গেলে কেউ বলবে না। এস তোমাকে স্বাগতম জানাই।"—কামাল বলল। কুয়াশা এখন গভীর।

"রূপ আর নাম।" হরিশংকর বলল।

"বিদ্যা ও অবিদ্যা!" তলঅত বলল।

"এখন আমরা বুঝতে পারছি!" সবাই এক স্বরে বলল।

কেননা ভাবনা ও বিচারের সব থেকে উঁচু পাহাড়ে চিরদিন সেই একলা দাঁড়িয়ে থাকে। একলা, চিরদিন থেকে চিরদিন পর্যন্ত যে থাকে, যার নাম গৌতম এবং হরি এবং স্ত্রিল এবং কামাল রজা…। তার নিঃসঙ্গতা অমিট।

শীতল হাওয়ায় তাদের স্বর ডুবে গেল এবং সবুজ কুয়াশা তাদের ঢেকে ফেলল।

তিপান্ন

জাহাজের বারান্দায় অর্কেস্ট্রার বিদায় সঙ্গীত। কামাল রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। লণ্ডনে তাকে বোট ট্রেনে পৌঁছতে অনেকে এসেছিল কিন্তু পোর্টস্মিথে সে একলা। অজানা বন্দর, অজানা মুসাফির; অজানা এক পৃথিবী যেন তার সামনে। সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল। দুচোখ ছেয়ে জল আসছে. পাশেই দুই বুড়ো দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখল। কামাল সকৃতজ্ঞ নয়নে তাকে দেখল। বুড়োর দৃষ্টি বন্দরের দিকে। জাহাজ নোঙ্গর তুলল, সে কেবিনে চলে এল।

দ্বিতীয় দিন পুরো জাহাজটা খুঁটিয়ে দেখল সে। হিন্দুস্থানী ও পাকিস্থানী ফরেন সার্ভিসের কিছু অফিসার তার সহযাত্রীর ফৌজী অফিসার...ছাত্র ইংরেজ ও আমেরিকান এবং ট্যুরিস্টরাও তার সহযাত্রী। গরীব ছাত্র, অশিক্ষিত শিখ ব্যবসাদার, মিশনারি, ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরাও তার সহযাত্রী। এক ফরাসী ভিক্ষুও চলেছে। পণ্ডিতজী, লণ্ডনে যাঁর সঙ্গে কামালের পরিচয় হয়; ইনি ছুটি কাটাতে বাড়ীর দিকে চলেছেন; ওরিয়েণ্টাল স্কুলে পড়ান। শুদ্ধ হিন্দী বলেন। মিরাট তাঁর বাড়ী। ঘন কালো লম্বা চুল, মেয়েদের মত সুন্দর চেহারা; মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, অত্যন্ত সহৃদয় ও বিনম্র লোক। লণ্ডনে শীতকালেও ইনি ধুতি ও চটি পরেন। ব্রজ-লোকগীতি নিয়ে গবেষণা করছেন। মাইকেলও ট্যুরিস্ট ক্লাসে আছে। সে জিব্রাল্টার পর্যন্ত সঙ্গ দেবে।

একদিন কামাল জাহাজের বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখছে। পেছন থেকে একটুকরো কথা ভেসে এল

"আমি বসতে পারি?"

"নিশ্চয়!" মাথা ঘুরিয়ে কামাল দেখল, সেই বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে হাসছে যে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার জন্য যায়গা করে দিল।

"ফ্রেড পল ! তোমরাও এদিকে এস।"

কিছুক্ষণ পর দুজন ইয়োরোপিয়ান এগিয়ে এল।

"আমি ডক্টর হেন্স ক্রেমর, অস্ট্রিয়ান। আমি ও আমার বন্ধুরা ইতিহাসের অধ্যাপক, ইণ্ডিয়া চলেছি। তুমি সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ?

"হ্যাঁ।"

"আগে ভাগেই জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হলাম কেননা গত কাল একটি মেয়েকে ইণ্ডিয়ান বলতে সে বিরক্ত হল। সে পাকিস্থানী।" তিন বৃদ্ধই হাসল। কামাল কথা বলল না।

"তুমি ইণ্ডিয়ায় থাক ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমি বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে চলেছি।" ডক্টর ক্রেমর বলল।

"ও…বুদ্ধ জয়ন্তী !!"

"বুডা ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।" পল বলল।

"তুমি হিন্দু ?"

"আজ্ঞে না।"

"ক্ষমা কোরো। আমার ভুল হয়েছে। তাহলে তুমি মহমেডান ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ইণ্ডিয়ায় থাক কেন ?"

"হাই ডাক !" আমেরিকান খুশী মনে তার কাছে এসে বলল, "হাই।"

"হাই।" কামালের উত্তর।

"আমার নাম টমাস জেরেল্ড এটকিংস। আমাকে টম বলে ডাকবে।"

"অন্যান্য জার্নালিস্টরা কোথায় ?" ফ্রেডের প্রশ্ন। তারাও এল। তাদের মধ্যে একজন ফরাসী, মরিস ইণ্ডো চায়না চলেছে। অন্য একজন প্রসিদ্ধ কবি, বি. বি. সি'র প্রতিনিধি হয়ে বুদ্ধের পঁচিশ শততম জয়ন্তীতে যোগ দিতে ভারত চলেছে। কয়েকজন ধনী আমেরিকান মহিলাও একই উদ্দেশ্যে ভারত চলেছেন। এক ফরাসী ভিক্ষু বাসন্তী রংয়ের চাদর মুড়ি দিয়ে এক কোণে বসে আছেন। তিনিও

গয়া ও বেনারস চলেছে। সে টুরিস্ট ক্লাসের যাত্রী। সন্ধ্যে বেলা কামাল মাইকেলের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। পণ্ডিতজীও তাদের গ্রুপে যোগ দিল। একটি মারাঠী মেয়ে খুব ভাল গান গাইত। পণ্ডিতজী কীর্তন করতেন, রাত্রে বলরুমে নাচ ও সিনেমার আয়োজন করা হত। যাত্রা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যেতে লাগল।

আগামী কাল সকালে জাহাজ জিব্রাল্টর পৌঁছবে। বিভিন্ন গ্রুপে মিশে তাস খেলে, সাঁতার কেটে, লাইব্রেরীতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়তে পড়তে সে বোর হয়ে গেছে। জাহাজের চক্কর কেটে সবচেয়ে উঁচু ডেকে উঠে এল সে।

পাশে কারা যেন সরবে কথা বলছে। কামাল দেখল ঘরে ডক্টর ক্রেগ নিজের বন্ধুদের সাথে বসে আছে। মাইকেল রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। সেই আমেরিকান মেয়েটি মেঝেতে চাদর বিছিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। কেউ গীটার বাজাচ্ছে।

"লেখ।" মাইকেলের স্বর।

"কি লিখব?" টম বলল।

"আমি যা বলছি তার মূল রিপোর্ট করো, কেননা মিথ্যে কথা বলেই তুমি তোমার জীবিকা অর্জন কর।" মাইকেল চেঁচিয়ে উঠল।

"হায়!" কামাল ভাবল। মাইকেল ও টম আবার ঝগড়া করছে।

"দেখ কামাল রজা আসছে। ফিরে গিয়ে যে বই লিখবে তাতে উল্লেখ করতে ভুলবে না যে জাহাজে এক ইণ্ডিয়ান মুসলিমের সঙ্গে তোমার দেখা হয় এবং সে পাকিস্থানের কট্টর বিরোধী কিন্তু ৫৫ সালের হিন্দুস্থানেও তার কথা কেউ বুঝতে চাইত না।"

"আহা!" পণ্ডিতজী মাথার চুল পেছন দিকে ছুঁড়ে বলল— "আসুন রজাজী। মাইকেল আর একটা ভাষণ দিচ্ছে!"

"আহা, পণ্ডিতজী! মাইকেলের কটুতার বিষনাশক আমার কাছেও নেই।" কামাল হেসে শুদ্ধ হিন্দীতে উত্তর দিল।

ইংরেজ কবি তাদের দুজনকে লক্ষ্য করছে। "বড় ঝামেলার ব্যাপার" টম কামালকে বলল, "যে বিদেশী তোমাদের দেশ নিয়ে

কিছু লিখতে চায়, তোমরা ই. এম. ফর্স্টারের সাথে তার তুলনা করবে, যে স্বয়ং আইডিয়ালিস্ট ছিল ? বামনদের দুনিয়ার ঈশ্বর !" ১৯১৪ সালে ফর্স্টার উপন্যাস লিখতে শুরু করে। সেই সময় সে ডক্টর আজিজকে ভারতীয় প্রতিনিধি পাত্র হিসেবে পেশ করেছিল, ইংরেজ কবি বলল। "যদি ফর্স্টার আজ দ্বিতীয় "প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" লিখতে চায় তাহলে এই পাত্রটিকে বদলাতে হবে। আজ ডক্টর আজিজ ভারতীয় প্রতিনিধি নয়। আজ প্রত্যেকটি মুসলমানকে পাকিস্থানের প্রতিনিধি ভেবে নেওয়া হয়।

"হ্যাঁ।" কামালের উত্তর।

কামাল তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছ ? কবি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি দুঃখী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাই না। হিন্দুস্থানের আত্মা সদা সর্বদা দুঃখ সহ্য করে এসেছে। এই প্রশান্তি, এই প্রেম, এই আমাদের দুঃখ সহ্য করবার অভ্যাস, তুমি মুসিও পাল বগার মত ধুতি পরে পথে বসে পড়লেও সম্ভবত কল্পনা করতে পারবে না !"

"সেণ্ট আংগস্টান বেনারসে জন্ম লাভ করেন নি। মরিস বলল।

"ক্যাথলিক জীবন দর্শন একটি বিশেষ কাল্ট। এই দর্শন জীবনের পূর্ণাংগ রূপ আত্মসাৎ করতে পারে নি ; তাই আজও তোমরা ক্যাথলিক হয়েও ইণ্ডো চায়নায় যুদ্ধ করতে যাও।" কামাল রেগে উত্তর দিল।

"অবজ্ঞারভার ও কম্বাটমেণ্টে কি পার্থক্য ?" মরিস জিজ্ঞেস করল।

"তুমি স্বয়ং নিজেকে জিজ্ঞেস কর। অন্যেরা যুদ্ধ করবে, তোমরা সেই যুদ্ধ অবজ্ঞারভ করবে—এই ভাবে অপরাধ বোধ কি কমে যায় ?" কামাল বলল।

"আমার মনে হয় তুমি কুয়েকর্জের মত শান্তিবাদী।" টম বলল।

'ভোর ভয়ে গইয়ণ কে পিছে মধুবন মোহে পাঠায়ো !' ডেকের ধারে লীলা ভাস্কর গাইতে শুরু করল। কামাল গানের প্রতি আকর্ষিত হল। পণ্ডিতজী তাল দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তারা লীলা ভাস্করের দিকে চলে গেল।

"প্রত্যেক কালচারের একটি বিশিষ্ট গুপ্ত ভাষা আছে। এই ভাষা কেবল সেই কালচারই বোঝাতে পারে।" ইংরেজ কবি বলল।

"কিন্তু স্পেংগলর!" টম বলল, "পণ্ডিত ও কামালের কালচার এক কোথায়?"

"তুমি তো মাইকেলের গুপ্ত ভাষাও বুঝতে পার না।" ইংরেজ কবি হাসতে হাসতে বলল।

ড্রাই মার্টিনী মাইকেলের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। সে কোণায় চুপচাপ বসে আছে। নাম শুনে চমকে উঠল। মেকানিকী আন্দাজে যেখানে সে কথার খেই ছেড়েছিল, সেখান থেকে আবার বলতে শুরু করল।

"লেখ!" সে চেঁচিয়ে বলল, "লেখ! বিশ্বের ইতিহাস-জয়, রাজ্যের প্রভাব বিস্তার এবং দেশের প্রগতি। আমার ওখানকার ইতিহাস দারুণ কষ্ট ও বেদনার ইতিহাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমাকে ব্রিটেন থেকে বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রান্স থেকে। পঞ্চদশ শতকে স্পেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আমি ভবঘুরের মত, সারা বিশ্বের ধিক্কার সহ্য করেও পূর্ব ও পশ্চিম দুই জায়গায়ই অশ্রু দিয়ে দীপ জ্বালিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ ছড়িয়েছি। আমি বু-অলীসীন, ইব্‌নে খুন্দূল, ইমাম গজ্জলী অল্‌ফারবী ও খোয়ার জমীরের দর্শন পৃথিবীকে দিয়েছি। আমি..."

লীলা ভাস্কর গান গেয়ে চলল। কামাল নীচের ডেকে নেমে এল, ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেল। মাইকেলের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবল, কাল সকালে মাইকেল জিব্রাল্টারে নেমে যাবে। এবং তারপর আর কোনো দিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। মাইকেলের কেবিনের বাইরে রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল। সামনে পূর্ণিমার চাঁদ দিগন্ত ছুঁয়ে উঠছে। ডেকের এদিকটা শান্ত। তরঙ্গ কেটে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। দূরে এক কোণায় ফরাসী ভিক্ষু তার দিকে পীঠ ফিরে বসে আছে।

কামাল নিজের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তি অনুভব করছে। হঠাৎ নীরবতা এমনভাবে গর্জে উঠল, যেন কানের পর্দা ফেটে যাবে। টম

ও ইংরেজ কবির কথা তার মনে পড়ল। তার আর ভাল লাগছে না। কোনো রকমে রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি স্টেটলেস! আমি স্টেটলেস!!" সে জনান্তিকে বলল।

সমুদ্রের শ্বেত তরঙ্গ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত নীল চাদরের ওপর যাত্রী বোঝাই জাহাজ এগিয়ে চলেছে। যাত্রীদের মধ্যে ইয়োরোপের বিদ্বান, ইটালীর পাদরী, আমেরিকান পর্যটক, মেক্সিকোর চিত্রকর, হিন্দুস্থানের নর্তক। দুনিয়ায় এখন শান্তি। দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুর শাসন চলছে। জীবন এখন সহজ, প্রাণোচ্ছল।

"তারা বড়ই ভাগ্যবান যারা মনের শান্তি পেয়েছে। তাই আমি শান্তি চাই।" কামাল ধীরে ধীরে বলল। ফরাসী ভিক্ষু তার কথা শুনতে পেল। চোখ তুলে তাকে দেখল। ভিক্ষুর চেহারায় স্নিগ্ধ শান্তি ও শাশ্বত প্রসন্নতা। এমনি এক পূর্ণিমার রাতে, আড়াই হাজার বছর আগে, সমুদ্রের ওপারে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চতুর্দশীর চাঁদ সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসছে। কামাল ও ভিক্ষুর চেহারা চাঁদের আলোয় উদ্‌ভাসিত।

"আমাকে আমার ভাবনা-চিন্তা থেকে মুক্ত কর। কামাল বলল।

ভিক্ষু তার রহস্যময় নীল চোখ মেলে তাকে দেখল।– চিন্তা··· চিন্তা স্বয়ং কে জানেনা স্বয়ং বাইরে যেতে পারেনা। সৃষ্টির বাইরে ঈশ্বর নেই এবং ঈশ্বরের বাইরে সৃষ্টি নেই। সত্য ও অসত্যে কোনো তফাৎ নেই কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে পরম সত্য শূন্য। সে ফরাসী ভাষায় বলল।

"এই শূন্য, এই নীরবতাকে আমি ভয় পাই।" কামাল বলল।

"শূন্য! ···নীরবতা!···শূন্যতা!"

"এই কল্পনা করেও আমি ভীত! কামাল বলল। এই দারুণ নীরবতা আমি কি করে সহ্য করি? একলা কোথায় যাই? তুমি আমাকে সঙ্গ দিতে পার না? মহাযানী ফরাসী ভিক্ষুকে কামাল সন্দেহের চোখে দেখল।

"আমি স্টেটলেস!" এবং এটা তোমার সুখবরী নয়? সে মনে মনে বলল এবং ডেকে ফিরে গেল।

চুয়ান্ন

হিন্দুস্থানের সমুদ্র তট।

বম্বে!! ঘর!!! ঘর??

কামাল লক্ষ্ণৌ পৌঁছল। 'গুলফিশাঁ'র ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। পৃথিবী অনেকটা বদলে গেছে। বাগানের গাছ শুকিয়ে পুড়ে ছাই হয়েছে। মোটর গাড়ীর ঘর ও আস্তাবল গোদাম ঘরে পরিণত হয়েছে। ("আত্মীয়-স্বজন, যারা পাকিস্থান গেছে; নিজের জিনিস-পত্র এখানে ফেলে গেছে"—খালা বেগম বলল)। সার্ভেন্ট কটেজ খালি। তার দৃষ্টি গঙ্গাদীনকে খুঁজল, কদীর ও কমরুণকে খুঁজল। হুসেনী বিবি, রাম অবতার ও চুটকীকে খুঁজল। কেউ কোথাও নেই।

শেষে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার দু চোখ ছাপিয়ে জল, সে কাঁদছে; শিশুর মত। মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, দুনিয়া যেখানে ছিল সেখানেই আছে—'গুলফিশাঁ', আত্মীয় স্বজন, লক্ষ্ণৌ—সব যেমন ছিল তেমনই আছে। শুধু সে বদলে গেছে। সে কি নিজের পিতার দারিদ্র্য দেখে ব্যাকুল হয়েছে? কিন্তু সে স্বয়ং সারা জীবন জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেল!

"বড় বড় জমিদারী স্টেট ধ্বংস হয়ে গেল, আমাদের কথা আর নাই বা তুললাম।" সন্ধ্যে বেলা আপ্পী তাকে বলল। তিনি তাকে দেখবার জন্য ঝাঁসী থেকে এখানে এসেছিলেন। নানপারার ক্রাকরী বিক্রী হতে চলেছে। রাজা সুরজ সিং অর্থাভাবে কোনো রকমে দিন কাটাচ্ছে। অম্মী নিজের অর্ধেক গহনা বিক্রী করেছেন।

"আপনি কি স্থির করেছেন?" কামাল বাবাকে জিজ্ঞেস করল—"কার্বালা যাবেন, না পাকিস্থান?"

"এখানেই থাকব।" তিনি সহজভাবে উত্তর দিলেন—"পালাব কেন?"

এবার কামালের অবাক হবার পালা। "কিন্তু বাবা, আপনি মুসলীম লীগের একজন প্রচণ্ড সমর্থক, লীগে যোগও দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাকিস্থান সৃষ্টি হল ঠিক আছে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই?"

"পাকিস্থানকে নিজের দেশ মনে করেও এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি ওখানে যেতে চাইছেন না, না হিন্দুস্থানকে স্বদেশ মনে করেন এবং স্বদেশ প্রীতির জন্য এই দেশ ছাড়তে চাইছেন না?"

"তোমার সাথে তর্ক করা বৃথা। তোমার বুদ্ধি সব সময়েই ভ্রষ্ট।" নবাব সাহেব উত্তর দিলেন।

"আমীর ভাইয়ার বিবির দরজায় মাথা ঠুকতে আমি করাচী যাব না। এখানে নিজের বাড়ীঘর তো আছে? অবশ্য আমার আর এখানে ভাল লাগে না।" আম্মা বেগম বললেন।

কয়েক দিন পর কামাল চাকরি খুঁজতে শুরু করল। তার কাছে অগুনতি ডিগ্রী। ট্রিনিটী-কলেজ, কেম্ব্রিজ, কয়েক বছর ধরে ব্রিটেনের এক প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরীতে চাকরি করেছিল কামাল। ব্রিটেনের চাকরি ছেড়ে সে দেশের সেবা করতে এখানে ফিরে এসেছে।

ছ মাস কেটে গেল। দিল্লীর চক্কর কেটে কেটে সে প্রায় পাগল হয়ে গেল।

"মিয়াঁ। কোনো মিনিস্টারের ব্যাকিং নিয়ে এস।" নবাব সাহেব বললেন।

"পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির সাহায্য আমি মরে গেলেও নেব না। আমার ডিগ্রী, আমার যোগ্যতা কি কম যে আমি মিনিস্টারের কাছে দৌড়ব?"

আজকাল সে সারাদিন 'গুলফিশাঁ'র চুপচাপ শুয়ে থাকে অথবা তলঅতকে চিঠি লেখে। 'মরে গেলেও হিন্দুস্থানে এস না। এখানে এলে আমার মতই অবস্থা হবে তোমার।'

"তোমার হল কি ?" তলঅত উত্তর দিত। "সংঘর্ষ করবার সাহস হারিয়েছ ? এই তো সময়। মজদুরী কর, মাঠে চাষ কর। একেই তো বিপ্লব বলে। তুমি কি খুব স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের স্বপ্ন দেখেছিলে ? যদি তাই হয় তো পাকিস্থানে চলে যাও। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে সারা জীবন কথা বলব না।

"মেয়েরা কি একটু বেশী সাহসী হয় ?—কামাল ভাবে, অথবা তারা আদর্শবাদী ? যাই হোক তলঅতের চিঠি তার মনে সাহস যোগায়।

নিউইয়র্ক থেকে গৌতম তাকে ক্রমাগত চিঠি লেখে। সে উত্তর দেয় না। কামাল কি লিখবে ? হরিশংকর আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে, ব্যাঙ্গালোরে চাকরি নিয়েছে।

ভাইয়া সাহেব করাচী থেকে একটার পর একটা চিঠি লিখছেন— "এক্ষুনি এখানে চলে এস। অনেক ভাল ভাল চাকরি তোমার অপেক্ষায় আছে। অযথা সময় নষ্ট কর না, জেদ ছাড়।"

শেষ পর্যন্ত এমন হল যে কামাল ভাইয়া সাহেবের চিঠি খোলা ছেড়ে দিল। কিছু দিন পর বারাবংকী কলেজে সে একটা চাকরী পেল কিন্তু সেই সময়ই 'গুলফিশাঁ'র কাস্টোডিয়ানের ঝগড়া শুরু হল। ভাইয়া সাহেব পাকিস্থানী এবং গুলফিশাঁ তথা অন্যান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁরও অংশ আছে তাই কোর্টে প্রমাণ করতে চাইল, 'গুলফিশাঁ' ত্যাগ করা সম্পত্তি। নবাব সাহেব কাস্টোডিয়ানের ফয়সলার বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করলেন। কামাল সারা দিন এই সব ঝামেলায় চকির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার কণ্ঠস্বর এখন কটু। তার মুখে হাসি দেখা যায় না। হল্লা করা সে যেন ভুলেই গেছে।

"বুর্জোয়া বিপ্লবী ছিলেন মহাশয় ! যখন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, সব বুলি উড়ে গেল।" কফি হাউসের কমরেডরা ব্যঙ্গ করল।

হুসেনী ও তার বিবি, ভাইয়া সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে করাচী চলে গেছে। কদীর ও কমরুণ, মোটর গাড়ী বিক্রী হবার পর অনেক দিন আগেই মির্জাপুর চলে গেছে।

একদিন সে দিল্লীতে বেলা রোডে লাজের বাড়ীতে বসে একটা আবেদন পত্র লিখে ডাক বাক্সয় পোস্ট করতে যাচ্ছিল, পথে তার জাহাজের সহযাত্রী টমাস এটকিংগের সাথে দেখা।

"হ্যালো—তুমি এখানে কোথায় ?" কামালের প্রশ্ন।

"আমি সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। দক্ষিণ ও বাংলা, আসাম ও উড়িশা। এখন রাজস্থান যাবার ইচ্ছে আছে।

"তুমি দিল্লী দেখেছ ?"

"না।"

"আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবন দেখেছ ?" কামাল আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল। "নতুন নতুন ইমারৎ, নতুন হিন্দুস্থানের প্রতীক, রাজঘাট—এবং—এবং—" হঠাৎ সে যেন পুরোনো কামাল হয়ে গেল—জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত, হিন্দুস্থানের সুপুত্র। দিল্লীর সবকিছু দর্শনীয় সে তাকে দেখাল।

"আজকাল তুমি করছ কি ?" টমের প্রশ্ন।

"কিছু না, চাকরি খুঁজছি।" পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে সে বলল।

"এদেশে অনেকে বেকার। বেকারী বিরাট সমস্যা এ দেশে।" টম বলল।

"প্রত্যেকের জন্য। আমি তো একলা নেই। যখন সুদিন আসবে —সকলের জন্য আসবে। হিন্দু ও মুসলমান—সকলের জন্যই সমান ভাবে। ডুবলে আমরা এক সঙ্গে ডুবব। বাঁচলে এক সঙ্গে বাঁচব।"

"কিন্তু তুমি নবাবের সন্তান। মজুরী করতে পারবে না।" গুলশন বলল। সে ব্রডকাষ্টিং হাউস থেকে এদের সঙ্গে আসছে।" তুমি নিজেকে ডিক্লাস করতে পারবে না।

"বাজে কথা।"

"তাহলে এস আমার সঙ্গে ট্রাকটার চালাও।"

ট্রাক্টার চালাবার ট্রেনিং নিয়ে থাকলে আমি নিশ্চয় সে কাজে যোগ দিতাম। দুঃখ হয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পেছনে আটটি বছর নষ্ট করেছি।

"শুনেছি পাকিস্থানে সাইন্স-জানা লোকের ভীষণ কদর। পাকিস্থান যাও। এখানে সময় নষ্ট করছ কেন?" গুলশনের প্রস্তাব।

"তুমিও এই কথা বলছ?" কামাল সাশ্চর্যে বলল।

"হ্যাঁ, বলছি।" গুলশনের শান্ত উত্তর।

শেষ পর্যন্ত সে দিনও এল, যেদিন কামাল দিল্লী গিয়ে ভিসার জন্য আবেদন পত্র পেশ করল। কয়েক রাত বিনিদ্র কাটাল সে। নিজেকে আড়াল করে রাখল। 'গুলফিশাঁ'র শূন্য কামরাগুলো যেন এক একটা আকৃতি। দরজা বন্ধ হয়, বাতাসে পর্দা কাঁপে। ভেতরে বৃদ্ধ নবাব সাহেব কাশতেন। বাইরে বারান্দায় আম্মী বেগম আল্লার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতেন—আল্লা, কম্মনকে একটা চাকরি জুটিয়ে দাও! কম্মনকে সাহায্য কর! (বারুবংকীর অস্থায়ী লেকচারারের চাকরি আর নেই) কামাল সব সময় নিজেকে বলত—'তুমি ভীরু! ছোটলোক! কাপুরুষ! তোমার সেই ন্যাশনলিস্ট ট্রেনিং কোথায় গেল?' তলঅত ঠিক বলত—লাঙল চালাও, মজুরী কর, যে কোনো ভাবে নিজের দেশে থাকবার চেষ্টা কর। কিন্তু তুমি বেইমান, সুবিধেবাদী! আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটা চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও তার জন্য কোনো যায়গা খালি নেই। তবুও সে মনে মনে স্থির করে রেখেছিল—না খেতে পেয়ে মরে গেলেও সে নিজের দেশ ছাড়বে না।

ঠিক সেই সময় আদালত হুকুমনামা জারি করল। 'গুলফিশাঁ' স্যার জকী রজার নামে রেজিস্ট্রী কর। তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী আমীর রজা বর্তমানে পাকিস্থানী। 'গুলফিশাঁ' ত্যাগ করা সম্পত্তি। দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে কামাল লক্ষ্ণৌয়ে, নিজের দেশে, উদ্‌বাস্তু। তৃতীয় দিন পুলিশ 'গুলফিশাঁ'য় তালা লাগাতে এল। চতুর্থ দিন কামাল নিজের বৃদ্ধ মা ও বাবাকে নিয়ে ট্রেনে চাপল। পঞ্চম দিন ট্রেন বর্ডার পার করল। সপ্তম দিনে কামাল রজা করাচী, পাকিস্থানে পৌঁছল।

পঞ্চান্ন

করাচী আজকে, ৫৬ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইস্‌লামী দেশ এবং পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ দেশের রাজধানী। এখানে নব্য ধনিক সম্প্রদায়ের রাজত্ব।

করাচী অত্যন্ত আধুনিক শহর। প্রতি রাত্রে এখানকার হোটেলে ও ক্লাবে যেন স্বর্গ নামে। এই নতুন সামাজিক জীবনের ভিত হল টাকা। অন্য দিকে তীব্র ফ্রস্ট্রেশনের অনুভূতি। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারের ফ্রস্ট্রেশন—সে আরও বেশী কালো টাকা উপার্জন করতে পারছে না কেন। ইন্টেলেকচ্যুয়ালরা নিরাশ হচ্ছে—এ দেশে বিপ্লবের আর কোনো আশা নেই। জমায়তে-ইসলাম হাল্লা জুড়ে দিয়েছে—মুসলমান মেয়েরা বেপর্দা ঘুরছে, বলরুমে নাচছে। মধ্যমবর্গের লোকেরা হাজার রকমের চিন্তায় ডুবে আছে।

তাছাড়া বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও উদ্‌বাস্তুদের ঝগড়া তো লেগেই আছে।

হিন্দুস্থান প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে—দেশের বিভাজন ভুল। পাকিস্থান প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে—দুই সম্প্রদায় কালচার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা পৃথক। অতএব বিভাজন উচিত ও যুক্তিসঙ্গত।

ওদিকে হিন্দুস্থান বলছে, পূর্বের সভ্যতার জনক ভারত। গুপ্ত-কালের স্বর্ণযুগের কথা প্রচার করা হয়। এদিকে খেলাফতে রাশিদা, অব্বাসী ও মোঘলদের জয়গান গাওয়া হয়। দুই দেশ সমান তালে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচার স্থল পশ্চিমী দেশ। বিশ্বের ইসলামের দায় দায়িত্ব যেন পাকিস্থান সরকারের। অতীতে ইসলাম স্নিগ্ধ ও পবিত্র এক নদীর মত এগিয়ে গিয়ে এক বিরাট জলপ্রপাতের রূপ নিয়েছিল। পাকিস্থানের কৃপায় সেই বিরাট জলপ্রপাত সরু, নোংরা নালায় পরিবর্তিত হয়েছে।

মজার ব্যাপার ইসলামের স্লোগান যারা তুলছে, ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা জানে মুসলমানরা

আটশত বৎসর ধরে ক্রিস্টান স্পেনের ওপর রাজত্ব করেছে ; এক হাজার বছর হিন্দু ভারতের ওপর ; এবং চারশত বছর পূর্ব ইয়োরোপের ওপর। অথচ ইসলামের মহান ঐতিহ্য মানব প্রেম ; সে কথা তারা বলে না কখনো। আরব দার্শনিক ইরানী শায়ের ও সুফিদের উদারতার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এদের কাছে। আলী ও হুসেনের দর্শনের সাথে এদের কোন যোগাযোগ নেই। ইসলামকে এরা একটি আগ্রাসী ধর্ম ও জীবন দর্শন রূপে চিহ্নিত করছে।

অবশ্য কিছু ভাল কাজও হচ্ছে। দেশে কলকারখানা গড়ে উঠছে। অসংখ্য মেয়েরা ডাক্তার নার্স ও লেকচারারের কাজ করছে। পাকিস্থানের মেয়েরা সত্যিই উন্নতি করছে।

রাত কেটে যাচ্ছে। আমার মনে যা কিছু আসছে, লিখে চলেছি। সম্ভবত চিঠিটা অসংলগ্ন, খাপছাড়া মনে হবে তোমার কিন্তু তোমাকে অনেক কথা জানাতে চাই, চাই আমার চোখ দিয়ে আমার নতুন দেশকে তুমি দেখে নাও। আমাকে সাহস দাও, আমি এই দেশের ভাল মন্দ কিছু যেন করতে পারি।

দেখ তলঅত, আসল কথা হল, হিন্দুস্থানে মধ্যম বর্গের মুসলমানরা আজ ভেঙ্গে পড়েছে। সাংস্কৃতিক ও আর্থিক সুরক্ষার জন্য তারা পাকিস্থানে আসছে।

মুসলমান ছাত্ররা যখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোয়, তাদের আক্ষেপ—ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাদেরকে নেওয়া হয়না, কেননা তাদের দেশপ্রেম সন্দেহাতীত নয়। মুসলমান পরিবার ভাঙ্গছে। এক ভাই পাকিস্থান আর্মীতে চাকরি করছে, অন্য ভাই নেভীতে। তৃতীয় ভাই আজাদ-কাশ্মীর রেডিওতে ব্রডকাস্টার। চতুর্থ ভাই পাটনায় বি. এস. সি. পড়ছে কিন্তু সে ভারতীয় বায়ুসেনায় আবেদন পত্র পাঠাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তাই সে পাটনা থেকে আসে পাকিস্থানে, এখানে এসেই জেটপাইলটের চাকরি পায়। কম্পিটিশনে বসে সে যদি পাশও করে তবুও তার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাকে ভারতে চাকরি দেওয়া হবে না।

উনবিংশ শতাব্দী, অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে

মন কষাকষির সুত্রপাত। হিন্দু বহুসংখ্যকদের হাতে মার খাবার ভয়ের এই সাইকোলজির কথা পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার পানিক্কর, দুজনেই বলেছেন। যদি এই ভয় দূর করা হত, তাহলে কি হত? এই যদি ইতিহাসের অনেক বড় প্রশ্ন। এই কাজ অবশ্য কংগ্রেস করতে পারত।

ভাষার সমস্যা আরেকটি দারুণ সমস্যা। মুসলমানদের হিন্দুস্থান ত্যাগ করার পেছনে এটাও একটা কারণ। আজ হিন্দুস্থানে উর্দু কে শুধু মুসলমানদের ভাষা মনে করা হয় অথবা উর্দু এককালে হিন্দুও মুসলমানদের, দুই সম্প্রদায়েরই ভাষা ছিল।

আমি আবার এখানকার অবস্থায় ফিরে আসছি। আজকে জুমা-রাত্রি এবং আমি এক ইণ্টেলেকচুয়ালদের সভা থেকে একটু আগেই ফিরেছি। ছেলেমেয়েরা পশ্চিমী সাহিত্য, বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করছিল। এদের দেখে মনে হয়েছিল, তুমি যদি একবার স্বচক্ষে এদের দেখতে, এদের কথা শুনতে!

আজ সন্ধ্যায় সেখানে একদিকে ক্যাথলিক ফেথের ওপর আলোচনা চলছিল, অপরদিকে পশ্চিমের প্রতিক্রিয়াবাদী সাহিত্য ধিকৃত হচ্ছিল। এক ফরাসী আলজীরিয়ার ব্যাপারে গালাগালি সহ্য করছিল। আমেরিকান সাহায্যের জন্য লোক মেরী রিচার্ডের মাথা খাচ্ছিল।

আমি অন্যদিকে ঘুরলাম। এক ফরাসী ইণ্টেলেকচুয়ালকে ঘিরে কয়েকজন ছেলেমেয়ে বসেছিল।

"ফ্রান্সের বর্তমান পরিবর্তনশীল অবস্থায় পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের সর্বনাশ হতে চলেছে। ইয়োরোপের কালচারের প্রতীক সেই ফ্রান্স আজ আর সে ফ্রান্স নেই—নিজেকে রক্ষা করার রসদ তার আর নেই।" তনবীর গর্জন করে উঠল—"আজ যদি মাত্র দ্বিতীয়বার প্রায়শ্চিত্ত করে আমি আশ্চর্য হব না।" পশ্চিমী সভ্যতার যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। "ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা আমেরিকার টাকা খায়" আমি ঘুরতে ঘুরতে আমেরিকানদের পাশে এসে বসলাম। অন্য দলে ছিল একজন প্রসিদ্ধ মার্কিন ঐতিহাসিক।

"গৃহযুদ্ধের ফলে যদি আমেরিকা ভাগ হয়ে যেতো তাহলে জানিনা আজ আমাদের কি অবস্থা হত!" আমেরিকান ভদ্রলোক বলল। তুমি তোমার সেই থিওরী—আর্থিক সঙ্কটই দেশ বিভাগের কারণ, আউড়ে যেও না।" সে আমাকে দেখে হাত নাড়ল। "এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে আমি জানতে চাই।

"আমি জানতে চাই পূর্বের পতনের আসল কারণ কি?" হামিদা বলল। আমি টোয়নবীকে এই প্রশ্ন করেছি; উত্তর পাইনি। অষ্টাদশ শতকে হিন্দুস্থানের পতনের কারণ কি?"

"হিন্দুস্থানে চাষ করার সুব্যবস্থা ছিল না।" জ্যাকব মরিসন এক আমেরিকান ইণ্টেলেক্‌চ্যুয়ালকে বলল, "সমস্যাটি নিছক য়্যাগ্রোনেমিকল।"

প্রায় দেড়টায় আমাদের সভা ভাঙ্গল। যখন বাড়ী ফিরলাম, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছিলাম।

আমার প্রিয় বোন, তলঅত, আজকের সবচেয়ে বড় ঘটনা এই যে লক্ষ্ণৌয়ের বিপ্লবী, কংগ্রেসের উৎসাহী সমর্থক, সংযুক্ত ভারতের মহানতার প্রতীক তোমার ভাই কামাল রজা আজ সকালে বারশ' টাকার চাকরি পেয়েছে। একটা পুরো ল্যাবরেটরী সেটআপ করতে হবে। শীঘ্রই এরা আমাকে কিছু যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য আমেরিকা পাঠাবে। এই কাজেই আগামী সপ্তাহে আমি পূর্বপাকিস্থান যাচ্ছি। পরের চিঠি ঢাকা থেকে লিখব।

ভোর হয়েছে। রাত্রি জেগে তোমাকে চিঠি লিখেছি। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখলাম। করাচী জেগে উঠেছে। কাজ করতে চলেছে। হাজার হাজার লোক অফিস ও কল-কারখানার দিকে চলেছে। এরা তারাই যাদেরকে 'জনতা' বলা হয়। তলঅত, এরা কোনো দিন কোনো অন্যায় করেনি। এদেরকে দীক্ষিত করা হয়নি, এদের কে ক্ষুধিত রাখা হয়েছে। এদেরকে যা বলবে এরা তাই করবে অথচ একমুঠো অন্ন ও শান্তির নিদ্রা চাইবার অধিকার এদেরও আছে। তলঅত সকালবেলা হাজার মজুরকে যখন পি. আই. ডি. সির নতুন ডক ইয়ার্ডের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি, তখন প্রচণ্ড

আনন্দ হয়। এদের দেখে পাকিস্থানের ভবিষ্যতের প্রতি আমি আশ্বস্ত হই।

এরা বড় আপন ভোলা লোক। বাদ বিবাদ, আলোচনা, ইতিহাস ইত্যাদির ধার ধারে না এরা। সিন্ধ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্টেটে কারখানা খুলেছে, সেই কল-কারখানার মেশিন এরাই চালায়। যে দেশের নাগরিক এরা—তার নাম পাকিস্থান। অতীতকে নিয়ে দুঃখ করা, অশ্রুপাত করা হয়ত অর্থহীন কেননা ভবিষ্যত বলে কোনো জিনিস এখনো আছে। দুই দেশ আবার এক হয়ে যাবে, এ ভাবনা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর নক্‌শা প্রতি মহাযুদ্ধের পর বদলে যায়। '৪৫ সালের পরও বদলেছে। বিভাজনের কথা ভেবে আমার এখনো কান্না পায়। কিন্তু কত দিন কাঁদব। অর্ধেক জীবন কেটে গেল। কিছুটা বাকি আছে। যা বাকি আছে তাকে কাজে লাগাবার কথা ভাবা উচিত।

এই দেশে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, নিজের কোলে টেনে নিয়েছে। এর নির্মাণ অথবা ধ্বংস আমার হাতে। আমি সারা জীবন ধ্বংসকে ঘৃণা করে এসেছি, নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছি। তুমি কি মনে কর আমি এখানে হারিয়ে যাব? না, তলঅত আমি এরকম হতে দেব না।

আমি গড়ব, আমার নতুন দেশ গড়ব। পুনশ্চঃ গড়বার কথা লিখতে লিখতে মনে পড়ল, ভাইয়া সাহেবের এই কুটির, এখানেই আমি উঠেছি,—চমৎকার। ইতালীর স্থপতি বানিয়েছে। ভাইয়া সাহেবের স্ত্রী নামকরা সোসাইটি লেডী। বৌদি আমাকে সংসারী করবার প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার জন্য তিনি এক হাজার গজ জমি সংগ্রহ করেছেন। গতকাল যখন তাঁর ইটালিয়ান আর্কিটেক্‌ট বাড়ীর নক্‌সা নিয়ে আমার কাছে এল তখন ইচ্ছে হল, ডাক ছেড়ে কাঁদি।

তোমার—'কম্মন'।

ছাপান্ন

মধ্যযুগের ভারত। দেওয়াল থেকে ঘাস, ফুল উঁকি দিচ্ছে। পুরোনো দিল্লী ; বাংলা ও মালব্য ; আহমদাবাদ, জৌনপুর বহমিনীর ইমারৎ বিদর, গুলবর্গ !

উত্তর প্রদেশে ললিতপুর ও কালপী ; শিকোহাবাদ ও বদায়ুঁ এবং জৌনপুর। মোগলদের আগের হিন্দুস্থান।

ওড়িশা, মাদ্রাজ, কর্ণাটক, অজন্তা, এলোরা—ঘুরে ফিরে শ্রিল আবার মধ্যযুগের ইমারতে ফিরে আসে। অগুণতি নাম, অগুণতি যুগ, সময় ও সময়ের প্যাটার্ণ। সেই শ্রিল যে ইউরোপে প্রাচীন কেথে-ড্রালের প্রাচীরের পাশে ঘুরে বেড়াত, এখন জিপ্সীদের মত সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব প্রাসাদের গায়ে হাত রাখছে। পদ্মফুল, হাতী, গন্ধর্ব, সিঁড়ি মীনার,—সব ছুঁয়ে দেখছে। কোথাও কোনো অন্ধকার, নীরব প্রাচীরের পাশ দিয়ে দেহাতী মেয়ে ছাগল চরাতে বেরিয়ে পড়ত। কোনো ছেলে অশোক গাছের ডাল থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ত। কোনো অন্ধ ভিখিরী কোনো ভগ্নাবশেষের পাশে বসে গান গাইত। ওপরে ভাঙা মীনারের পিছনে নীল আকাশ। পশ্চিমের ঘাট ছুঁয়ে মেঘ চিতোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়ত। বে অফ বেঙ্গল থেকে মেঘ উড়ে রাজশাহী ও গৌড়ের আকাশ ছেয়ে ফেলত। মধ্য যুগের উদাস, মৌন, নীরব হিন্দুস্থান বর্ষার জলে স্নান করত। ঘাসের চারা হাওয়ায় কাঁপতো।

এই পাথরগুলো ভূত ও বর্তমান দুইয়েই উপস্থিত। শ্রিল কখনো কখনো এমন অস্থির হয়ে উঠত যে পালিয়ে বর্তমানের হাতে নিজেকে সঁপে দিত।

সারা হিন্দুস্থানে ঘুরে বেড়াবার পর (সে কাকে খুঁজেছে ? বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে।) সে আবার কলকাতায় এল। তারপর প্লেনে চড়ে পূর্ব-পাকিস্থানের শস্যশ্যামলা জমিতে আশ্রয় নিল। ও

ঢাকা ক্লাবে আকণ্ঠ বিয়ার খেয়ে শ্রীহট্ট যাবার জন্য ট্রেন ধরল।

তার গন্তব্যস্থল শেষ পর্যন্ত এই—

একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল। ঘুমন্ত অবস্থায় নানা অস্পষ্ট ধ্বনি সে শুনতে পেল। "ডিম বয়েল্ড—বয়েল্ড ডিম! সা-গরম (চা-গরম)—সা-গরম!—সা-গরম!—ডিম বয়েল্ড!" জানালা খুলে বাইরে দেখল। বাইরে বাতাসে ফুলের সুগন্ধ, ঘরে সবুজ ধানের খেত। এক বৃদ্ধ হিন্দু বাঙ্গালী, মাথায় পুঁটলী নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল! অনেকক্ষণ সে সেই বুড়োকে দেখল। তারপর বুড়ো ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে কত রকমের লোক, কি চমৎকার তাদের বেশ! মেয়েদের মাথায় বড় লাল টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, মুসলমান, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড পালকী বাহক···সে আবার ট্রেনে চলল। বাংলা ধ্বনি অন্ধকারে ডুবে গেল। ট্রেন আবার পুকুরের ধার ঘেঁষে চলছে। পুকুরে পদ্ম ফুল ফুটেছে। ফুলের পাপড়ী দিয়ে ঢাকা কোনো বাড়ীর দরজায় শাড়ি পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে। ঘোমটা টেনে, কিছু মেয়ের দল বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাদের নাম কি? আম্না, সকীনা, রেবা, রাধা। তাদের জীবন কাহিনী কেমন হবে? তাদের জীবনদর্শন, জন্ম থেকে মৃত্যুর ইতিহাস—যন্ত্রণা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ···আকাল···

সে চোখ বন্ধ করল।

"আল্লা কাপড় দে, পানী দে, ভাত দে রে।—আল্লা ভাত দে—!" তার কানে এই শব্দগুলো কোরাসের মত প্রতিধ্বনিত হল। সে একবার ঢাকায় ছাত্রদের মুখে শুনেছিল—'আল্লা ভাত দে! আল্লা ভাত দে!' বাংলাদেশ নিয়ে সে অনেক রোমান্টিক কল্পনা করেছে। সুজাতা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে অনেক লম্বা লম্বা লেকচার দিয়েছে। জসিমুদ্দীন ও লীলা রায়—লোকগীত গাইয়ে দল, সাহিত্যিক কনফ্রেন্স কোলকাতার থিয়েটার ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ এবং বেলভেডিয়ারের পুরোনো গভর্নমেণ্ট হাউস, যেখানে কখনো লর্ড কর্ণওয়ালিশ থাকত, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ক্লাইভ রোড,—এখনকার নেতাজী সুভাষ রোড এবং আলীপুর ও ধর্মতলা এবং

গার্ডেন রীচ। ট্রেন অন্য এক স্টেশনে দাঁড়াল।

তার কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলল। শ্বেতবস্ত্রধারী ডাইনিংকারের এক বেয়ারা ভেতরে এল।

"ডিনার সাহেব?"

"হ্যাঁ।"

ভালকরে কম্বল জড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

শ্রীহট্টের চা বাগানে শত-শত মজুর কাজ করত। রামদেও, রাম অবতার, লক্ষ্মণ ও সীতা, গেঁদা ও চম্বেলিয়া। পুরবীদের মধ্যে দুটি নাম অত্যন্ত প্রিয়—রাম ও সীতা। ভারতের অতীত, স্বর্ণ যুগ পাটলিপুত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, লক্ষ্মণবতী, শ্রাবস্তী—দিগ্‌বিজয়ী রামচন্দ্র ও মিথিলার জনককুমারী সীতা—আরে বাহরে ঐতিহাসিক!

"ডিনার সাহেব—? কফি দিই?" বেয়ারা খুব সন্তর্পণে ট্রে রাখল ও তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলল সে যেন দেবতা।

সে পুনরায় বর্তমানে ফিরে এল। মনে পড়ল, তাকে এখন শ্রীমঙ্গল পৌঁছতে হবে। রাঙ্গামাটি ও বন্দরবন। আরও অর্থ উপার্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিন ট্রেন সিলেট পৌঁছল। স্টেশনে তার ম্যানেজার পীটার জ্যাকসন মোটর গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। শহর ত্যাগ করে তারা শ্রীমঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

সুরমা নদীর ধারে পৌঁছে তারা মোটরগাড়ী থামাল। সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। হাতে লণ্ঠন নিয়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা নৌকোয় চড়ছে বা নৌকো থেকে নামছে। মোটর বোট সবেগে ওই পার থেকে এ পারে এসেছে। এক অন্ধ ফকির কোরাণ শরীফ পাঠ করে ভিক্ষে চাইছে।

মোটর বোটের তখতা জড়ো করে তার মোটরগাড়ী নৌকায় চাপান হল। নৌকায় প্রচুর লোক।

"প্রচণ্ড ভিড়। চল আমরা একটা অন্য নৌকায় যাই।" পীটার বলল। সে প্রতিবাদ করল না। সে তো নিজে নৌকোর মত জলে বয়ে চলেছে। তারা অন্য এক নৌকায় বসল। তীর ক্রমশঃ দূরে

সরে গেল। নৌকো মোটর বোটের পেছনে চলল। পানের পাতায় ঢাকা একটা কুঁড়ে ঘর, ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলছে। একটা চায়ের দোকানে লণ্ঠন জ্বালিয়ে কয়েকটি লোক কাগজ পড়ছে। দূরে দিগন্তের কাছে সারি সারি সুপাড়ির গাছ হাওয়ায় দুলছে। নদীর বুকে নৌকার সারি। শান্তি। শান্তি। অমিত শান্তি।

সহসা জোরে হাওয়া বইতে লাগল। নৌকো তরঙ্গের সাথে সাথে দুলছে।

বৃদ্ধ মাঝি হাল ধরে দাঁড়িয়ে। তার কণ্ঠে গান। সে দেখল অন্ধকারের বুক চিরে নৌকো এগিয়ে চলেছে। উপবাসে ক্লান্ত, জীবন যুদ্ধে পরাজিত বৃদ্ধ মাঝি ঝড় উপেক্ষা করে, বিরাট বিরাট তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে দাঁড় বেয়ে চলেছে। নির্মম মৃত্যু ও ভয়কে যেন সে ব্যঙ্গ করছে।

ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ব্রিল লণ্ঠন উঠিয়ে পীটারকে জিজ্ঞেস করল—"পীটার, আমরা ঝড়ে আটকে পড়েছি ?"

"না—তেমন কিছু নয়। চিন্তার কোনো কারণ নেই কিন্তু ওই কালো শুয়োরকে বল, গান বন্ধ করে সে যেন শক্ত হাতে হাল ধরে। অন্যথা নদী পার করতে ভোর হবে।"

"বেচারা বৃদ্ধ ?" ব্রিল ঝুকে দেখল, বৃদ্ধ শক্ত হাতে হাল ধরে আছে।

"এরা বড়ই নীচ।" পীটার বলল।

ব্রিল নৌকোর এক কোণা থেকে চেঁচাল।

"তোমার নাম কি হে ?"

"অবুল মোনসুর, সাহেব !"

"অবুল মোনসুর।" ব্রিল বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব ?"

"আজ্ঞে না সাহেব !" সে আবার দাঁড় বেয়ে চলল।

ব্রিল নৌকার ভেতরে দেখল। অবুল মোনসুরের মাটির প্রদীপ, চাটাই, নামাজ পড়বার সামগ্রী ও কাঁসার ঘণ্টা, বাসন ইত্যাদি রাখা আছে। নৌকোর দেওয়ালে হুকো টাঙ্গানো, পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মাঝির এই সম্পত্তি—নদীর বুকে তাদের সঙ্গে দুলছে। সহসা ব্রিল যেন

অবাক হয়ে গেল। তার সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হল। ভাগ্য যেন তাকে হঠাৎ কেম্ব্রিজের গলি থেকে এই নৌকোয় বসিয়েছে। বিচিত্র এই সুন্দর ভূমিকে পূর্ব বাংলা বলা হয়, পূর্ব পাকিস্থানও।

লণ্ঠন উঠিয়ে সে আবার দৃষ্টি প্রসারিত করল। তরঙ্গের মাঝখান দিয়ে কে যেন নৌকোর জন্য, নদীর বুকে পথ বানিয়ে দিয়েছে। দূরে গাছের আড়ালে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে।

সাতান্ন

বিয়ারের গেলাসের বুদ্‌বুদের মত সময় ভেসে বেড়াল। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। গ্রিল চুপচাপ নীল পাহাড় দেখছে। পাহাড়ের ওই পারে বর্মা।

"কি ব্যাপার ভাই, কি ভাবছ?" কামাল উদাসভাবে বলল।

"কিছু না ··· ভাবছি এখান থেকে পায়ে হেঁটে বর্মা যেতে কদিন লাগবে।"

"শুধু এই ভাবছিলে?"

একটা কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বারান্দায় উঠে এল।

"কুকুরটা বর্মা যেতে চায়।" কামাল বলল।

কুকুর ল্যাজ নাড়ছে।

"হ্যালো···হ্যালো···নাও বিস্কুট খাও।" গ্রিল কুকুরটাকে আদর করল।

"বন্ধুবর, দেখে মনে হচ্ছে, রেড চায়না থেকে কুকুরটা পালিয়ে এসেছে।" কামাল গম্ভীরভাবে বলল—"কমিউনিস্ট বিরোধী কুকুর স্বাধীনতার জন্য এখানে এসেছে।"

গ্রিল কামালকে দেখল। "তুমি এখনো ছাত্র-জীবনের কথা ভুলতে পারনি দেখছি।"

'এখনো'···র প্রশংসা করা যেতে পারে না। টেবিলে চায়ের

সরঞ্জাম। কামাল এক টুকরো স্যাণ্ডউইচ কুকুরের সামনে ফেলে বলল—"না, ব্রিল, আমি এখন 'ইস্‌লামী' শাসনের একটা অংগ। আমার পাসপোর্ট দেখ।" পকেট থেকে সবুজ রঙের পাসপোর্ট বের করল সে।

"র‍্যালে ব্রাদার্সে-এর চেয়ে ভাল চাকরি তোমাকে যোগাড় করে দিতে পারতাম।" ব্রিল বলল, "কর্ণফুলী মিলের প্ল্যানিং করতে এসেছ তুমি?"

"আমার কথা বাদ দাও। তুমি এখানে কি করছ? বাঙ্গালী মজুরদের শোষণ করতে আসনি তুমি?" ছুঁচ বলে চালুনিকে...... সব বুকে বাহাত্তরটি ফুটো! আমি তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই ......রিয়্যাকশনরী!" কামাল বলল।

ব্রিল হার্ভড এশলে পাহাড় ও নদী পার হয়ে গতকাল সকালে এখানে পৌঁছেছে। শ্রীমঙ্গলের সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারে চট্টগ্রাম এসেছে। চট্টগ্রাম থেকে সে চা কিনে বাইরে পাঠায়।

ব্রিলের মধ্যে সুপ্ত ভবঘুরে প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে শীটারের হাতে সব কিছু ছেড়ে পাহাড় ও জঙ্গল দেখতে বেরিয়ে পড়ল। দোহজারী, বন্দরবন ও চন্দ্রকোণার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল সে, তারপর রাঙ্গামাটির ডাকঘর থেকে নিজের ভাইকে চিঠি লিখল এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ। ভাইকে জানাল, আগামী ক্রিসমাস সে তাদের সঙ্গে কাটাবে।

ব্রিল ও রোজমারীর বিবাহ বিচ্ছেদের খবর শুনে তার বড় ভাই লর্ড বার্ণফীল্ড আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর ভাই কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। লর্ড সাহেব পূর্ব পাকিস্থানে বেশ জমিয়ে ব্যবসায় নেমেছেন। সেখানে তাঁর চা বাগানও আছে এবং তাঁর প্রচুর টাকা সেখানে খাটছে। কেম্ব্রিজ থেকে বেরিয়ে ব্রিল লণ্ডনে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লর্ড সাহেব একদিন ব্রিলকে ডেকে বললেন—"আমি তোমাকে পাকিস্থানে পাঠাচ্ছি।"

"ভাল কথা।" ব্রিল সহজভাবেই উত্তর দিল। জীবনে আর

খুব বেশী ঝগড়া করার ক্ষমতা কোথায়! তাই গত ছ'মাস ধরে সে এখানে। লণ্ডন ছাড়বার সময় তার এমন কিছু খারাপ লাগেনি। গৌতম নীলাম্বর, কামাল, হরিশংকর, মাইকেল, সুরেখা, সবাই লণ্ডন ত্যাগ করেছে।

সে শ্রীমঙ্গলে একটি সুন্দর কুঠিতে বাস করত ও সময় পেলেই মাঠ, ঘাট, জঙ্গল দেখে বেড়াত। কলকাতা, ঢাকা ও নানা ধ্বংসাবশেষ দেখে ও ভাবত কত গল্প কত ইতিহাস এর পাতায় লেখা। গতকাল সন্ধ্যায়, প্যাগোডার বাগানে ঘণ্টা খানেক কাটানোর পর সে যখন সার্কিট হাউসে পৌঁছল, দেখল, একটি ছেলে তার দিকে পীঠ ফিরে দাঁড়িয়ে বারান্দা থেকে কর্ণফুলী নদী দেখছে।

তার পদধ্বনি শুনে ছেলেটি তার দিকে তাকাল।

যুবকটি কামাল রজা।

কামাল তাকে নিজের কাহিনী বলল। সে একটা ল্যাবরেটরী সেট করতে করাচী থেকে এখানে এসেছে। তাকে কাজের ব্যাপারে সারা দেশেই ঘুরতে হচ্ছে। এখন প্রভাত। তারা দুজনে বারান্দায় বসে আছে। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সার্কিট হাউসে ল্যাম্প জ্বলল। কিছু দিন আগেই শিকার শেষ হয়েছে। পাশের ঘরে হাতীর ব্যবসায়ী এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মদ খাচ্ছিল। মদ খেয়ে দার্শনিকের মত কথা বলছিল।

রাত্রে পশ্চিম পাকিস্থানের যুবক সিভিলিয়ান অফিস'রদের সঙ্গে খাবার টেবিলে পূর্ব বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ নিয়ে কামাল আলোচনা করল।

"কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি এখানে টাকা পাঠায়।" তাদের অভিযোগ।

"বাংলা দেশের সমস্যাটি ঘোরাল।" আরেকজন বলল।

কামাল চুপচাপ তাদের কথা শুনল।

ডিনারের পর তারা চলে গেল। ব্রিল ও কামাল পেছনের বারান্দায় বসল। বারান্দায় ফুলের লতাপাতা ঝুলছে। দূরে নদী। নদী যেখানে মোড় নিয়েছে, সেখানে পাওয়ার হাউস। রাতের নীরবতায় পাওয়ার

হাউসের ঘড়-ঘড় আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। পাশেই বাঁশের সিনেমা হল। 'বৈজু বাওরা' চলছে। সেখান থেকে লতার গান নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে সার্কিট হাউস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। কামাল একমনে লতার গান শুনছে। লতার গান এক মজবুত সেতুর মত। দুই শত্রু দেশকে এই সেতু মিলিয়ে রেখেছে, সে ভাবল।

"তুমি লতার গান শুনেছ?" একটু চেঁচিয়ে সে স্ত্রিলকে জিজ্ঞেস করল।

"সে কে?" স্ত্রিলের প্রশ্ন।

কামাল বোর হয়ে গেল।

খানসামা কফি নিয়ে এল।

খানসামার সঙ্গে কামালের দোস্তী হয়ে গেছে। কয়েকবার অনেক বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেছে।

"খানসামাজী, আপনার খবর কি?" কামাল বলল।

"হুজুরের মেহেরবাণী। আপনারা এলে একটু হৈ-হল্লা হয়, অন্যথা এই জঙ্গলে আর কি আছে!"

গর্ভনার জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার পার্টি শিকার সেরে বন্দরবাগ থেকে করাচী ফিরে গেছে। তাঁর জন্য সার্কিট হাউস বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছে। গর্ভনার জেনারেলের জাঁকজমক দেখে খানসামা বাংলার গর্ভনার স্যার ফ্রেডরিকের কথা মনে করে। তিনিও তখন শিকার করতে আসতেন, জঙ্গলে যেন মেলা বসত। সে খুব বকশিস পেত।

"গত কয়েকদিন ধরে তোমরা বেশ ব্যস্ত ছিলে? কামাল খানসামাকে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ হুজুর! আপনার তখন আসা উচিত ছিল। দূর-দূর থেকে সাহেবরা এসেছিলেন। এখন বড়লাট সাহেব মুসলমান কিন্তু তাঁর জাঁকজমক ইংরেজদের চেয়ে কম নয়। তাই লোকেরা হিংসে করে।"

"কারা হিংসে করে?"

"আরে সাহেব!" সে চারিদিকে তাকিয়ে অতি সন্তর্পণে বলল— "এদিকে বেশ কয়েকজন জঙ্গী লোক আছে।"

"কোথায় ?" খানসামার রহস্যময় কথা শুনে তার মনে হল যেন এদিকের জঙ্গলে প্রচণ্ড সাহসী কমিউনিস্টের আড্ডা। অন্ধকারে তাদের গেরিলা বাহিনী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যে কোনো মুহূর্তে সার্কিট হাউসে হামলা করতে পারে।

ব্রিল পোষাক বদলাবার জন্য নিজের কামরায় গেল। খানসামা কফি-পট উঠিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পর এক আমেরিকান ড্রইংরুম থেকে বোরয়ে কামালের কাছে এল।

"হাউ ডু ইউ ডু! সে হেসে বলল।

"আরে···হাউ ডু ইউ ডু?" কামাল অভিনন্দন জানাল।

"আমি জন টাইটস ফ্রেজর জুনিয়র। আমাকে জনি বল।"

"হ্যালো জনি, এদিকে কোথায় ?"

"আমি 'চকমা কবীলাদের উপর একটা ডকুমেণ্টারী ছবি তুলতে এসেছি।"

"ওহো! হাউ এক্সাইটিং।" কামাল আবাম চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল। "সিগারেট ?"

"থ্যাংকস্।"

পর মুহূর্তে জনিও যেন প্রকৃতির মোহময় পরিবেশে হারিয়ে গেল। জানালায় হেলান দিয়ে সে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। নদীর বুকে নৌকো। মাঝিদের ভাটিয়ালী গান। সামনের পাহাড়ে ঘন অন্ধকার।

তারপর জনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে কামালের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। কামাল হ্যাঁ, হুঁ করতে থাকল। ব্রিল ড্রেসিং গাউন পরে নিজের কামরার জানালা দিয়ে দুজনকে দেখল। তারপর চুপচাপ বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দার সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। সামনে নদীর চিরন্তন প্রবাহ ঘন অন্ধকারে আবর্তিত পরিবেশ। আরও দুজন আমেরিকান বারান্দায় এল। তারা সবাই ইউ. এস. আই. এস., ঢাকার লোক। 'লোকেশান' খুঁজবার জন্য তারা সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে।

"তুমি জান, রেড চায়না এখান থেকে কত কাছে ···। পাহাড় টপকেই!" জনি রহস্যপূর্ণ হেসে বলল। সার্কিট হাউসের চাকর এসে জানাল, স্নান করবার জন্য জল তৈরী। তারা কথা বলতে বলতে ভেতরে গেল।

ত্রিল এদের দেখল।

"তোমার বন্ধুরা গেল ?"

"চলে এস, আমি মুক্ত!" কামালের উত্তর। ত্রিল ও কামাল আবার নিজেদের মধ্যে যেন হারিয়ে গেল।

কামাল ও ত্রিল সেখানে পাঁচ-ছয় দিন থাকল। সার্কিট হাউসের নীচে কর্ণফুলী নদীর বুকে বড় বড় কাঠের বোঝা ভাসছে। ভাসতে ভাসতে চন্দ্রকোণা চলেছে। কিছু দূরে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাংলো। সরু আঁকাবাঁকা পথে মঙ্গোলদের মত দেখতে পাহাড়ী মজুররা পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছে। পাশ দিয়ে কখনো সরকারী জীপগাড়ী তীরবেগে বেরিয়ে যায়। সকাল-সন্ধ্যে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে। পাহাড় থেকে জিনিস হাটে বিক্রী হতে আসে। মুখে লম্বা লম্বা পাইপ নিয়ে, ধূমপান করতে করতে হাসিমুখে পাহাড়ী মহিলারা দোকান সাজায়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সবাই নিজের নিজের কাজ করে চলেছে। মাঠে চাষ আবাদ হচ্ছে। ফসল কাটা হচ্ছে। জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে নীচে নামানো হয়। কামাল প্রায়ই দেখে, এক বৃদ্ধ মাথার ওপর বাঁশের বোঝা নিয়ে পাহাড় থেকে নীচে নামে। বাঁশের বোঝা বিক্রী করে সে কয়েক আনা উপার্জন করবে। যুগ যুগান্তর ধরে সে এই কাজ করে চলেছে। আজও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জঙ্গলে চকমা, মাঘ ও মোংগ আদিবাসী বাঁশের কুটিরে দিন কাটায়। এই সুন্দর ও শান্তিময় এলাকাকে জঙ্গলীদের এলাকা বলা হয়। পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় কালো সেরোংগ বেঁধে কাঁখে কলসী নিয়ে জঙ্গলের পথে ঘুরে বেড়ায়। ঘন জঙ্গলে কোনো ভিক্ষুর গেরুয়া বস্ত্রের একাংশ

কখনো কখনো দেখা যায়। বন্দরবন গিয়ে কামাল ও ম্রিল মোধ রাজার সঙ্গে দেখা করল, ঘন জঙ্গলে হাতী দেখা যায়।

"এই বছর আসামের বন্যায় অসংখ্য হাতী বন ত্যাগ করে এখানে এসেছে। এই বন-জঙ্গলের ঠিক ঠিক সীমা নির্ধারণ করা মুসকিল!" একজন অফিসার কামালকে বলল।

"অর্থাৎ যে হাতীদের শিকার করা অথবা ধরার আয়োজন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বাস্তুহারা হাতীও ছিল?" কামাল গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

তারা ঘুরে ঘুরে সারা বন্দরবন দেখল।

জঙ্গলে পশু-পাখী আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা হরিণ দেখল, চিতা দেখল। জঙ্গলের স্নিগ্ধ পরিবেশ তাদের বড় ভাল লাগল।

এক সন্ধ্যায় কর্ণফুলীর ওই পারে 'চকমা' রাজবাড়ী দেখতে গেল। দেশী রাজ্যের অন্তিম অবস্থা। বাগানে একটা ছোট কামান রাখা আছে। পাশে একটা মন্দির। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় আম ডালে কোয়েল ডাকছে। প্রাসাদের ভেতরে টিম টিম করে বাল্ব জ্বলছে কেননা রাঙ্গামাটির বিজলী ঘর মজবুত নয়।

হলে রাজাদের পূর্বপুরুষদের তৈলছবি। "রাজার পূর্বপুরুষদের মধ্যে বাঙ্গালা ও আসামের মোগল গর্ভনার জেনারেলও আছেন।"—এই এলাকার ইতিহাস সার্কিট হাউসের ড্রইংরুমে রাখা আছে। ম্রিল সেই ইতিহাস পড়েছে—"এখানকার রাজা জন্মগতভাবে হিন্দু বৌদ্ধ, কিন্তু জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণ-মোগল-মঙ্গোল। ভারতীয় ইতিহাসের এই অন্তর্বিরোধ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা। তোমাদের ইতিহাস এরকম কেন?" সে রেগে কামালকে জিজ্ঞেস করল।

ইংলণ্ডে শিক্ষিত নবযুবক রাজা ও তার মা ম্রিল ও কামালকে স্বাগত জানাল।

ড্রইংরুমে পিয়ানোর ওপর এক প্রসিদ্ধ ভারতীয় নর্তকীর ও ফিল্ম-স্টারের ছবি রাখা আছে। নর্তকী রাজমাতার বোন। কেশবচন্দ্র

সেন ও গত শতকের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা বাবু জি· এন. দত্তের ছবিও দেওয়ালে টাঙ্গানো। রাজমাতা বাবু জি. এন· দত্তের পুত্রের প্রপৌত্রী এবং ডক্টর মনোরঞ্জন দত্তের পৌত্রী।

"আমি বাবু জি· এন. দত্তের জীবনী পড়েছি।" শ্রিল বলল।

"আপনি পাকিস্থান থেকে আসছেন?" রাজমাতার প্রশ্ন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কামাল ঘাবড়ে গেল। এটাও তো পাকিস্থান। পরমুহূর্তে সে বুঝবার চেষ্টা করল। কোন দেশের কল্পনা কি? এই রাজবাড়ী এখন কোন্ দেশে? কেশবচন্দ্র সেন ও বাবু জি· এন. দত্ত এখন কোন্ দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত?

রাজা অত্যন্ত রূপবান। এখন সে অক্সফোর্ডের স্টাইলে শ্রিলের সঙ্গে কথা বলছিল—"সরকার কর্ণফুলী নদী ওপর বাঁধ বেঁধে আমার দেশের চারিদিকে হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন বানাতে চায়। আমার প্রজাদের ঘর-বাড়ী জলে ডুবে যাবে। সরকার তাদের কম্পেনশেসন দিয়ে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে। আমার প্রাসাদ, রাঙ্গামাটি সমেত জলের নীচে ডুবাবে।"

"উন্নতি করতে গেলে এইসব ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়।" কামালের নিরুত্তেজিত কণ্ঠ।

"হ্যাঁ!" রাজার উত্তর।

রাজমাতা কলকাতার কথা বললেন। রাজমাতার প্রপিতামহ ব্রাহ্মসমাজের বাবু জি. এন· দত্ত, তাঁর বাড়ী 'দত্ত হাউস', কামালের প্রমাতামহ, মেটিয়াব্রুজের নবাব অলী রজা বাহাদুরকে বিক্রী করেছিলেন। সে প্রসঙ্গও উঠল।

কিছুক্ষণ পর কামাল ও শ্রিল আজ্ঞা চাইল। রাজা ও রাজমাতা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ীর আলো টিম টিম করছিল। কর্ণফুলীর ওপর নৌকোর মেলা কমে এসেছে। রাত ভিজছে।

দ্বিতীয় দিন সকালে রাঙ্গামাটিকে নমস্কার জানিয়ে তারা নীচে নেমে এল।

চট্টগ্রামে ট্রেন ধরে তারা সীতাকুণ্ড রওনা হল।

কামাল ও ব্রিল স্টেশনে নামল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

"আমরা সীতা-মন্দির যেতে চাই।" কামাল একজনকে বলল।

"এখন ওদিকে যাবেন না। দুর্গম পথ, ফিরতে রাত হবে।" স্টেশন মাস্টারের অনুরোধ।

দশ পনের জন লোক তাদেরকে প্রায় ঘিরে ধরল। এরা স্টেশনের স্টাফ, পুলিস, চা স্টলওয়ালা, গ্রামবাসী, সাধু। এদের শান্তির সংসারে এ দুজন অপরিচিত ব্যক্তি। চোখে বিস্ময় নিয়ে এরা আগন্তুকদের দেখছে।

গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল দুজন যাত্রী এসেছে। একজন ইংরেজ। দলে দলে লোক এদের দেখতে আসছে। প্ল্যাটফর্মে একটি পাল্কী এল। একটি মেয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে এদের দেখল।

ব্রিল উদাসভাবে পাল্কী দেখল।

"আমাদের বড় মৌলভী সাহেবের মেয়ে। শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাচ্ছে।" একজন বলল।

পুলিশ কনেস্টেবল্ এগিয়ে এল—"আসুন, আপনাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিই। পথে সেও রাজনীতি শুরু করল—মুসলীম লীগের নীতি, সাজানো দুর্ভিক্ষ, আওয়ামী লীগ, এ. কে. ফজলুল হক। এই রাজ্যে প্রত্যেকটি ছেলে রাজনীতি-সচেতন। গ্রামের ছোট বাজারে একটা ছেলে কামালের পিছু নিল। সে কনস্টেবলের সঙ্গে চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষায় কিছু বলছিল।

"প্রফুল্ল বলছে, সে আপনাকে কুণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যাবে।"— কনস্টেবল বলল।

"হ্যালো প্রফুল্ল!" ব্রিল তার সঙ্গে হাত মেলাল।

"স্কুলে পড়?"

"আজ্ঞে না, চাষবাস করি।"

"এখানে সুখে আছ?"

"নিশ্চয়।" প্রফুল্ল আশ্চর্য না হয়ে পারে না। পথে ছোটখাট দোকান। দোকানে লোক। প্রত্যেকের দৃষ্টি এদের দিকে। শ্বেত দেবতার মত ব্রিল আগে আগে চলেছে। কামাল এক চাওয়ের

সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁশ ও খড় দিয়ে গড়া পরিষ্কার চা ঘর। ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে কিছু লোক বাংলা কাগজ পড়ছে। এক কোণায় গ্রামাফোন বাজছে। দোকানের দেওয়ালে কলকাতায় নির্মিত বাংলা ছবির বিজ্ঞাপন।

লোকেরা কলা ও ফল ইত্যাদি নিয়ে নিজের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।

"আপনারা পথিক। অনেক দূর থেকে এসেছেন—আপনাদের সেবা করা আমাদের কর্তব্য।" এক দাড়িওয়ালা মুসলমান বলল।

কামাল অবাক হয়ে শুনল। নোয়াখালী ও বিহারে এরাই কি এক অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি?

প্রফুল্লের নেতৃত্বে এরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। পথে সুন্দর কুটির, সবুজ লতাপাতা! সরস্বতী পুজোর আয়োজন চলছে। মাঠে সরস্বতীর প্রতিমা রাখা, কুমোরেরা প্রতিমা শুকোচ্ছে। কামাল একটি প্রতিমার সামনে ঘাসে বসে পড়ল।

ত্রিলও বসল। "তোমার গ্রামের কুমোরেরা চমৎকার শিল্পী।" সে প্রতিমা দেখতে-দেখতে বলল।

"হ্যাঁ।" কামাল সগর্বে উত্তর দিল।

বাঁশবন পেরিয়ে তারা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। সামনে লাল পাথর বাঁধানো পুকুর। পুকুরের চারিদিকে লাল মন্দির। শান্ত পরিবেশ।

পুকুরের পাশে চক্কর কেটে তারা অন্য এক কুঞ্জে গেল। এখানে ছোট-ছোট ঝিলের পাশে মেয়েরা বসে। ছোট-ছোট কুটিরকে ঘিরে হলুদ ফুলের মেলা। বাতাসে ফুলের সুবাস।

"বাঃ, মনে হচ্ছে কোনো প্রগতিশীল বাংলা ছবির সেটে এসে পৌঁছেছি!" কামাল বলল। পূর্ব বাংলার গ্রামের চেয়ে সুন্দর জায়গা আর কোথাও নেই।"

তারা পাহাড়ের সিঁড়ির কাছে পৌঁছল। দুই পাশে গভীর টপিক্যাল জঙ্গল, গভীর গুহা গর্ত ও জায়গায় জায়গায় গাছের আড়ালে শত-শত বছরের প্রাচীন মঠ। ধূসর রঙের দেবমন্দিরের তালা লাগানো। ভেতরে

মোহন্তদের সমাধি। হাজার-হাজার ভগ্ন সিঁড়ি এঁকে-বেঁকে উপরের দিকে উঠে গেছে, যেখানে গন্ধক কুণ্ডে আগুন জ্বলছে।

"মহারাণী সীতাকে রাবণ লঙ্কা থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।" প্রফুল্ল, সহজ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্যাটার অফ ফ্যাক্টের মত করে এমন ভাবে বলল যেন এই ঘটনা গতকালই ঘটেছে।

কয়েকজন সাধু পথের দিকে ছড়ানো অনেক মন্দিরের দিকে চলে গেল। ম্রিল উপরে পৌঁছে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ভাঙ্গা সিঁড়ির নীচ দিয়ে ঝর্ণা বয়ে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পাখির কলরব, পাতার মর্মরধ্বনি, পূজারীদের মন্ত্রোচ্চারণ এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

সূর্য ডুবেছে। জঙ্গলে গভীর অন্ধকার। গোধূলীর রঙীন আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। "এবার ফিরে চল। দশটার গাড়ী ধরতে হবে।" কামাল ম্রিলকে স্মরণ করালো। তারা নীচে নামতে শুরু করল।

গ্রামের চা-ঘরে গ্রামবাসী তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। তারা বেঞ্চে বসল। তাদের সামনে চা ও দু'পয়সা দামের বিস্কুট রাখা হল। গ্রামবাসীরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রফুল্ল তাদের স্টেশনে পৌঁছতে এল। গ্রামের ছেলেরা তাদের কাছ থেকে বকশিস চাইল না। প্রফুল্লও বকশিস নিল না। কামালের মনে হল, বকশিসের কথা বলে সে প্রফুল্লকে কষ্ট দিয়েছে।

"আমি ভিখিরি জগতের লোক। যদি কেউ ভিক্ষে প্রত্যাখান করে, আমি আশ্চর্য হব না?" কামাল বলল।

"হ্যাঁ!" ম্রিল বলল।

তারা ট্রেন ধরল। চট্টগ্রাম ফিরে এল। আলোয় ঝলমল করছে চট্টগ্রাম ক্লাব। পীটার তাদের অপেক্ষায় বসেছিল।

"হ্যাঁ!" ম্রিল বলল।

আপনি সীতাকুণ্ড দেখে ফিরে আসছেন?" সে অবাক হল—"হে ভগবান। আপনি জানেন, সেখানে পাহাড়ী সাপ, বাঘ ও সাংঘাতিক

রকমের বিছে আছে। সেখানে দিনের বেলায় বন্দুক না নিয়ে কেউ যায় না!"

"কিন্তু সেখানেও অনেক লোক বাস করে। তাদের হাতে বন্দুক দেখলাম না তো!" কামাল বলল। "তারা প্রতিদিন সাপ-বিছের কামড়ে মরছে। তাছাড়া তারা তো জঙ্গলী!"

দ্বিতীয় দিন তারা সিলেটের দিকে রওনা হল। যেদিকে পুরোনো মঠ, মন্দির, মসজিদ ছিল; ষ্রিল প্রত্নতাত্ত্বিকের মত কামালকে সব দেখাতে ও বোঝাতে লাগল।"

"তুমি কবে থেকে আরকেলজিস্ট হলে?" একদিন বরিশাল যেতে যেতে ষ্রিল কামালকে জিজ্ঞেস করল। "আমার মনে হয়," ষ্রিল জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নদী দেখতে দেখতে বলল "আমার কাছে অতীত ছাড়া আর কিছু নেই যা অন্য লোক নষ্ট করতে পারে। আমি স্বয়ং অতীতের একাংশ, ইতিহাসের পাতার মত। তোমার মতই হিন্দু ও পাকিস্থানের এই ধ্বংসাবশেষ আমার একমাত্র বন্ধু। আমি এদের ভাষা বুঝতে পারি। এই পাগল মহাদ্বীপে কেবল মাত্র এরাই আমার রহস্য জানে। ঐতিহাসিকদের চেয়ে আলাদাভাবে, এরা এদের কাহিনী চুপি-চুপি আমাকে বলে। আমি এদের একমাত্র অডিয়েন্স। এই শিলাখণ্ডই আমার চিরদিনের বন্ধু। কামাল, দয়া করে ভেব না যে আমি পশ্চিমী ইয়োরোপিয়ান ডিকাডেন্ট ইন্টলেকচুয়াল বনে গেছি। আমি অবশ্য এসব লেবেলের পরওয়া করি না। আমি এখন বুঝতে পারি লোক রোম ও বাইজন্তিয়মে আশ্রয় কেন খুঁজছে। পৃথিবীর সঙ্গে আমার এই নতুন সম্পর্ক অপ্রীতিকর চিন্তা দিয়ে বিকৃত কোরো না।"

সিলেটের সুন্দর আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথে চলতে চলতে এরা হঠাৎ ভারত-পাকিস্থানের সীমানার কাছাকাছি এসে পড়ল। সামনের কাঠের ফটক; যার এদিকে পাকিস্থানী সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের ওপাশে কিছু অসমীয়া অলসভাবে পান চিবোচ্ছে। কাছেই আসামের পর্বতমালা। কাঠের এক প্ল্যাটফর্মে কনুই ঠেকিয়ে কামাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এত তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থান দেখবার জন্য সে

সম্ভবত প্রস্তুত ছিল না। অথচ কয়েক গজ দূরেই হিন্দুস্থান।

পরের দিন সিলেট থেকে তারা শ্রীমঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। দীর্ঘ পথ। নদী, ঘন জঙ্গল ও মৌলভীবাজার পেরিয়ে তারা গ্রিলের বাড়ী পৌঁছল। একটা ছোট্ট পাহাড়ের কোলে গ্রিলের বাংলো। দূর থেকে বাংলোর আলো দেখা যায়। রাত হয়ে আসছে।

কামাল অনুভব করল, তার পরিচিত গ্রিল হঠাৎ কোনো রহস্যময় মন্ত্রবলে 'বড় সাহেবে' পরিণত হয়েছে। মোটরগাড়ী থামিয়ে সগর্বে সে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছে। দৌড়ে এল চাকরের দল। বারান্দায় সারি সারি দাঁড়ালো মজুরের দল করজোড়ে। গ্রিলের হুকুম—"আবদুল রহমান! স্নানের জল তৈরী কর।" কামালকে নিয়ে সে গেস্ট রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

"তোমার কামরা।" সে বলল।

বাঘ, সিংহ ও অন্যান্য জন্তুর চামড়া এবং সেগুন ফার্নিচারে সাজানো কামরা। কামালের মনে হল হঠাৎ সে ১৯২৮ সালে হিন্দুস্থানে চলে এসেছে। তার চোখের সামনে 'গুলফিশাঁ' ভেসে উঠল। দেরাদুনের 'খোয়াবা'র কথাও মনে পড়ল। গ্রিল ড্রাইভারকে ডাকল। কামালের মনে হল, মিয়া কদীর দৌড়ে আসবে!

বাঙ্গালী মুন্সীজী মজুরের হিসেব নিয়ে বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নের এক কর্মকর্তা অনেকক্ষণ ধরে গ্রিলের অপেক্ষায় সিঁড়ির ওপরে বসে আছে। ইয়ুরেশিয়ান ক্লার্ক রাল্ফ জোসেফ বারান্দায় কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রিল একলা। কিন্তু তার স্টাফ অগুনতি—মালী গ্রাস-কাটার, ভিস্তী, চৌকীদার। নদীর বুকে তার নিজের মোটর লঞ্চ। শ্রীমঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজত্বের মালিক গ্রিল ও তার বড় ভাই লর্ড বার্ণফিল্ড। সে ইচ্ছে করলে এদের উল্টো করে টাঙ্গিয়ে পেটাতে পারত। এ সেই গ্রিল যে কিছুদিন আগে কেম্ব্রিজে রোদলেয়র ও ইলিয়টের বই নিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং 'কোহিনুরে' বসে মাইকেলের সঙ্গে আলু খেতে যেত।

সকাল সাতটার সময় চৌকীদার বাঙ্গলো'র হলঘরের দরজা খুলল।

সকালের নরম মিষ্টি রোদ মশারীর ভেতরে ঢুকল। ব্রিলের ঘুম ভাঙল। কামাল আগেই শয্যা ত্যাগ করেছে। সে ড্রেসিংগাউন পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে 'ইয়দে-সুবহ-ওয়তন দে রহী থী হওয়া ; দাগে দিল ফুল বন-বনকে খিলনে লগা। মেরী পলকোঁ পে বদরে কামাল আগয়া !' (নিজের দেশ থেকে ভোরের মিষ্টি হাওয়া বয়ে এদিকে আসছে। স্মৃতি ফুলের মত ফুটছে……) —গাইতে গাইতে সে ড্রইংরুমে ঢুকল। ড্রইংরুমের দেওয়াল পূর্ব পাকিস্থানের শিল্পীদের পেন্টিংএ ভরা। আলমারীতে ভাল ভাল বইয়ের কলেকশন। ব্রেক ফাস্টের পর সে ব্রিলের সঙ্গে বাইরে এল। ব্রিল হ্যাট পরেছে। তাদের মোটরগাড়ী এগিয়ে চলল। পেছনে পীটার জ্যাকশন ও রাল্‌ফ জোসেফের নেতৃত্বে জীপ গাড়ীতে মুন্সী ও সেরেস্তাদারদের জৌলুস। ব্রিল কামালকে নিজের ফ্যাক্টরী দেখাল। সেখানে চা পাতা তৈরী করা হচ্ছে।

দুপুর বেলা লাঞ্চের জন্য তারা ক্লাবে গেল। কয়েকজন প্ল্যান্টার্স নারায়ণগঞ্জের শেয়ার মার্কেট নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করল। 'স্টেট্‌সম্যান' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তথা ঢাকার 'মর্ণিং নিউজ' তারা দেখল। খাবার আগে বিয়ার পান করার সময় হঠাৎ কামাল নিখোঁজ হয়ে গেল।

"মিস্টার রজা কোথায় ? ব্রিল পীটারকে জিজ্ঞেস করল।

"জানিনা একটু আগে তিনি নুরুল ইস্‌লাম চৌধুরীর সঙ্গে বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন।

নুরুল ইস্‌লাম চৌধুরী ? ব্রিল কোনো কথা বলল না। নুরুল ইস্‌লাম চৌধুরী মজুরদের নেতা। গত রাতে সে ব্রিলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। ব্রিল দেখা করেনি, বলেছিল আগামীকাল সকালে সে যেন অফিসে তার সঙ্গে কথা বলে।

ব্রিল কামালকে খুঁজতে বেরল। মোটরগাড়ীতে বসে সে নিজের চা বাগিচায় গেল সেখানকার ছায়াঘন শূন্য পথে ঘুরে বেড়ালো। কামাল সেখানে নেই। বিরক্ত হয়ে সে একটা ঝোপের কাছে মোটরগাড়ী দাঁড় করাল এবং অন্যমনস্কভাবে হেঁটে এগিয়ে চলল। গাছের ডালে

পাখির কলরব। গাছের ডালের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো চা গাছের ঝোপে পড়ছে। চুড়ির ঝংকারে তার অন্যমনস্কতা ভাঙল। একটি পূরবী মেয়ে চায়ের পাতা তুলছিল। বড় সাহেবকে দেখে সে ঘোমটা টানল। ব্রিলের হাসি পেল। চিন্তার জাল বুনতে বুনতে যেন এক মুহূর্তের জন্য তীরে এসে সে প্রশ্ন করল—"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম ?—চম্পা।"

"চম্পা !" সে এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন আজ প্রথমবার এই নাম শুনছে। "চম্পা—খুব ভাল নাম !" সে আরেকবার বলল, তারপর লম্বা পা ফেলে সে মোটর গাড়ীর দিকে এগিয়ে এল।

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে আলোছায়ায় তাকে অদৃশ্য হতে দেখল। সে এবং তার বংশের সবাই যুগ যুগ ধরে ইংরেজদের দেখে আসছে। ইংরেজরা তার মতে, খামখেয়ালী, অসভ্য, অভদ্র, ছোটলোক ও মছ্যপ। এই সাহেবও খামখেয়ালী।

ক্লাবে ফিরে এসে ধড়াস করে এক আরাম চেয়ারে সে বসে পড়ল। দেওয়ালে কুইন এলিজাবেথের ছবি ঝুলছে। একটি ছবিতে বাঘ-শিকারের ঘটনা অঙ্কিত। এক মেম সাদা টুপি পরে হাতে বন্দুক নিয়ে মহারাজা কুচবিহারের পাশে বসে। মেমের মধ্যে সে নিজের ঠাকুমা লেডী বার্ণফিল্ডের প্রতিচ্ছবি দেখল। ঠাকুমা পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দুস্থান এসে প্রায়ই মহারাজাদের সঙ্গে শিকারে বেরোতেন। 'গুডমর্ণিং গ্র্যাণী ! কেমন আছ তুমি আজ ?' সে মনে মনে বলল। তারপর আবার সে কামালের কথা ভাবল। কোথায় গেল লোকটা ?

সন্ধ্যেবেলা কামালের অনারে সে এক ডিনারের আয়োজন করেছিল। তার অনুপস্থিতিতে ব্রিল প্ল্যাণ্টার্স অতিথিদের ডিনার খাওয়ালো ও তাদের সঙ্গে ব্রিজ খেলল।

গভীর রাতে কামাল ফিরল. তার অপেক্ষায় ব্রিল ড্রইংরুমে বসে বই পড়ছিল।

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন মহাশয় ?"

"কোথাও না…এই একটু বেড়াচ্ছিলাম।"

"মজুর-বস্তী গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ !"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল।"

"তুমি রাগ করেছ ?"

"না তো ! এই সমাজ ব্যবস্থায় আমি যেভাবে জড়িয়ে আছি, যতখানি জড়িয়ে আছি—তুমিও ঠিক সেই ভাবে, জড়িয়ে আছ। রাগ করার প্রশ্নই ওঠে না।"

"এখানে মজুররা মাত্র একটাকা চার আনাও প্রতিদিন মজুরী পায় না ?"

"হ্যাঁ।"

"কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই ?"

"না।"

"কোনো কমিউনিস্ট এলিমেণ্ট ?"

"জানিনা।"

"বাজে কথা ছাড়। তুমি সব খবর রাখ।"

"কামাল, এই দুনিয়ায় অন্যায়, অবিচারের বোঝা অনেকদিন কাঁধে চাপিয়ে বেড়িয়েছি। আর পারিনা, তাই শেষ পর্যন্ত এই বোঝা ত্যাগ করেছি। তুমিও এই বোঝা ত্যাগ করেছ। তাহলে আজ এইসব কথা অর্থহীন। এইভাবে তুমি আমার বিবেককে সান্ত্বনা দিতে চাও, বোঝাতে চাও তোমার কোনো অপরাধ নেই। তুমি ভীষণভাবে অপরাধী কামাল রজা—তোমার অপরাধ আমার চেয়ে বেশী !"

কামাল কথা বলল না। গ্রিল তার জন্য হুইস্কী ও গেলাস সাজাল।

"আমি তোমারই মত এক গাঁড়লের সঙ্গে দেখা করে আসছি। সেও তোমার মতই প্ল্যাণ্টার্স। শ্রীনীহার রঞ্জন দাশগুপ্ত।" কামাল বলল।

"দাশগুপ্ত—তার সঙ্গে কোথায় দেখা করলে ?"

"আমি হাঁটতে-হাঁটতে মাঠের ধার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার স্যুট বুট দেখে তিনি মোটর গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাকে লিফ্‌ট দিতে চাইলেন। তিনিই তোমার বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। জানতে

পারলাম, তোমার মত তিনিও খানদানি লোক।"

গ্রিল গ্লাসে হুইস্কী ঢালল। কামাল বলে চলেছে—"আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম। আপনি দেশত্যাগ করতে চান না? প্রাণখুলে হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, আপনিও অবাক লোক মশাই! ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জিনিসের রাষ্ট্রীয়করণ করতে চায়। শীঘ্রই সেখানে সম্ভবত সোস্থালিস্ট গভর্ণমেণ্ট কায়েম হবে। আমি পাগল হইনি যে এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।" স্পষ্টবাদিতার জন্য আমি তাঁর প্রশংসা করি।

গ্রিলের মুখে কথা নেই। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বলল—"তোমাকে একটা অনুরোধ করব। ছনিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারে নাক গলানো তোমার স্বভাব। এই বদ অভ্যেস ত্যাগ কর! না হলে মুশকিলে পড়বে।" কামাল হুইস্কীর বুদবুদ দেখল।

পরের দিন সকালে তারা রাজশাহী রওনা হল। সাঁওতাল গ্রামে পৌঁছল। সাঁওতালদের দেখে কামাল ছুঃখ পেল।

"এদের ঘিরে আমার মনের মধ্যে এক রোম্যাণ্টিক কল্পনা ছিল। লোক-লাজ ও জৈনুল আবেদীনের প্রখ্যাত ওয়াটার কলার, আরও কি-কি!" "আর বাস্তবে এরা প্রচণ্ড দারিদ্র্যে, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে গাছের শেকড় খায়।" জীপ চালাতে-চালাতে গ্রিল বলল—"প্রথম-প্রথম প্রতি পদে আমারও এই রকম মোহ ভঙ্গ হয়েছিল।"

সাঁওতালদের সঙ্গে এদের ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ফিরে আসার দিনে একটি গ্রামের সব সাঁওতাল তাদের পথ আটকে দাঁড়াল। একজন রূপবতী সাঁওতাল মেয়ে এগিয়ে তাদের গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। তাদের মুখিয়া, যার পা কাটা এবং যে লাঠির সাহায্যে হাঁটছিল, শতছিন্ন জামা পরে বস্তীর মোড় পর্যন্ত তাদের পৌঁছতে এল। এক যুবক পুকুর থেকে পদ্ম ফুল তুলে তাদের হাতে দিল।

রাতে তারা রাজশাহীর সার্কিট হাউসে ফিরে এল। পাশেই পদ্মা বইছে। অন্য পাড়ে মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ?…সিরাজউদ্দৌলা? …কর্ণেল ক্লাইভ? যত সব বাজে কথা! নাও শোনো, গুলি চলল!

কোনো স্মাগলার মারা গেল। তারা দু'জনে অন্ধকার রাতে গঙ্গার নিস্তব্ধ পথে ঘুরে বেড়াত। এই পথে একটু এগিয়ে জেলার উচ্চ অধিকারিদের কুঠি। তারপর বাজার···ছোট-ছোট চৌরাস্তা·· গলি ···অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের উদাস ঘর-বাড়ী।

"বাড়ী-ঘর কি অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প শোনায়!" ত্রিল বলল।

ছায়াঘন কুঞ্জে বড়-বড় হিন্দু জমিদারদের প্রাসাদ ও অট্টালিকা। অধিকাংশ খালি। "শুনেছি এখানে জমিদারী প্রথা শেষ হয়েছে।" কামাল বলল।

ঢাকা ফিরবার সময় ট্রেন আবার ঘাটের কাছে থামল। যাত্রীরা স্টীমার ধরল। ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র ট্রেন থেকে নামিয়ে স্টীমারে চাপানো হল। ক্রেনের অভাবে শত-শত কুলী ধ্বনি দিতে-দিতে সক্রিয় হয়ে উঠল। কুলীর কোলাহল কোরাসের মত শোনায়। কামাল ইপায় এই রকম অনেক কোরাস গেয়েছে।

জাহাজে দাড়িওয়ালা কিছু বুড়ো ও বোরখাপরা মেয়েরা থার্ড ক্লাসের মেঝেতে বসল। বুড়ো হিন্দু ও মুসলমান শাল গায়ে দিয়ে কোনোক্রমে বসে আছে। তাদের মেয়ে ও বৌরা বাচ্চাদের কোলে তুলে ধরেছে। গ্যাংওয়েতে গুজরাটিরা সেকেণ্ড ক্লাসে ভিড় করছে।

"এখানে অনেক বুড়ো হিন্দু দেখছি।" কামাল ঘাবড়ে প্রশ্ন করল —"যুবক হিন্দুরা কোথায় গেল?"

"হিন্দু যুবকরা কাজের সন্ধানে কলকাতা গেছে।" ত্রিল রূঢ়ভাবে উত্তর দিল।

ফার্স্ট ক্লাসে যাত্রীরা এক এক করে আসছে। ক্রমশ কেবিন, ডেক ভরে উঠল। কয়েকজন আমেরিকান এক ছাত্রকে ঘিরে আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে। দু-এক জন বাঙ্গালী মৌলানা আওয়ামী লীগের নীতি নিয়ে কথা বলছে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কামাল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল। জল, জল আর জল। মহান নদী, মহান দেশ, মহৎ মানুষ। এরা কি মহান নয়, যারা এক টুকরো জায়গায়, মুর্গীর মত ঠেসে বসে আছে— তারা মহান নয়? এক উচ্চ অধিকারীর পত্নী ও শ্যালিকা, গগলস্

পরে আরাম কেদারায় বসে আছে। তাদের শরীরে রোদের সোনালী আভা। ব্রিল সামনের রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার সোনালী চুলেও রোদের আভা। তাকে দেখতে অসাধারণ সুন্দর লাগছিল।

সিঁড়ির অন্যদিকে সেকেণ্ড ক্লাসের ডেক। এক শ্যামবর্ণা য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে বসে-বসে ট্রু স্টোরী ম্যাগাজিন পড়ছিল। পত্রিকার কভারে কোনো অভিনেতার ছবি দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি আবার সেই রূপবান ইংরেজের উপর পড়ল। তাকে দেখতে মার্লিন ব্রাণ্ডোর মত। সে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একবার তাকে দেখল, তারপর আবার পড়তে লাগল।

শ্যামবর্ণা মেয়েটির পুরো নাম মিস্ মার্গারেট ইজাবেলা ক্রিস্টানা টাজডেল। ম্যাগীর এই লম্বা-চওড়া নামের কারণ—তার প্রমাতামহী মার্গারেট ইজাবেল, স্যার ব্রিল এশ্‌লে ও এক নেটিভ হিন্দু মহিলার সন্তান। গত শতকে স্যার ব্রিল বাংলদেশের একজন নামকরা লোক ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তার মা ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে নবাব এশ্‌লের হারেমে আশ্রয় নিয়েছিল। মার্গারেট ইজাবেল কানপুর মিলিটারী ব্যারাকের গোরা সার্জেণ্ট টাজডেলকে বিয়ে করেছিল। টাজডেল আসলে গোরা। অত্যধিক মদ খেত তাই যৌবনেই সে মারা যায়। অতঃপর মার্গারেট ইজাবেল নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা ফিরে আসে এবং কলকাতার এক নিম্ন শ্রেণীর য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে মিশে যায়।

ম্যাগী টাজডেল অনাথ। সে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে টেলিফোন অপারেটার। ছুটি নিয়ে অসুস্থ মাসীকে দেখতে এসেছিল। মাসী পিক্সীতে থাকতেন। ম্যাগী পিক্সী থেকে কলকাতা ফিরে যাচ্ছিল।

স্টীমারের ভোঁ শুনে সে চমকে উঠল। যাত্রীরা জিনিসপত্র বাঁধছে। ঘাট ক্রমশঃ কাছে আসছে। ফার্স্টক্লাশের কাছে দাঁড়ান হীরো ভিড়ে হারিয়ে গেছে। সে নিরাশ হয়ে গেল। ম্যাগী ঝুঁকে স্যাণ্ডেল ঠিক করল, রঙিন ফুলদার স্কার্ট ঠিক করে আয়নায় কোঁকড়া চুল দেখল ও হাতে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ব্রিল আর কামাল জাহাজ থেকে নামল। যাত্রী ও কুলীদের জনসমুদ্র

ট্রেনের দিকে এগিয়ে চলল। বেশ কিছু দূরে ট্রেন দাঁড়িয়ে। ঘাটে হিন্দু মেয়েরা স্নান করছে। চারিদিকে হিন্দু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে আছে। মধ্যবিত্ত আমুদে হিন্দু মেয়ে ও পুরুষ। নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু মেয়ে ও পুরুষ। কামাল হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে লাইন ধরে চলেছে।—"এখানে হিন্দুর সংখ্যা বেশী।" ব্রিল বলল।

"কত শান্ত পরিবেশ।" কামাল আবার বলল—"আসলে আমার সায়কোলজি এত বিগড়ে গেছে, হিন্দু-মুসলিম প্রবলেম মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে কোনো জায়গায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের মিলেমিশে থাকতে দেখলেও মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। এই মুহূর্তে ভাবছি এখানে হিন্দু ও মুসলিম দাঙ্গা কেন হচ্ছে না।

শ্যামবর্ণা য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি মাথা নত করে তাদের আগে আগে চলেছে। ট্রেনের কাছে পৌঁছে সে সুটকেশ মাটিতে রাখল ও রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ব্রিল একবার মেয়েটিকে দেখল, তারপর কম্পার্টমেণ্টের দিকে এগিয়ে গেল।

ঢাকা পৌঁছে কামাল ও ব্রিল নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। রোজ সন্ধ্যেবেলা তারা ক্লাবে আড্ডা মারে তারপর একসঙ্গে বাড়ী ফেরে। কাজ শেষ করে ব্রিল ঢাকার গলিঘুপচিতে ঘুরে বেড়াত। অন্ধকার, সরু গলির মধ্যে দিয়ে যখন কোনো ঘোড়ার গাড়ী চলে যেত, তার টেগোর ও সীতা দেবীর উপন্যাসের কথা মনে পরত।

একদিন ব্রিলের সঙ্গে কামাল বুড়ী গঙ্গার বুকে মোটর লঞ্চে অন্য এক জেলায় যাচ্ছিল। ব্রিল চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পড়ছিল। হঠাৎ সে কামালকে বলল—"দেখ, সামনে গাছের লাইন দেখছ?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা বিক্রমপুর। এখানে সরোজিনী নাইডু ও বি. সি. রায়ের গার্ডেন হাউস আছে। গৃহকর্তারা এখন পশ্চিমবঙ্গে···দেখতে যাবে?"

"আমি গ্রেভ ইয়ার্ড দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে একটু সহজভাবে বাঁচতে দেবে না তুমি?"

"না!" ব্রিলের উত্তর।

"আমি তোমার গল্প শুনব না।" কামাল রেগে বলল।

"ঐ দিকে তাকাও···ঐ দোতালা গার্ডেন হাউস দেখছ?" স্রিলের আঙুল শূন্যে নাচল—"ওখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতেন।"

"চল, আজ আমিও তোমাকে কিছু দৃশ্য দেখাই।" মোটরলঞ্চ জলে চক্কর কেটে নারায়ণগঞ্জের দিকে ঘুরে গেল এবং রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে কামাল স্রিলকে বলল।

"আমরা আদমজী জুট মিলে চলেছি।" সে স্রিলকে বিজয়ীর মত বলল।

"এবং সেখানে পৌঁছে তুমি ম্যানেজারের সঙ্গে লাঞ্চ না খেয়ে মজুরদের মাইনে নিয়ে তর্ক জুড়ে দেবে। নিন্দুক কোথাকার।" স্রিল বলল। কামাল হাসছে।

তারা মিলে পৌঁছল। বিহারী মহিলা ও বাঙ্গালী মজুররা কাজে ব্যস্ত। ভারী, ভয়ংকর সব মেশিন চলছে। কামাল অবাক হয়ে মেশিন দেখছে।

তারপর তারা লঞ্চে ফিরছে।

লঞ্চ নদীর বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। আকাশে মেঘ। মেঘের আড়ালে সূর্য রক্ত তিলকের মত জ্বলছে। নদীর জল গলা সোনার মত। আশেপাশে অনেক নৌকো ভেসে চলেছে। এক বুড়ী সবেগে নৌকো বাইতে বাইতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নদীর বুকে নৌকো, মাঝির কলরব, সোনালী সূর্য এক পৃথক জগৎ।

সূর্য ডুবছে। নৌকোয় বাতি জ্বলল। জলের বুকে হাজারো প্রদীপ টিম টিম করছে। মাঝিরা নমাজ পড়ছে। সহসা একরাশ হাওয়া নদীর বুকে ভাসন্ত নৌকার পাল ফুলে উঠল; যেন শ্বেত রাজহংসের চঞ্চল ডানা।

এই দৃশ্য যেন এক মহান সিম্ফনী, গম্ভীর সুর। সমস্ত বাংলা এই সুরে যেন ডুবে আছে। দুঃখের সুর—জীবনের সুর।

রাত্রে রমনার পথে আলো টিমটিম করছে। দূরে এক মন্দিরে বৈষ্ণব ভজনের সুর! কামাল ও স্রিল বারান্দায় বসে। আকাশে শ্রাবণের মেঘের মেলা।

ত্রিল আরেকবার বই খুলল—'পুকুরের চারিপাশে চাঁপা ফুল ফুটেছে। আকাশে মেঘের গর্জন। আমার হৃদয় অশান্ত—আগস্ট মাসের খরস্রোতা নদীর মত। হে নদী, তুমি জান, কোনদিকে তুমি বয়ে চলেছ? জাননা? তাহলে তুমি প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যাও কেন?—হে কলস! জলে জলবিন্দুর মত ডুবে যাও! আমিও তোমার গভীর সমুদ্রে ডুবেছি।'

ত্রিল মধ্যযুগের এক বাংলা লোকগীতের বই পড়ছে। বাইরে অন্ধকার। এমন অন্ধকার কেবল বাংলাদেশের ভেজা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। ল্যাম্পের পীতাভ, ক্ষীণ আলো বারান্দায় পড়ছে। সহসা বিদ্যুৎ চমকে উঠল, প্রবল বেগে হাওয়া বয়ে চলল।

"আমি আগামীকাল ইণ্ডিয়া হয়ে করাচী রওনা হচ্ছি।" কামাল বলল। ত্রিল চমকে উঠল।

"জানি।"

"তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হবে।"

"হ্যাঁ।"

হাওয়ার বেগ বাড়ল। বারান্দার নীচে অশোক গাছের পাতা অস্থির।

"অশোক গাছ—" ত্রিল যেন তাকে বলছে—"কোনো সুন্দরী যুবতীর শুধুমাত্র স্পর্শেই এর সব ফুল ফোটে।" বর্ষার জল বারান্দায় ঢুকছিল। কামাল আড়ালের জন্য চেয়ার টেনে নিল।

'কাক কালো'। ত্রিল পড়ছে—'কোকিল তার চেয়েও কালো এবং সঞ্জারওয়ালী নদীর জল তার চেয়েও কালো কিন্তু তার কেশরাশি সবচেয়ে বেশী কালো।"

বাইরে পুকুরের জলে জলতরঙ্গের সুর। বিদ্যুৎ চমকাল। বাগানের ঘাস-পাতা-ফুল সেই ক্ষণিকের আলোয় ঝলমল করে উঠল।

"চম্পক বৃক্ষের ওপরে বুড়ীগঙ্গা অনর্থক কোলাহলে ব্যস্ত!" ত্রিল বলল—"তাকে বলে দাও, আমি কান বন্ধ করে বসে আছি। আমার নৌকো অন্য এক তীরে বেঁধেছি আমি।"

"আচ্ছা, আমি বলব।" কামাল ধীরে ধীরে বলল।

দ্বিতীয় দিন সকালে ঢাকায় ম্রিল এশ্‌লেকে রেখে কামাল প্লেনে কলকাতা রওনা হল। সে একবার ভাবল, স্বর্গীয় মামা নবাব আব্বাস রজা বাহাদুরের 'দত্ত হাউসে' আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু পরমুহূর্তেই সে এ চিন্তা ত্যাগ করে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ রওনা হল।

হাওড়া স্টেশনে এক পুলিশ অফিসারকে তার দিকে আসতে দেখে সে ঘাবড়ে গেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভিসা ও পাশপোর্ট ছুঁয়ে সে আশ্বস্ত হল—নিয়ম ভঙ্গ করে সে ইণ্ডিয়ায় ঢোকে নি। ট্রেন চলছে—বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর, এলাহাবাদ। এক অপরিচিত ভূখণ্ডে ট্রেন ছুটে চলেছে। একবছর আগে এখানকার সব কিছু তার নিজের ছিল। ভারত তার দেশ ছিল কিন্তু আজ বিদেশীর মত, পকেটে ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে সে এদেশে এসেছে। তার মনে হল, সবাই তাকেই দেখছে, তাকে সন্দেহ করছে—তুমি পাকিস্থানী। থানায় চল। তুমি পাকিস্থানী—তুমি মুসলমান—স্পাই—মুসলমান স্পাই ট্রেনের চাকা থেকে ধ্বনি উঠছে—দেশদ্রোহী—স্পাই—দেশদ্রোহী স্পাই। চমকে উঠে চোখ খুলল। ট্রেন চারবাগ স্টেশনে প্রবেশ করছে। তার বুক কেঁপে উঠল।

চারবাগ—লক্ষ্ণৌ—লক্ষ্ণৌ।

দুদিন সে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিল। 'খোয়াবাঁ'র ক্লেইম পেপার্স নিতে তাকে দেরাদুনে যেতে হবে। তৃতীয় দিন সে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করল। ট্রেন যখন মোরাদাবাদের কাছে, হঠাৎ তার মনে পড়ল, লক্ষ্ণৌয়ে কেউ তাকে বলেছিল, চম্পা বিলেত থেকে ফিরে মোরাদাবাদে নিজের কাকার বাড়ীতে উঠেছে। কামাল ভিসায় মোরাদাবাদের নামও লিখিয়ে নিয়েছিল।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল। সে জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে এল। একটা টাঙ্গা নিয়ে সে পকেট থেকে চম্পার ঠিকানা খুঁজে বের করল।

টাঙ্গা বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। পথে অনেক ঠেলাগাড়ী, এক্কা। বোরখাপরা মেয়েরা পথের একপাশে চলেছে। টাঙ্গা

একটা পাড়ায় ঢুকল। পাড়ায় অনেক ভাঙ্গা বাড়ী, মসজিদের মাথায় একটা কাক বসে। এটাই চম্পার পাড়া।

সে টাঙ্গা থেকে নামল। সামনে বিরাট, পুরোনো আমলের কটক। ফটকের মধ্যে নীচের দিকে ছোট্ট জানালা। জানালা টপকে সে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে কি রকম গুমোট। একদিকে খড় রাখা আছে। একপাশে দুতিনটে খাট। একটু এগিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি, বোধহয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৈরী। অনেক ডাকাডাকির পর যখন সে উত্তর পেল না, সাহস করে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। দ্বিতীয় তলায় ছোট্ট এক উঠোন। মাটির গামলা রাখা আছে। সামনে বড় বারান্দা ও একটা কামরা। কামরাটি সম্ভবতঃ এই বাড়ীর বৈঠকখানা। একটা চেয়ার ও একটা মশারি একপাশে রাখা। একটা আলমারীতে 'খোদাই ফউজদার' ও 'অবধপঞ্চ'র মলাট রাখা। দরজায় অসংখ্য সবুজ, নীল, লাল, হলদে কাঁচ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে পশ্চিম দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। ইঁট বাঁধানো গলি খুব পরিষ্কার, সে লক্ষ্য করল। নীচে মসজিদে পেশ-ইমাম নমাজ পড়ছে। তাঁর সামনে তামার থালে কিছু রাখা আছে। পাড়ার কয়েকটি ছেলে নীচে ইঁট বাঁধানো সরু গলিতে হল্লা জুড়ে দিয়েছে, ও পেশ-ইমামকে 'বটকলেজি বটকলেজি' বলে ভেঙ্গাচ্ছে। ইমাম সাহেব সেলাম করে উঠলেন। ছেলেদের ঢিল ছুঁড়ে ভাগিয়ে আবার বসলেন। পৃথিবীর গুরুত্বহীন অজানা এক কোণায় জীবনযাত্রা শান্ত ও সহজ। শান্তির কথা ভেবে সে রোমাঞ্চ অনুভব করল।

কামাল সিঁড়ি বেয়ে নীচে গলিতে নেমে এল। কোথায় গেল সবাই? চারিদিকে নিস্তব্ধতা। বাড়ীর ডান দিকে সবুজ ঘাসের বুকে গ্রেভ ইয়ার্ড। সে রোমাঞ্চ অনুভব করল—জীবিত আত্মা, মৃত আত্মা। এখানে কতো অমঙ্গল। শবের শহর—এখানে চম্পাবাজী কোথায়? কবরের উপরে খড়ের ছাত। একধারে নিম গাছ। গাছের নীচে ছাগল বাঁধা। চম্পাবাজী, তুমি কোথায়? ওপরে জানালা দিয়ে একটি মেয়ে নীচে তাকিয়েছিল। কামালকে দেখতেই সে জানলা বন্ধ করল।

সে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্য এক ফটকের সামনে দাঁড়াল। একই রকমের ফটক। রঙ বেরঙের কাঁচ গাঁথা অলিন্দ। নীচে দারোয়ান দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ভাঙ্গা বারান্দা। সে দরজার কড়া নাড়লো।

"কে?" ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

কামাল এতই নিরাশ ও বিরক্ত যে তার কণ্ঠ থেকে স্বর ফুটল না।

"কে?" পাজামা পরা এক বুড়ী ভেতর থেকে উঁকি মারল।

"আমি।"

"আমি কে হে? নাম বল ভাই।"

"আমি কামাল রজা। পাকিস্থান থেকে এসেছি।"

কিছুক্ষণ পর বুড়ী দরজা খুলল—"এস, ভেতরে এস মিয়াঁ।"

সে ভেতরে ঢুকল। উঠোন ইঁট দিয়ে বাঁধানো। দেওয়ালের সাথে লাগানো ফুলের টব। এখন শুকনো। কোনোদিন ফুল ছিল। বাবর্চীখানার সামনে মুর্গীর ছোট-ছোট খোপ। উঠোনের সামনের দালানে তখ্তার ওপর চম্পা বসে।

"আরে, হ্যালো!—কামাল!—আশ্চর্য!!"

"চম্পাবাজী!"

"গুড গড!" সে তখ্তা ছেড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তখ্তপোশ পরিষ্কার করে বসবার যায়গা দিল কামালকে।

"আমি সামনের বাড়ীতে ঢুকে গিয়েছিলাম।" কামাল বলতে শুরু করল।

"আমার বাড়ীর সবাই চাচা মিয়াঁর বাড়ী গেছে। চল, সেখানে বসে গল্প করব।

আলনা থেকে চাদর নিয়ে সে ভাল করে সারা শরীর ঢাকল। তারপর ঘোমটার মত, মাথার ওপরে চাদর টেনে সে বাইরে বেরিয়ে এল। "আমাদের এখানে বোরখার রেওয়াজ নেই। আমরা এই ভাবেই চাদর ঢাকা দিই।" সে ব্যাখ্যা করল। প্রাচীন মসজিদের কাছে পৌঁছে একটা গলির পথ ধরল। গলি কবরস্থানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে। পরিষ্কার পথ। দেওয়াল থেকে ঘাস ও বটগাছ গজাচ্ছে।

"এটা···?" কামাল কবরস্থানের দিকে ইশারা করল।

"আমরাই!" চম্পা তার সঙ্গে চলতে-চলতে বলল।

"এখানেই আমাদের জন্ম, এখানেই মরব।"

কয়েক পা এগিয়ে 'দেওয়ান খানা'।

"চাচা মিয়াঁর বাড়ী?

"হ্যাঁ।"

"এখানে তো কেউ থাকে না?" কামালের প্রশ্ন।

"না।" চম্পা সহজভাবে উত্তর দিল। "এটা ইমামবাড়া। এই যে তখ্‌তা দেখছ, পাকিস্থান সৃষ্টি হবার আগে এখানেই সেই প্রসিদ্ধ 'তখ্‌তা মজলিস্' বসত।

আবার সেই পুরোনো দিনের কথা। কামাল মনে মনে বিরক্ত হল। "আসল বাড়ী ভেতরে।" চম্পা বলে গেল—"চলে এস! তোমাকে দেখে কেউ পর্দা করবে না।"

সে ঘরের ভেতরে এল। উঠোনে চেয়ার, খাট ছড়ানো। বাবর্চী-খানা থেকে একটা দুর্গন্ধ এদিকে ছড়াচ্ছে। দু-চার জন লোক এদিকে ওদিকে বসে। আকাশে মেঘ কিন্তু হাওয়া নেই। একটা গুমোট ভাব। বর্ষার কীট-পতঙ্গ প্রদীপের আশে-পাশে নাচছে।

"চা অব্বা!—ইনি কামাল—!" অন্ধকারে চম্পাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল।

"এস এস, বস মিয়াঁ—তোমার আগমনে সম্মানিত মনে করছি নিজেকে।" পালঙ্কে শোয়া চা অব্বা উঠে বসলেন।

একটি মেয়ে হাতে লণ্ঠন নিয়ে বাবর্চীখানায় গেল। আরেকটি মেয়ে দালানে বসে লণ্ঠনের আলোয় পড়ছে। হে আল্লা! মিডিল ক্লাস এত ডিপ্রেসিং! কামাল আতঙ্কিত হল। দালানে বসা মেয়েটি চোখ উঠিয়ে কামালকে দেখল। কামাল তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। মিডিল ক্লাস মেয়েদের রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম সম্পর্কে সে অনেক কিছু শুনেছে। যে মেয়েটি বাবর্চীখানায় তার জন্য চা বানাচ্ছে, কামাল চায় না নিছক সময় কাটাবার জন্য তার সঙ্গে মেয়েটি সুন্দর-সুন্দর কথা বলে ও তারপর তাকে লম্বা-লম্বা চিঠি অর্থাৎ

প্রেম-পত্র লেখে।

সে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে।

"এরা দু'জনেই আমার কাজিন।" চম্পা পরিচয় করিয়ে দিল। "ওই মেয়েটি জেবুন্নিসা। সে দিল্লীতে এম. এ. পড়ছে। ছোট মেয়েটি মরিয়ম জমানী, এগ্রিকালচার নিয়ে এম. এস. সি. পড়ছে। তুমি চুপ কেন?" "এমনিই চম্পাবাজী।"

তারপর চাচামিয়াঁ আস্তে আস্তে কথা বললেন। সেই পুরোনো কথা, হিন্দুস্থান, পাকিস্থান। "আমাদের তো মিয়াঁ সর্বনাশ হয়ে গেল।"

"এখানে সবাই কেমন যেন চুপচাপ।" কামাল জিজ্ঞেস করল— "আর সবাই কোথায় গেছে?"

"সেখানে, যেখানে তুমি গেছ।" চাচামিয়াঁ উত্তর দিলেন।" খোখরাপারের পথে সবাই চলে গেছে। রুহিলখণ্ড খালি। আমরা কয়েকজন বৃদ্ধরা রয়ে গেলাম। দু-তিন বছর পর যখন আমরা মরে যাব, এখানে শেয়াল ডাকবে।"

কামাল উঠে পায়চারি করছে। মরিয়ম জমানী নিঃসঙ্কোচে চা বানিয়ে আনছে। তার হাবেভাবে কিন্তু রোম্যান্স শুরু করার ইচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছিল না। কামাল আশ্বস্ত হয়ে ভাবল।

"পাকিস্থানের খবর কি?" চা অব্বা জিজ্ঞেস করলেন—"শুনেছি এখান থেকে ফকিররা ওখানে গিয়ে লক্ষপতি বনে গেছে। সত্যি নাকি মিয়াঁ? আমার ভাইপো লিখেছে, সেখানে প্রত্যেক জায়গায় পাঞ্জাবীরা উত্তরপ্রদেশবাসীদের হেয় মনে করে। মিয়াঁ, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেছে···অবশ্য ওখানে গিয়েই আর কোন্ লাটসাহেব হয়ে যাব?" তিনি প্রসঙ্গ বদলালেন। "মরিয়ম, ভাইয়ার জন্য বিস্কুট নিয়ে এস···কামাল মিয়াঁ এই বাড়ীর দ্বারে চার চারটে চাকর বসে থাকত। এখন সব কিছুই হারিয়েছি।"

কামাল বসে রইল।

"এখানে এখনো পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক আলো এল না। পাড়ায় অনেকদিন হল এসেছে। এসেছে পিসীমার কুঠিতে। পিসীমা পাকিস্থানে চলে

গেলেন। তাঁর কুঠি কাস্টোডিয়ান নিয়ে নিল। সেখানে শিখরা স্কুল খুলে ইলেক্‌ট্রিক আনিয়েছে। আমাদের বাড়ীতে এখনো এল না।" সেই তরল অন্ধকারে চম্পার কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে।

"ইলেক্‌ট্রিকের জন্য পয়সা চাই!" চা অব্বা সবেগে টেবিলের ওপর চায়ের ট্রে রাখতে রাখতে বললেন। ট্রে'র ব্যালেন্স ঠিক থাকল না, মাটিতে পড়ে গেল। জগে রাখা পুরো দুধ উঠোনে ছড়িয়ে পড়ল। চম্পার উদাস দৃষ্টি মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা দুধের দিকে।" এত রাত্রে এখন কোথা থেকে দুধ আসবে!" চম্পা বললেন।

"এই ব্যাপারে দুঃখ কোরো না চম্পাবাজী!" কামাল আবেগভরা কণ্ঠে খুব ধীরে ধীরে বলল। চম্পা চোখ তুলে তাকে দেখে হাসল। কামাল চম্পাকে আজ নতুন এক ভূমিকায়, এক নূতন পরিবেশে দেখল। চম্পার আসল রূপ এটাই। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে চোখ বন্ধ করল। লক্ষ্ণৌ, প্যারিস, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনের চম্পা। মোরদাবাদের এক গলির অন্ধকার এক ঘরের বাসিন্দা চম্পা। 'মিডিল ক্লাস' চম্পা বাহাদুর চম্পা। বাহ চম্পাবাজী, তোমার সত্যিই তুলনা হয় না।

মোরাদাবাদে কামাল দুদিন রইল। রাত্রে ছাদের সেই কামরায় তাকে পাঠানো হল, যেখানে সে প্রথমে পোঁছেছিল। গভীর রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে সে মোরাদাবাদের চাঁদের ম্লান আলো, বাড়ী মসজিদ, মীনার ও নিম গাছ দেখল।

দুপুরবেলা বিশ্রাম করার জন্য তার খাট সিঁড়ির শেষ ধাপে পাতা হল। সেখানে রামগঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

"শুনেছি তোমাদের দেশে হিন্দুস্থানী শাড়ীর খুব ডিমাণ্ড।" সিঁড়ির উপর বসে খুব খুশী মনে চম্পা কথা শুরু করল। "তোমার দেশের উঁচু সোসাইটির মহিলারা এখানে এসে প্রথমেই শাড়ীর দোকানে হামলা করে। শুনেছি তোমাদের ওখানে সোসাইটি··· !"

"কি সোসাইটির কচকচি চালিয়েছ!" কামাল বিরক্ত হয়ে বলল—"ভুলে যেও না চম্পাবাজী, শ্রেণী সচেতন হতে তোমার পনের বছর

লেগেছে।" চম্পা হাসল। শ্রেণী সচেতনতার কথা বলতে চাইলে আমার কাজিনের সাথে কথা বল। জেবুন ও মরিয়ম বেশ নামকরা স্টুডেন্ট ওয়ার্কার!"

কামাল এবার বুঝতে পারল। জেবুন ও মরিয়মের মত মিডিল ক্লাস মেয়েরা সম্পূর্ণভাবে রোম্যান্টিসিজম ও ফ্রস্ট্রেশন ত্যাগ করেছে। আজ থেকে পনেরো বছর আগে তারা সম্ভবত চম্পার পথই বেছে নিত কিন্তু যুগ বদলেছে। এরা নতুন মেয়ে। চম্পা মধ্য সময়ের মেয়ে। জীবন অলীক স্বপ্ন নয়, কল্পনাও নয়—তারা বুঝতে পেরেছে।

"হায়, আমি, জেবুন ও মরিয়ম, গরীব কিন্তু সাহসী মেয়ে—তাদের মনে কোনো সংশয় নেই। যদি ৪১ সালে এদের মতই হয়ে যেতাম!" চম্পা কামালের মনের কথা যেন বুঝতে পারল।

"ঘটনা তো আমাদের হাতের জিনিস নয় যে মনের মত করে ঘটবে!" কামালের উত্তর।

হঠাৎ কামাল অনুভব করল, সে বৃদ্ধ! তার সামনের চৌখাটের ওপর বসা চম্পা বৃদ্ধা। আমরা দু'জনেই অনেক লম্বা পথে পাড়ি দিয়েছিলাম। পথ শেষ হল না, আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম। সে অবাক হয়ে ভাবল।

কামাল এখন এক অজানা শহরের এক অন্ধকার সিঁড়িতে বসে আছে। নদী থেকে বর্ষায় ভেজা হাওয়া তার চুল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের বর্ষা—কিন্তু হিন্দুস্থান আর তার দেশ নয়—তার ভিসার মেয়াদ শেষ হতে চলল। কাল সকালে সে নিজের দেশে রওনা হবে। মোরাদাবাদ, চম্পা, জেবুন, মরিয়ম, চা অব্বা, সকলে এখানে রয়ে যাবে। এই রূঢ় বাস্তবকে অনুভব করে তার অশ্রু বিসর্জন করা উচিত? আজ থেকে কয়েক বছর আগে এই ঘটনা ঘটলে সে হয়ত কান্না জুড়ে দিত কিন্তু আজ সে বুঝতে পারছে, সে বুড়ো হয়েছে। আবেগ, উন্মাদনা আর হয়ত নেই। সে এখন কিছুটা শান্ত। 'ধীর, স্থির ও শান্তি—প্রাচীন ইউনানী আদর্শ' হরিশংকরের কথা মনে পড়ল।

চম্পা তার মনের কথা বুঝতে পারল। "তোমার প্রাণের বন্ধু হরিশংকর কোথায়?"

"চম্পাবাজী !" সে একটু রেগে বলল—"হরিশংকর এখন আমার প্রাণের বন্ধু নয় ! কি জানি সে কোথায় !"

."তাকে চিঠি লেখ না কেন ?"

"তুমি এখনও বুঝতে পারলে না যে বন্ধুদের চিঠি লেখা আমি বন্ধ করেছি। হরিশংকর শ্রীবাস্তবকে আমি কি লিখব এবং কেন লিখব ?"

"তুমি এখনো সেন্টিমেণ্টাল রয়ে গেছ ?"

না !" তার স্বরে অভিমান। চম্পা যেন তার দুর্বলতা ধরে ফেলেছে। "এ সব বাদ দিন চম্পাবাজী !" তার স্বরে বিরক্তি। "এই ইণ্ডো-পাক মেলো-ড্রামায়, আল্লার শপথ নিয়ে বলছি, আমি ভীষণভাবে বোর হয়ে গেছি। আমি আর যেন পারিনা ! হরিশংকর আজ-কাল সম্ভবত ব্যাঙ্গালোরে ! তাহলে কি কাঁদতে-কাঁদতে, গিয়ে আমি ওকে জড়িয়ে 'ধরব' দূর ছাই !"

"তুমি আজ পর্যন্ত শক্ত হতে পারলে না।" চম্পা আস্তে আস্তে বলল—"তুমি হরিশংকরের সঙ্গে দেখা করতে চাও না, কেননা তোমার ভয় তাকে দেখলেই তুমি তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকবে। আচ্ছা, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে কেন ?" এও বড় কঠিন মেলোড্রাম্যাটিক ব্যাপার।

"মানুষ পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-শোনা করতে চায়ই !" কামাল এর চেয়ে ভাল আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।" তা ছাড়া মোরাদাবাদ পথেই পড়ে।" সে যেন একটু বিব্রত।

টিনের ছাতে টপ-টপ বর্ষা বিন্দু পড়ছে। ভিজে মাটির সোঁধা গন্ধ কামালের নাকে। মাথায় আমের বোঝা নিয়ে একটি মেয়ে নীচ দিয়ে চলে গেল। চম্পা বারান্দায় বসে বাইরের দিকে দেখছে।

অনেকক্ষণ থেকে কামাল ভাবছে, সে চম্পাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু সাহস হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত অন্য দিকে তাকিয়ে, সাহস জুগিয়ে সে জিজ্ঞেস করল—

"চম্পাবাজী ! তুমি এখন কি করবে ?"

বড়ই নির্মম প্রশ্ন। কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জানার অধিকার আমাদের আছে কি ?

"আমি?" চম্পার উত্তর—"বেনারস ফিরে যাচ্ছি শেষ পর্যন্ত। জান, আমার পূর্বপুরুষদের শহরের নাম কি?"

"শিবপুরী।"

"হ্যাঁ—আনন্দের নগর। কোনো একদিন শিবপুরী আনন্দের নগর সত্যিই হবে—দেশের অন্যান্য নগরের মত। আমার দেশকে দুঃখের দেশ অথবা আনন্দের দেশে পরিণত করা আমার উপর, আমার মত হাজার হাজার নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকের উপর নির্ভর করে।" সে তার হাত প্রসারিত করল—"দেখ, এই হাত নৃত্যশিল্পীর হাত নয়—লেখক অথবা শিল্পীর হাত নয়—অত্যন্ত সাধারণ একটি মেয়ের হাত—এই হাত এখন কাজ করতে চায়।"

সে আর কথা বলল না। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হাওয়ায় মসজিদের আজানের সুর। চম্পা দোপট্টা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে মাথা ঢাকল।

"কামাল।" কিছুক্ষণ পর অস্থিরভাবে চম্পা বলল—"তুমি কেন চলে গেলে? আমি যদি আজ পাকিস্থান চলে যাই, খুব ভাল একটা চাকরি পাব না কি? আমার কাছেও তো অনেক ভাল ভাল ডিগ্রী আছে? আমিও তো কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে এসেছি!"

রঙিন দোপট্টা ও হলুদ শাড়ী পরে চম্পার আত্মীয় নীচে দালানে কিছু ভাজছিল।—"ভাই, এদিকেও কিছু পাঠিও।" চম্পা চেঁচিয়ে, জানালা থেকে মাথা বাড়িয়ে বলল।

"আচ্ছা বিজিয়া! -একটু অপেক্ষা করুন।" তারা একটা গান ধরল—

'ঝুলা কিন্নে ডালী রী অমরাইয়া।

(আমের বাগানে কোথায় দোল টাঙ্গাব!)

খাটিয়ার ওপর শুয়ে শুয়ে কামাল চোখ বন্ধ করল। ছোটবেলা থেকে সে এই গান শুনে আসছে। বর্ষাকাল এলেই তার পরিবারের মেয়েরা উনুনে কড়া চাপিয়ে এই গান ধরে।

সিঁড়ির নীচে একটা জোঁক। জেবুন লুচির প্লেট নিয়ে গুন্ গুন্ করতে করতে উপরে এল। প্লেট রেখে আবার নীচে গেল।

চম্পা চৌকাঠের কাছে বসে আছে। "তুমি ভাবছ—" সে আন-মনা হয়ে বলল" আমার দুয়ারে আর কে আসবে। কিন্তু কামাল আমি মনে করি, ব্যক্তিগত সাফল্যের দিক দিয়ে বিচার করলে আমি তোমার চেয়ে বেশী ভাগ্যবতী। আমি আমার পথ চিনতে পেরেছি।"

"তুমি ঠিক বলছ চম্পাবাজী।"

নীচে জলের ট্যাংকে বর্ষার জলতরঙ্গ। চারিদিকে সবুজ। গাছপাতায় জল। গলি ছোট ছোট নদীতে বদলেছে। ছাতের নল দিয়ে জলের ঝর্ণা পড়ছে। উঠোনে ছোট-ছোট নির্মল ঝিল। "এ আমার জল-মহল।" চম্পা খুবই আস্তে আস্তে বলল—"এখানে আমার অশ্রুধারা বয়ে চলেছে।"

দালানে দোপট্টা উড়ল।

"আমি অত্যন্ত সাধারণ একটি মেয়ে।" চম্পা বলে চলেছে।" আমি যদি ঈশ্বরের প্রেমিকা হতাম—আমি যদি মীরা, মুক্তাবাঈ, সেণ্ট সোফিয়া হতাম—আমার শরীরে অসংখ্য ঘায়ের নিশান থাকত। আমার বস্ত্র পবিত্র রক্তের রঙে রঙিন হত। আমার মাথার চারিপাশে পবিত্র আলোর চক্র থাকত। আমার কাছে বিষের পাত্র ও সাপের ঝাঁপি পাঠানো হত। কিন্তু আমি স্রেফ চম্পা আহমদ্। আমার ঘা কেউ দেখতে পাবে না, কেননা আমাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, আমাকে দেখে মজা করেছে— আজ তারাও আহত। তারা দুর্বল। আমার ঘা দেখবার দৃষ্টি তাদের নেই। লোকে সম্ভবত আমাকে দেখে হাসে আর সেণ্ট সোফিয়াকে পুজো করে।

ঝড়ো হাওয়ায় জাম গাছ থেকে কয়েকটা জাম টপকে পড়ল। চম্পা চুল থেকে হলদে পাতা বের করল।

"কামাল!" সে ভাবতে ভাবতে উত্তর দিল—"জীবনে আমি অনেক জিনিয়াসদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কখনো নিজেকে দেখে খুশী হত, কখনো দুঃখী। তুমি খুশী কেন? আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করি—এত বুদ্ধিমান হয়েও তুমি আনন্দে মগ্ন! আশ্চর্য! উত্তর পাই না। আনন্দের মেয়াদ ক্ষণিকের। আমি দেখেছি, এমন অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, যারা ব্যক্তিগত

দুঃখ নিয়ে হা-হুতাশ করে না। নিজের দুঃখ, বেদনাকে তারা বিশ্বের দুঃখের সাথে মিলিয়ে দেয়। কত সহজ ব্যাপার! পাহাড়ের নীচে পৌঁছে বুঝতে পারলাম, আমার ব্যক্তিগত দুঃখ কত তুচ্ছ!"

"আট বছর পর দেশে ফিরে এখানকার অবস্থা দেখলাম। এমন কিছু দেখলাম, যা দেখে গর্বে আমার মাথা উঁচু হল; এমন কিছুও দেখলাম, যা দেখে লজ্জায় আমার মাথা নত হল. আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম। আমার সামনে সমস্যার পাহাড়। জান, তখন কি হল —পিঁপড়ে কি করল? পিঁপড়ে কানে হাতী ঝুলিয়ে পাহাড়ের ওপর চড়তে শুরু করল।"

"এখনো জানতে চাও কামাল, আমি কি করতে চাই?" পরের দিন সকালে কামাল রওনা হল। গলি থেকে বেরিয়ে টাঙ্গায় স্টেশনের পথ ধরল। চম্পাবাজী ফের দূরে সরে গেল—ভাঙ্গা বাড়ীর দরজায়, ছবির মত সে দাঁড়িয়ে। ঠিক এইভাবে, অনেকদিন আগে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে 'মুর্গী সরায়ে'র কাচের দরজার পেছনে সে চম্পাবাজীকে ছেড়ে এসেছিল। ঠিক এইভাবে আরেকবার 'গুলফিশাঁ'র ফটকের সামনে অন্ধকার পথে চম্পাবাজী দাঁড়িয়েছিল যখন ভাইয়া সাহেব তাকে ছেড়ে পাকিস্থান চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সে একা নয়, অসহায় নয়। চম্পাবাজী আজ এক বিরাট জনসমুদ্রের সঙ্গী। তিনি বিনা সর্তে বিরাট জনতার সঙ্গ ও সার্থকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। চম্পা মিছিলে যোগ দিয়েছে, মিছিল এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে পাড়ার গলি, মসজিদের মীনায়, জেবুন ও মরিয়ম, রাস্তার ছেলে-মেয়ে, গরীব টাঙ্গাওয়ালা, বোরখাপরা মেয়ে ও জনতা। চম্পাবাজী এদের সঙ্গী। এরা এগোতে চায়। আজ না হয় আগামীকাল এরা এগোবেই। কোনোদিন এরাও উপরে উঠবে। এই বিন্দুতে পৌঁছে ত্রিলের জীবনাদর্শের সমস্ত তার ঝংকার তুলে ছিঁড়ে যায়।

"কি করব, পার্টনার!" ট্রেনে বসে সে মনে মনে বলল— "আমার শেষটা ভয়ানক ট্রাজিক!"

ট্রেন শিবালকের পাহাড় ছাড়িয়ে হিমালয়ের সবুজ অঞ্চল ছুঁয়ে

চলেছে। দেরাছন স্টেশনে পৌঁছে সে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গেল। কাগজপত্র বের করল। তারপর জলনওয়ালার সুন্দর পথে বেড়াতে শুরু করল।

সামনে রসপনা বয়ে চলেছে।

"ভাই, হরিশংকর!" কামাল বলল।

"বল ভাই!"

"প্রফেসার হ্যামিলটন ঠিকই বলছিল। আমরা কোন জঞ্জালে আটকে পড়েছি।

সেদিন ত্যাগের মহিমা নিয়ে তারা তর্কবিতর্ক করল। দার্শনিক মেজাজে কথাবার্তা বলল।

"এস, কুঠিরের নাম পড়ি। নাম দেখে, গৃহকর্তার সায়কোলজি বুঝতে পারা যায়।" চলতে চলতে এক বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হরিশংকর বলল।

"আমরা কখনো বাড়ী তৈরী করে তাতে বাস করব না।" কামাল বলল।

ঠিক বলেছ। দেখ, বুর্জোয়ারা কি রকম সেন্টিমেন্টাল হতে পারে! এই নামটা পড়।"

"খোয়াবিস্থান—হে ঈশ্বর!"

"কিন্তু তুমি নিজে 'গুলফিশাঁ' ও 'খোয়াবাঁ'তে থাক।"

"জানি।"

"ভাই, কামাল।"

"হ্যাঁ, য়্যার!"

"ভেবে দেখ, লোকেরা বাড়ী বানিয়েছে কি সুন্দর, কি চমৎকার! সারা বিশ্বে লোকেরা ঘর গড়ে।"

"সত্যিই বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

তারা দুজনেই এক কালভার্টের ওপর বসে পড়ল। আসলে প্রফেসারের সংসার ত্যাগের ঘটনা তাদের বিচলিত করেছে। এক ভদ্রলোক, সুস্থ ব্যক্তি—বৈজ্ঞানিক. অথচ চলে গেল জঙ্গলে! আশ্চর্য!

"এর পেছনে কোনো রহস্য নিশ্চয় আছে!" কামাল বলল—'অর্থের অর্থ'।

যতক্ষণ আকাশে গোধূলির শেষ আলো রইল, তারা নাম পড়ে গেল—'নস্তরণ', 'দৌলতখানা', 'আশিয়ানা', 'রাজমহল'।

এইসব বাড়ীর বাগানে পাহাড়ী ফুল ফুটেছে। আকাশে বাতাসে ফুলের সৌরভ। সংসার মোহময় মনে হয়।

তারা আবার গম্ভীরভাবে কালভার্টের ওপর বসে পড়ল। নহরের জল দেখল। নহর পথের ধারে বইছে। জলে একটা ছেঁড়া জুতো ভেসে চলেছে।

লম্বা মত একটি মোটরগাড়ী তার সামনে এসে দাঁড়াল। সে চমকে উঠল। চোখ কচলে সে চারিদিকে দেখল। হরিশংকরকে আর দেখা যাচ্ছে না। এটা '৪২ সাল নয়। '৫৬ সালে সে দেরাছনে উপস্থিত। সে দ্বিতীয়বার চোখ কচলাল। সে নিজের বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। মোটরগাড়ী থেকে এক সরদারজী নেমে তার দিকে এগিয়ে এল।

"আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"আমি…আমি…" সে ভড়কে গেল। সরদারজী তাকে সম্ভবত ঠগ ভাবছেন। ভাবছেন ড্রইংরুম থেকে তাঁর রেডিও চুরি করবার জন্য সে এসেছে। সে দ্বিতীয়বার ফটকে আঁটা শ্বেত পাথরের ফলকটি পড়ল—

"নবাব তকী রজা বাহাদুর অফ কল্যাণপুর।

তার বাড়ী। সে উঠে দাঁড়াল। তার গলা শুকিয়ে আসছে। পকেট থেকে প্রমাণস্বরূপ সে কাগজপত্র বের করে সরদারজীর হাতে রাখল।

"আচ্ছা, আপনি মুভেরল প্রপার্টির ব্যাপারে এসেছেন? তশরীফ লাওজী তুসী! (চলে আসুন মহাশয়!)। সে সরদারজীর সঙ্গে বাগানের পথ ধরল।

"আপনার স্টোর রুম বন্ধ করে রাখা হয়েছে। চাবি এনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ড্রইংরুমে এনে সরদারজী তাকে চা দিলেন। খাবার খেতে অনুরোধ করলেন।

সরদারজীর দেশ রাওয়ালপিণ্ডি। এখানে বিরাট এক কনট্রাকটর ইনি। অনেকক্ষণ নিজের দেশের কথা মনে করে হাসি-কান্নায় কাটালেন। কামাল ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"আমি বক্সরুম দেখবার জন্য কাল সকালে একবার আসতে পারি ?"

"নিশ্চয়। নিজের বাড়ী মনে করবেন।" সরদারজী নিজের মোটরে করে তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

সকালে সে আবার 'খোয়াবায়' হাজির হল। রোদ উঠেছে। বাগানে দুজন তরুণী খালি পায়ে ব্যাডমিণ্টন খেলছে। সরদারজী ঘোষদের খড় দিচ্ছিলেন। ভেতরে রেডিও বাজছে। শান্ত পরিবেশ। সে স্টোর রুমের দিকে এল এবং তালা খুলবার আগে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল।

সেখানে বসে বসে সে অনুভব করল, বিংশ শতকের হিন্দুস্থানের হারিয়ে যাওয়া এক বংশের মানুষ। এইখানেই, এই বাড়ীতে তার পূর্বপুরুষদের অনেক স্মৃতি, অনেক হাসি, অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা লুকিয়ে আছে। কিছুদিন আগেও তার পরিবারের লোকেরা ফুল, পাহাড় ও এখানকার জঙ্গলে স্বপ্নের মত সুন্দর জীবন কাটিয়েছে। সামনে দেবদারু গাছের মধ্যে দিয়ে যে সরু পথ চলে গেছে, সেই পথে রঙিন ছাতা নিয়ে যখন তার পরিবারের মহিলারা চলে যেত, মনে হত ইউরোপিয়ান অথবা তুর্কী উপন্যাসের নায়িকারা চলেছে।

শীতকালে যখন তারা এখানে আসতেন, মধ্যকার কামরার মেঝেতে গদি পাতা হত। পাহাড়ী খানসামা ফকিরা চায়ের ট্রে এনে ফায়ার প্লেসের সামনে রেখে দিত। শীতের রাতে কামাল ও তলঅতের সামনে বইয়ের ভিড়। রং ভরার বই, রূপকথার সংকলন, পুতুল ও মেকানো সেট। যখনই এই গোদাম খোলা হত, সে আর সব ছেলেদের সঙ্গে কৌতূহল নিয়ে আম্মার পেছনে পেছনে গোদাম ঘরে ঢুকত। কত রহস্যময় জিনিস এই ঘরে থাকত। সিন্দুক,

টুকরি, বাসন, ঝাড় ফানুস, বড় বড় ল্যাম্প, পুরোনো পত্রপত্রিকা, চিঠিভরা য়্যাটাচি কেস, কার্পেট।

শীতকালে বাবা বাগানে চেয়ারে বসে গড়গড়া টানতেন। লিচু গাছের মাথায় হাল্কা কুয়াশা, সার্ভেণ্ট কটেজের ত্রিলোচন মালী দেওয়ালে একটা ছবি সেঁটেছিল। ছবির বিষয়বস্তু: এই জীবনে যে মানুষ খারাপ কাজ করে, নরকে তাকে দুর্দশা ভোগ করতে হয়। (উদাহরণ—একটা ছবিতে একজন গাড়োয়ান মৃত প্রায় বলদের কাঁধে প্রচুর বোঝা চাপিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পাশের ছবিতে, নরকে সেই ব্যক্তি একটা গাড়ীর বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দৈত্যরা নির্দয়ভাবে তাকে চাবুক মারছে।) রোজী জমাদারণী, যার মেয়ে কোনো ইংরেজ বাড়ীতে আয়ার কাজ করত—সব সময় লক্ষ্য রাখত, ডাস্টবিনে ব্যবহার করা ভেজা চা ফেলা হয়েছে কিনা। সে প্রায়ই সেখান থেকে চায়ের পাতা কুড়িয়ে, শুকিয়ে আবার চা বানিয়ে খেত।

লক্ষ্ণৌ থেকে সব স্টাফ আসত। কদীরও সবুজ রঙের শাল গায়ে দিয়ে তিন-পাওয়ালা চেয়ারে নিজের বাড়ীতে আরামসে বসে থাকত। বাবুর্চীখানার সামনে কাঁঠাল গাছ। হুসৈনী বিবি রোজ ফল গুণত।

ফার্নিচার লাল কাপড় দিয়ে মোড়া মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা থাকত। সামনের বারান্দায় একটি রঙিন ছবি টাঙ্গানো থাকত—এক শিকারী কুকুর হরিণ তাড়া করছে। ড্রইংরুমের ঝাড় লণ্ঠনে দামী কাপড়ের ঝালর। প্রত্যেক কামরার কোণায় পেতলের বোল্‌জ স্ট্যাণ্ড, তার উপরে পানের গামলা রাখা হত। ডিনারের সময় টেবিল ইংরেজি কায়দায় সাজানো হত। ছুরি, কাঁটা, ফিংগার বোল, যার মধ্যে গোলাপ পাতা ভাসত। বেয়ারা সর্বদা শাদা ড্রেস পরে থাকত, বুকে রূপোর তকমা আঁটা, কোমরে পট্টি !

গরমকালে দুপুরবেলা যখন সারা বাড়ী ঘুমিয়ে যেত, কামাল চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে লিচু গাছের ঝোপে বসত। ঠাণ্ডা পরিবেশ। আলস্যে ভরপুর এক পরিবেশে ছড়িয়ে থাকত। দূরে দেবদারু গাছে একটা পাখি ডাকত।...'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।...আমি ঘুমিয়ে

ছিলাম।' বলা হয়, শিবালক ঘাটি ছাড়া এ পাখি আর কোথাও পাওয়া যায় না, দেখাও যায় না। পাহাড়ী চাকর বলত—ভগবান যখন বিশ্ব গড়েছিলেন, সমস্ত প্রাণীকে তার প্রয়োজনীয় অংগ দিচ্ছিলেন, সেই সময় এই পাখিটি ঘুমোচ্ছিল। তাই জন্ম জন্মান্তর ধরে পাখিটি কাঁদছে। তার ডাক শোনো, পরিষ্কার বুঝতে পারবে—"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম!" সরদারণীজী বারান্দায় খালি পায় চলাফেরা করছিলেন। তিনি সজোরে প্যানট্রির দরজা বন্ধ করলেন।

কামাল চমকে '৩৫ সালের দেরাহুন থেকে '৫৬ সালের দেরাহুনে ফিরে এল।

পকেট থেকে চাবি বের করে সে গুদামের দরজা খুলল। ভেতরে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে আলমারীর দরজা খুলল—বন্ধ করল। সিন্দুকে উঁকি মারল। সে বুঝে উঠতে পারছে না, এ সব জিনিস নিয়ে সে কি করবে। গুদাম ঘরে ঠাসা জিনিস—মানুষ একে সম্পত্তি বলে। 'গুলফিসাঁ' ও কল্যাণপুরের হাবেলীতে আরও এরকম তথাকথিত সম্পত্তি আছে। কামরার মধ্যে ছোট্ট একটি দ্বীপের মত খালি জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে সে ভাবল—এই সম্পত্তির জন্য মানুষ প্রাণ দেয়। এই সম্পত্তি একটি মৃগতৃষ্ণিকা।

আজ সে বুঝতে পারছে, লোকেরা সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে যায় কেন।

উবু হয়ে-বসে সে কাগজপত্রের সিন্দুক খুলল। ঠাসা পত্রপত্রিকার কাগজপত্র, ছবি ইত্যাদি। সে চিঠিপত্রের পুরোনো একটা চিঠি তুলে নিল। খামের ওপর অদ্ভুত মোহর—পাটনা, ১৯৩৩; বিলাসপুর, ৯২৮; ভূপাল, ১৯৩৭। কে জানে, চিঠিতে কি লেখা আছে! কারা এই চিঠি লিখেছিল, এখন তারা কোথায় এবং এখন কি করছে! উদাহরণস্বরূপ রাসবিহারীলালের চিঠি, ১৯৩৪ সালে পিলভিত থেকে এসেছিল এবং চিঠি শুদ্ধ উর্দুতে লেখা। ভদ্রলোক কে? তাছাড়া 'শিবনন্দন পাণ্ডে, রাণীখেত, ও মোহম্মদ আহমদ অব্বাসী মুনসেফ. জেলা গোণ্ডা।' সে মেঝেতে বাবু হয়ে বসে পড়ল। চিঠিপত্রের

সুটকেশ আবার আলমারীতে রেখে দিল। কার্নীনের নীচে অনেক পুরোনো ফাইল। মোকদ্দমা, জমি ও বাড়ীর কাগজ খালা চুন্নীতে গম ও মীর মুগীর ছাড়াছাড়ির কাগজপত্র। তাছাড়া প্রায় হলদে হয়ে যাওয়া সচিত্র অবধের ইতিহাস। প্রথম পাতায় হিজ হাইনেস দি অনারেবল স্যার মহারাজা দিগ্‌বিজয় সিং বাহাদুর কে. সি. এস. আই., বলরামপুর ও তুলসীপুরের ছবি এবং চোস্ত উর্দুতে তাঁরই লেখা বাইরের ভূমিকা—

"কাহিনী এই যে এই সমস্ত নির্মম কথায় আহত হয়ে তিনি ভাবলেন, এই সব কথার পরিণাম কি হবে। অতএব তাঁর শুভেচ্ছা-কামীদের সঙ্গে নিয়ে, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে সিংহাসনে বসলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধুদের তিনি মার্গদর্শক হলেন। জনাবে আলী ভাবলেন তাঁর দুর্ণাম দূর হবে। অতএব আলী ইব্রাহিমকে বড় নবাবের তরফ থেকে বলে পাঠালেন যে আমি বাদশাহের হুকুম মত…।"

কামাল অন্য পাতা উল্টাল—

"তারপর গর্বিত ইংরেজ সাহেব বুঝলেন, হিন্দুস্থান প্রদেশের বিজয় তো সেইদিনই হয়ে গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সত্য কি, জানতে পারা গেছে। অতএব এই মন্ত্রীত্বের সিঁড়িতে দৃঢ়ভাবে বসে থাকা উচিত। তারপর রাজত্ব জয় করা সহজ হয়ে যাবে। হঠাৎ কারুর বাড়ীতে যাওয়া উচিত নয়। একযুগ কেটে গেলেও নয়। এখন সেই যুগের সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। দেশের ঐক্য নষ্ট হয়েছে। মনে হয় ভারতের সমস্ত প্রদীপ নিভে গেছে।"

"মির্জা উজীর আলী খাঁর মৃত্যুর পর জুন ১৮১৬ সালে কলকাতার কাশীবাগে যেখানে টিপু সুলতানের ছেলেকে কবর দেওয়া হয়েছে, তাঁকেও কবর দেওয়া হল। শহরের কিছু গরীবলোক তাঁকে তখনও হিন্দের উজীর ভেবে তাঁর সঙ্গে ছিল। শহরের কিছু কিছু অংশে লোক তাঁর বন্ধুত্ব ও উদারতা স্মরণ করে তাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদত। সাহেব হুকুম দিলেন—গোরারা লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। কফিন বাক্সের উপর গোরাদের পাহারা। সেই সময় লক্ষ্ণৌর রেজিডেণ্ট জন লিম্‌সডেন সাহেব, বেনারসে জন চেরী

সাহেব এবং নায়েব তফজল হুসেন খাঁ ছিলেন।"

"শাহজাদা মির্জা মুজ্‌ফফর বখ্‌ত, যিনি মির্জা সুলেমান শিকোহের সুপুত্র একবার নিজের উচ্চাশা ও সাংসারিক লোভে পড়ে লক্ষ্ণৌর বাইরে বেরোলেন। লক্ষ্ণৌর যাদের অবস্থা ভালো ছিল না তারা তাঁর সঙ্গে বেরোলো। তখন লক্ষ্ণৌর সেলী বেগম জেনারেল মার্টিনকে বিয়ে করল। তাঁরই পেনশনে তাঁর দিন চলত। গোরী বিবির মারা যাবার পর তাঁরই বাড়ীতে থাকতেন।"

কর্ণেল ডিবুআ সাহেব এবং ফ্রেল সাহেব এবং মৌলভী মোহম্মদ ইসমাইলের লণ্ডন যাওয়া এবং চতুর্থ জর্জের প্রতিনিধিত্ব করা।"

আর পড়া যায় না। অর্থ উদ্ধার করাও মুশকিল। অসংলগ্ন লেখা। একটা টুকরিতে বইটি ফেলে দিল। তার হাতে ধুলো। অনেকক্ষণ সে হাত পরিষ্কার করল না।

'কোথাও যাবে না—এখান থেকে এই জিনিসপত্র কোথাও নিয়ে যাব না। সরকার এ সব নিয়ে নিক।' সে মনে মনে বলল। কামরায় একধারে কুড়ি বছরের পুরোনো গ্রুপ ফটো। স্বর্গীয় বড় আব্বা, ফুলের হার পরে মধ্যিখানে বসে আছেন। কোনো জেলা থেকে বিদায় নেবার সময় ছবিটি তোলা হয়েছে। অনেক ডেপুটি কালেক্টর ও উকিল বসে আছেন। পেছনে বড়-বড় দরজাওয়ালা বারান্দা। সক্সেনা সাহেব, রিজবী সাহেব, ঠাকুর রামনারায়ণ সাহেব, মসুদুল হুসেন সাহেব—এঁরা কত ভাল, সহজ লোক। জীবনে এঁরা কোনো দিন চোরা কারবার করেন নি। ফ্রড, জালিয়াতি ইত্যাদির ধারে-কাছেও যান নি। এঁরা সত্যিই বোকা ছিলেন। আজকালকার যুগে জন্ম নিলে এঁদের না খেতে পেয়ে মরতে হত। এঁদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ নেশা ছিল—কবি সম্মেলন, মোকদ্দমা, বাজী, শিকার, গানের আসর। কত শান্ত ও মধুর জীবন কাটিয়ে গেছেন এঁরা। এদের বিশেষ-বিশেষ ইয়ার্কি কামালের মনে পড়ছে—রিজবী সাহেব গোলাপ জাম সহ্য করতে পারতেন না। সকলে প্রায়ই তাঁর সামনে গোলাপ জামের ঠোঙা রাখতেন। তিনি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিতেন। ঠাকুর সাহেবের ভুঁড়ি নিয়ে প্রায়ই আর সকলে রসিকতা

করতেন। মিরাটের নৌচন্দী যাবার আয়োজন করা হত। ছড়ির মেলের গল্প জমতো। শ্যালক—ভগ্নিপতিরা একে অপরকে নিয়ে খুনসুটি করত। কতো শান্ত সমাজ ছিল এঁদের। কামাল মুগ্ধ হয়ে ছবি দেখছে। আমরা আমাদের জেনারেশনকে এঁদের চেয়ে কেন শ্রেষ্ঠ মনে করি? হে বৃদ্ধগণ···তোমাদের সামনে লজ্জায় আমার মাথা নত। আমি আমার মুখ তোমাদের দেখাতে চাই না। আমি আমার চেহারা ঢেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি! সে গ্রুপ ফটোটিকে গুদামে ফেলে তালা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

দেবদারু গাছে পাখিটি সমানে ডেকে চলেছে—'আমি ঘুমিয়েছিলাম।' 'আরে ঘুমিয়েছিলে তো কি হয়েছে?' কামাল বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল। জেগে থাকলেও প্রজাপতি আমাকে কি সুখ দিত। কিন্তু বিমর্ষ অনুভূতি থেকেই মহান অনুভূতির জন্ম। আর আমি জিজ্ঞেস করি, আপনারা কি এমন মহান লোক মশাই?—কামাল রজা ও ত্রিশূল এশ্‌লে ও গৌতম নীলাম্বর!—তাহলে এত চেঁচাচ্ছেন কেন?

দিল্লী স্টেশনে জামাইবাবু তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সে তার সঙ্গে বেলা রোডে এল। লাজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই সে তাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। "কম্মন, যেওনা। আমাদের ছেড়ে যেও না। নির্মল স্বর্গে। শংকর সব সময় বাইরে থাকে—তুমিও পাকিস্থান চলে গেলে··· !" কাঁদতে কাঁদতে লাজবতীর কথা বন্ধ হয়ে আসছে।

সে কথা বলতে পারল না। "কাঁদছ কেন!" সে আস্তে আস্তে বলল—"কেঁদ না লাজ।"

তার ট্রেন সন্ধোবেলা অমৃতসর যায়। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি লাজবতীর কাছ থেকে সরে যেতে চায়। খাবার খেয়ে সে জামাইবাবুর সঙ্গে নয়াদিল্লী যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

"আরে। গৌতমকে ফোন কর। গৌতম চণ্ডীগড় গিয়েছিল, সম্ভবত আজকে ফিরেছে।" জামাইবাবু বলল।

কামাল অনিচ্ছায় টেলিফোন ডাইরেক্টরী হাতে নিল। পাতা

উল্টাল। নরুলা, হরিশ্চন্দ্র ; নারায়ণ, এমজে, নীলাম্বর, গৌতম। সে নম্বর ডায়েল করল।

"হ্যালো গৌতম—তুমি এখানে ? গর্দভ কোথাকার !" যথাসম্ভব আবেগভরা কণ্ঠে সে বলল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—আজ সকালেই দেরাদুন থেকে—। হ্যাঁ ঢাকা থেকে আসছি। লক্ষ্ণৌ ? হ্যাঁ, আম্মী তোমাকে দোয়া পাঠিয়েছেন ! সব খবর ভাল। সবাই ভাল আছে, আমাকে ছেড়ে। কি বললে, আমি ? কিছু না আমি বলছিলাম, বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছি। সব বিস্তারিতভাবে বলব ? কদীর ও কমরুণ ? তোমার এখনো কি তাদের মনে আছে ? আমার স্মৃতি-শক্তি প্রখর। মাশা আল্লা—কদীর অনেকদিন আগে মির্জাপুর চলে গেছে। মোটর গাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। কেন বিক্রী হয়েছে ? আরে ভাই, এখানে জীবনটাই বিক্রী হয়ে গেছে আর তুমি মোটর গাড়ীর কথা বলছ ! তুমি বিক্রী হওনি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ —। আমি নিজের কথা বলছিলাম। আমি নিজেকে বিক্রী করে দিয়েছি। ভাল দাম পেয়েছি।"

"আর কার কার খবর জানতে চাও ? ছুটকি, রামদইয়া ? হায় আল্লা ! এখনো ছুটকিকে মনে আছে ? সে বেচারী এই সংসার ত্যাগ করেছে। কি করে ? বর্ষায় গুলফিশাঁ'র বাগানে কাজ করছিল, সাপে কামড়েছে। হ্যাঁ, সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার। গঙ্গাদীন আজকাল মধ্যপ্রদেশে কোথাও ট্রাক্টর চালাচ্ছে। আম্মী বলছিলেন, সে এফ. এ. পাশ করেছে। হ্যাঁ—সত্যিই সে উন্নতি করেছে—আমি গঙ্গাদীনের কেরিয়ারের কথা শুনে খুশী হয়েছি—আরও কথা বলি ? না, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। আমার সময় নেই। তোমার কনফারেন্স তিনটের সময় শেষ হবে। তারপর তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করবে—আল্লসে ?—কি করবে অপেক্ষা করে ! না, আমি কাস্টোডিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। 'পি' ব্লক—তারপর আচ্ছা দেখ, পৌঁছবার চেষ্টা করব—কিন্তু আমার জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবে না—আচ্ছা—সো লং।"

কামাল ফোন রাখল। লাজবন্তী দরজায় দাঁড়িয়ে ; "আচ্ছা,

আমি আসি।"

"তাড়াতাড়ি এস।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ।"

"তোমার জলখাবার কি করব?"

"সেই সব, যা প্রায়ই বানাতে আমার জন্য।" সে একটু বিরক্ত হয়ে বলল। "তুমি আমার বোন। আমাকে মায়ামমতা দিয়ে আগলে রাখতে চাও। আমি কিন্তু দুর্বল হব না। আমার পাও টলবে না। আমি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। তোমার স্নেহের জালে আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি আজ। আমি এখন শান্ত, অচঞ্চল।"—সে মনে মনে বলল।

যমুনা রোডের পাশ দিয়ে কামাল এগিয়ে গেল। কনট প্লেস পৌঁছে সে অপরিচিতের মত ঘুরে বেড়াল। মোটর গাড়ী, সমৃদ্ধ সন্তুষ্ট মানুষ, ব্যস্ত কারবারি, ঝকঝকে দোকান—এসব দেখে সে ভয় পেল। তার মনে পড়ল, সিভিল লাইন গিয়ে থানায় খবর দিতে হবে সে হিন্দুস্থান ত্যাগ করছে।

ভাদ্র মাসের প্রখর রোদ। সে খুবই ক্লান্ত। ইচ্ছে করছিল যে কোনো উপায়ে তাড়াতাড়ি করাচি পৌঁছে যায়। কামাল স্থির করেছে, আর কখনো হিন্দুস্থানে আসবে না।

"দেখ, কে আসছে?" সে ডক্টর হেন্স ক্রীমারকে দেখে কপট উল্লাসে মনে মনে বলল। তার ভালও লাগল—পর্বত সমান এই দুপুর তাঁর সাহায্যে কোনোক্রমে কেটে যাবে।

"হ্যালো, হ্যালো, মাইডিয়ার বয়।" ডক্টর ক্রীমার হাত বাড়িয়ে বললেন,—"কি আশ্চর্য যোগাযোগ! তাঁর সঙ্গে সূচনা বিভাগের একটি মেয়ে। সে গম্ভীর ভাবে কামালকে অভিবাদন জানাল। "আমি ডক্টরকে রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ামে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার যদি কাজ না থাকে, আপনিও চলুন। তার নাম সম্ভবত কুমারী অরুণা বাজপেয়ী। কামাল চোখ বন্ধ করল। আজ যদি নির্মলা বেঁচে থাকত—ঠিক এইভাবে কাজে ব্যস্ত থাকত।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

ব্রডকাষ্টিং হাউস থেকে আরও দুজন ইউরোপীয়ান বুদ্ধিজীবী তাদের সঙ্গ নিল। তারা রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে চলেছে। কিছুদিন আগেও কামালের জগৎ আর ডক্টর হেন্স ক্রীমারের জগৎ এক ছিল। তাঁর আউটলুকও জীবনের চেয়ে বড়। কামালের মত তিনিও সংসারের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে রহস্যের সন্ধান পেতেন। তাঁর কাছেও জ্ঞান ও বিবেক এক অমূল্য সম্পদ। বুদ্ধ জয়ন্তীর জন্য তারা ভারতে এসেছিলেন এবং শ্রীনগরে একটি হাউস বোট ভাড়া করে সেখানে ভারতীয় মূর্তি কলা বিষয়ক একটা বই লিখছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভারতীয় ও বিদেশী বুদ্ধিজীবীরা যেতেন। তিনি মেঝেতে কুশন ও চাটাই পেতে অতিথিদের জন্য সবুজ চা তৈরী করতেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ডক্টর হেন্স ক্রীমার সোনার সিংহের নীচে লেখা "সত্যমেব জয়তে" পড়লেন। 'সত্যের জয় হবে' কামালের জন্য তিনি অনুবাদ করলেন তারপর কুমারী অরুণাকে পথ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতরে ঢুকলেন। ভূতপূর্ব ভাইসরয়ের প্রাসাদ বাইরের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা। প্রাচীন কালের ও মধ্যযুগের মূর্তিটি জ্যোতিহীন চোখ মেলে কামালকে দেখতে শুরু করল। প্রত্যেকটি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর ফরাসী অথবা জার্মাণী ভাষায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। এক জায়গায় মহাত্মা বুদ্ধের এক অতি চমৎকার প্রাচীন মূর্তি – জলপ্রপাতের মত মখমলী পর্দার পৃষ্ঠভূমিতে তিনি দাঁড়িয়ে। কামাল তখতার সিঁড়ির উপরে বসে পড়ল।

"এটা তো অস্থায়ী মিউজিয়াম।" তার কাছে এসে কুমারী অরুণা ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে বলল "আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয়, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয় তৈরী হচ্ছে!"

"নিশ্চয়!" কামালের উত্তর। ঠিক এক বছর আগে সে এই দিল্লীতে টমের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছিল—

"আসুন, এদিকে আসুন। আপনারা আমাদের মহেনজোদড়োর প্রাচীন সভ্যতার ড্যানসিং গার্ল দেখেছেন?"

কুমারী অরুণা তাকে শ্বেত পাথরের গ্যালারির আশে-পাশে ঘোরাল—চনহোদড়ো, মহেনজোদড়ো, সাতের ঘাটি, হরপ্পা, তক্ষশিলা, রোপড়—"এখন আমরা ক্রমশঃ আধুনিক যুগের কাছাকাছি আসছি।" এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে বলল—

"এই পাথর দেখুন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দেরাদুনে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিলা তারই প্রতীক। এটা আইছলের মূর্তি।" সে ঘুরে ঘুরে হেন্স ক্রীমারকেও বলল। চলতে চলতে তারা একটি মেয়ের মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল। এই বছর শ্রাবস্তীর মাটি খুঁড়ে এটা পাওয়া গেছে।" মেয়েটি কদম গাছের ডালে একটি হাত রেখে, গাছে হেলান দিয়ে আছে। "লাল মাটির এই মূর্তি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তৈরী করা হয়েছিল।" ডক্টর হেন্স ক্রীমার নিজের পাণ্ডুলিপি বার করে আর্কিয়োলজিস্টের মত বলল।

তারা মেঝেতে মূর্তির সামনে বসে পড়ল। প্রতিমাটির মধ্যে অদ্ভুত এক আকর্ষণ—জীবনের স্পন্দন, উত্তাপ ও অরুণিমা। কল্পনা নয়, মনে হয় সাক্ষাৎ জীবন, ধরিত্রীর আপন সৃষ্টি।

তার হাত দুটি শক্তিশালী, চোখ দুটি বড়-বড়, শরীর দৃঢ় ও সুন্দর। আকৃতি এবং আকার কমনীয়তা ও অনুভূতির অপূর্ব সংমিশ্রণ। "এক রোমঞ্চ সৌন্দর্য পাথরে চিন্ময় হয়েছে। সুন্দরও ভয়ানক।" মোসিও রাবল ডাবলিউ বি. ইয়েট্‌সের ভঙ্গীতে বলল।

"মূর্তিকলার মৌলিক চিন্তাধারার সূত্রপাত এখান থেকেই।" ডক্টর ক্রীমার বললেন, "এটি মথুরার চেয়েও আগের শিল্প। এখন এই শিল্পের অনেক প্রচলিত থিওরী আমাদের পাল্টাতে হবে।"

"সেই যুগের শিল্পীদের প্রধান সমস্যা ছিল, বিচার শুধু সংকেতের সাহায্যে দর্শকের সামনে পৌঁছান যায় কিনা? বেদান্ত যুগের পর, এই দৃষ্টিকোণই সম্ভবত মূর্তি পুজোর প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হয়েছে।" অরুণা নিজের মতামত ব্যক্ত করল।

রূপ ও অরূপ, ভাব ও অভাব সম্বন্ধে সে যা কিছু জানে, এখন কাকে বলবে? তার কাছে এই জ্ঞানের আর কোনো মূল্য নেই—

কামাল ভাবল। এই আশ্চর্য সুন্দর মূর্তির জন্য তার কাছে কোনো অভিব্যক্তি নেই।

"বেদান্ত বলে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সম্বন্ধী প্রয়োগ তটস্থ আনন্দ।" মোসিও রাবল বলল।" বিদ্যুতের মত অখণ্ড। তার বিভাজন অসম্ভব। সে স্বয়ং প্রকট—অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান। যে ভাবে শিল্পীর কল্পনা বিশ্বকর্মার কল্পনায় লুকোনো আছে, সেইভাবে, আত্মা নিজের মধ্যে উপস্থিত। সে সব সময় দেখতে পায় তার নিজের স্বরূপ। বিশ্বরূপ রূপং রূপং প্রতিরূপ। বেদান্তের এই ব্যাখ্যা তুমি স্বীকার কর? এই মূর্তি তোমার ভাল লাগে না, তুমি মথুরা স্টাইল পছন্দ কর?" মোসিও রাবল ঘুরে কামালকে জিজ্ঞেস করল।

" 'বুভুক্ষিতং না প্রতিভাতি কিঞ্চিত্' সৌন্দর্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের এই চুলচেরা আলোচনা আমার সাধ্যের বাইরে!" কামাল উত্তর দিল। তার উদাস স্বরে অস্বাভাবিক কটূক্তি। সবাই চমকে উঠল।

"এ কমিউনিস্ট।" ডক্টর স্টাবর্ট বললেন।

"এর ফ্রস্টেশনের কারণ কি?"—কুমারী অরুণা ভাবল। অরুণা আমেরিকা থেকে মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়েছে। সে চোখ তুলে কামালকে দেখল ও ভাবল—শিক্ষিত ছেলে, দেখতে কত সুন্দর!'

"আপনি সংস্কৃত পড়েছেন?" অরুণার সপ্রশংস প্রশ্ন।

"এককালে একটু পড়েছিলাম।" কামালের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সে ঘড়ি দেখল। কাস্টোডিয়ানের সঙ্গে দেখা করবার সময় হয়ে এল।

কামাল মূর্তির ছোট্ট উঠোনে হাত রেখে উঠে দাঁড়াল। শীতল পাথর—পাথর যা টাইমলেস ভ্যাকুমের প্রতীক। বর্তমানের প্রবাহ এত তীব্র যে পাতা চিরদিন বয়ে এসেছে—এখন কাদায় আটকে পড়েছে। সে ভাবল। তাই তো আমি বলি, একটা কোদাল নিয়ে এই পাতা, এই জঞ্জাল সাফ কর। আজকাল আমি ধোলাইয়ের কাজে ব্যস্ত। মস্তিষ্কের, হৃদয়ের, বুদ্ধির স্প্রিং ক্লীনিং। এই অতীতের সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছি। সে সেই

ইউরোপিয়ান বিশেষজ্ঞদের বোঝাতে চাইল। তারপর সে মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল, "অতএব হে শ্রাবস্তীর সুন্দর যক্ষিণী!' যে তোমাকে গড়েছিল, সেই মূর্তিকার নিজের বাণী আমার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। তোমার স্রষ্টা আমার সঙ্গে আর কমিউনিকেট করতে পারবে না। রূপ ও অরূপের বিতর্কে আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই না। এই রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয় এবং আমার অতীত, এবং সারা ভারতবর্ষ। আমি কুমারী অরুণাকে সমর্পণ করলাম।"

সে গ্যালারি পেরিয়ে এগিয়ে গেল। তার কানে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কথা ভাসছে—

"হায়! আমরা যদি সেই মূর্তিকারের নাম জানতে পারতাম, যে এই মূর্তি গড়েছিল। কিন্তু এই বিচিত্র দেশে ইতিহাসের কোনো স্থান নেই!" ডক্টর ক্রীমার বলছিলেন—"ঘটনার কোনো গুরুত্ব নেই। যথার্থ কিম্বদন্তী। সময়ের ফারাক অর্থহীন। মুহূর্ত শাশ্বত। নামহীন মানুষ। তার রচনা, কর্ম, সৃষ্টি ও সাহিত্যের এই অনন্ত সাগরে কোনো পৃথক স্থান নেই।

"হ্যাঁ।" মুসিও রাবল বলল—"মানুষ মরলে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কেননা তার কোনো ঐতিহাসিক অর্থ নেই।"

"কোনো সংকট ভারতীয় বিবেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কেননা সংকট, মহাকালের গর্ভে, সংকট ইতিহাস নয়। ভূত, ভবিষ্যত, বিনাশ, অবিনশ্বরতা—কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। অতএব এই শরীর পুড়িয়ে দাও কেননা মৃত্যুর পর, শরীর বর্তমানের মধ্যে থাকে না।" ডক্টর স্টাবট বলল।

"তাই পূবদেশের শিল্পীরা নিজের সৃষ্টির উপর নাম অঙ্কিত করার কথা কখনো ভাবেনি। হায়! হায়! আমরা যদি এই শিল্পীদের বিষয়ে কিছু জানতে পারতাম! "ডক্টর ক্রীমার চারিদিকে তাকিয়ে বলল—" এখানে অনেক মাইকেল এঞ্জেলো চুপচাপ, হাসতে হাসতে মারা গেছে। তারা তাদের নামও রেখে যায়নি, রেখে গেছে সৃষ্টি!"

কামাল গ্যালারির বাইরে বেরিয়ে এল।

"এই অনুভূতি যে আমরা স্বয়ংকাল।" মুসিও র‍্যাবল বলছিলেন।

"বিস্তারকেই অনুভব করা যায়। সময়কে কেবল ভাবা যায়।" ডক্টর ক্রীমার বলছিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে কামাল লাল সুর্কীর চওড়া পথ ধরে "পি" ব্লকের দিকে এগিয়ে গেল।

কাস্টোডিয়ানের সঙ্গে কিছু সময় কাটাবার পর সে গৌতম নীলাম্বরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য 'আল্লস্' গেল না। সোজা লাজের বাড়ী পৌঁছল। লাজকে বলল—"আমার ফোন এলে বলবে—আমি ফিরে আসিনি।" তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে স্টেশন যাবার সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল।

গৌতম 'আল্লসে' প্রায় এক ঘণ্টা কামালের জন্য অপেক্ষা করল। কয়েক যায়গায় ফোন করল। নিরাশ হয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল। বুদ্ধ জয়ন্তীর ব্যাপারে সরকার সক্রিয় হয়ে উঠেছে, প্রচার কাজ পুরোদমে চলছে। প্রায়ই রাত্রি পর্যন্ত তাকে অফিসে বসে থাকতে হয়। একটা দরকারী ফাইলের জন্য সে নিজের নাম্বার টু—কুমারী অরুণা বাজপেয়ীকে ফোন করল। জানতে পারল সে ডক্টর ক্রীমারকে নিয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে গেছে।

কামালের সঙ্গে দেখা না হবার জন্য সে প্রচণ্ড রেগেছে। এই দেশ, নিজের ওপর ও কামালের ওপর সে প্রচণ্ড বিরক্তি অনুভব করছে। যদি তার হাতে ক্ষমতা থাকত, ডক্টর ক্রীমার ও অরুণা বাজপেয়ী—দুজনকেই জাহান্নমে পাঠিয়ে দিত।

ফাইল অত্যন্ত জরুরী। বিভাগীয় জয়েণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় দেখতে চান। সে মোটরে বসে রাষ্ট্রপতি ভবন পৌঁছল। মিউজিয়ামে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলনা। অন্যমনস্কভাবে সে ঘুরে বেড়াল।

একটি মূর্তির সামনে তথ্য ও বেতার বিভাগের কিছু প্যাম্ফলেট পড়ে আছে। ডক্টর ক্রীমার সম্ভবত ফেলে গেছেন। গৌতম প্যাম্ফলেট কুড়িয়ে নিল। তারপর আনমনাভাবে মূর্তিটিকে দেখল—'শ্রাবস্তীর সুদর্শনা যক্ষিণী।'

সে দেখতে কেমন ছিল? সে ভাবল। তারপর সরোষে শ্বেত

পাথরের মেঝেতে পা ঠুকে সে বলল—"তুমি কি মনে কর নিজেকে? আমার কাছে তোমার কোনো মূল্য নেই। তোমার চেহারা আমি ভুলতে বসেছি। চেহারা শুধু ম্যাটার। আমার হৃদয়ে যে রূপ আঁকা আছে, তার মহত্ত্ব কেবল বিশ্বকর্মা বুঝতে পারবে।"

শ্রাবস্তীর মাটি খুঁড়ে পাওয়া সেই যক্ষিণীর মূর্তি। কদম গাছের ডালে একটি হাত রেখে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বড় বড় চোখ দুটি প্রসারিত করে তাকে দেখছে। গৌতম কাছে গিয়ে তার শরীর স্পর্শ করল।

"আর্কাইকের ভাল একটি উদাহরণ!"—সে মনে মনে বলল। সংস্কৃতি প্রচার পত্রিকায় এই নতুন আবিষ্কার নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা উচিত। কর্তব্যপরায়ণ প্রচার বিশেষজ্ঞের মত সে ভাবল—তারপর বাইরে বেরিয়ে এল।

ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। লাজ ও জামাইবাবুকে খোদাহাফিজ বলে সে গাড়ীতে উঠে বসল। ট্রেন ধীরে ধীরে স্টেশন ছাড়ছে। যমুনার পুল, লালকেল্লা, বাজার, পথ, বাড়ী—সে জানালার ধারে বসে দেখছে—সে চলেছে, একটা দেশ ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে।

জীবন যেমন চলছিল, তেমনই চলবে—একটা লোক চলে গেলেইবা কি! তাছাড়া এদের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক রইল না। এরা ভিন্ন পথের পথিক, কামাল ভিন্ন পথের পথিক। এদের কোনো দুঃখ, কোনো বেদনা, কোনো আনন্দের অংশীদার কামাল হতে পারেনা। এরা কোনোদিন কামালের অনুপস্থিতি অনুভব করবে না।

ট্রেন এখন ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেছে। "প্রত্যেক যাত্রার গুরুত্ব আছে। আমাদের এদিক থেকে ওদিক যাওয়া।"—একবার গৌতম বলেছিল। তখন তলঅতের ভাষায় সে খলিল জিব্রানের অলমুস্তফার মত করে কথা বলত।

ভারতের সিম্বল, যাত্রা—চলতে হবে, চলতে হবে।

সম্ভবত স্পেংগলর লিখেছে।

সে রাধাকৃষ্ণণের বই হাতে নিল।

"ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কেউ কাউকে হুকুম দেয়না—এ কাজ করতেই হবে, সে কাজ করা তোমার কর্তব্য! এখানে মানুষ আপন কর্মের স্বাধীন কর্তা।"

জানালার বাইরে সে বই ফেলে দিল। তারপর শুয়ে পড়ল।

পাঞ্জাবের স্টেশন ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে—আম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর। প্রাচীরে উর্দু সিনেমার বিজ্ঞাপন। প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে শিখ মহিলাদের রঙিন শালোয়ার রাতের আলোয় ঝলমল করছে।

ভোর হয়ে এল। ট্রেন অমৃতসরের কাছে। যায়গায়-যায়গায় মুসলমান পীরের কবর। শিখ মহিলারা মাঠের মাঝে সরু পথ ধরে চলেছে। শিখ কৃষক মাঠে কাজ করছে। জায়গায় জায়গায় এখনো পোড়া বাড়ী। দাঙ্গার সময় মানুষই এই সব ঘরে আগুন লাগিয়েছে। অমৃতসর প্ল্যাটফর্মে গরীব বোরখাপরা বৃদ্ধা, লাইন বেঁধে ভিসার জন্য অপেক্ষা করছে।

ট্রেন চলল। ট্রেনের দু'দিক দিয়ে সিপাহী চড়ল। হঠাৎ অন্য দেশ শুরু হল। দু'জন সরদারজী পাহারা দিচ্ছে।

আমি এখন পাকিস্থানে। হিন্দুস্থান থেকে এসেছি। উদ্বাস্তু··· উত্তর প্রদেশের মুসলমান···আশ্রয় খুঁজছি।

ট্রেন যখন বর্ডার ক্রস করল, তখন এতদিন ধরে সঞ্চিত অশ্রুধারার বাঁধ যেন ভেঙে পড়ল। একটা থামের কাছে এক সরদারজী দাঁত বের করে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখ ছাপিয়ে চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কামাল নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল, পারল না। অসহায় শিশুর মত সে কাঁদছে। কোথায় ছিল এতদিন এই অশ্রুধারা! কিছুক্ষণ পরে সে বুঝতে পারল, তার সহযাত্রী তাকে দেখছে। লোকটি পাকিস্থানী বর্ডার পুলিশের অফিসার। অমৃতসর থেকে লাহোর ফিরে যাচ্ছে।

কামাল লজ্জা পেল। তার মনে হল পাকিস্থানী পুলিশ অফিসার তাকে বলছে—তুমি এখনো দুই পরস্পর বিরোধী দেশপ্রেমের যন্ত্রণায় ভুগছ। তুমি সত্যিই নীচ ব্যক্তি।

সে অনুভব করল, যেন সকলের দৃষ্টি তারই দিকে—তুমি হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানী স্পাই!

ট্রেনের চাকা যেন বলছে স্পাই দেশদ্রোহী, স্পাই দেশদ্রোহী…

চমকে সে চোখ খুলল। ট্রেন লাহোর স্টেশনের কাস্টম বিভাগের দিকে ধীরে ধীরে চলেছে। তার বুক কাঁপছে।

লাহোর থেকে সে প্লেনে করাচী রওনা হল।

এখন তার সামনে নতুন জীবন। সে ডায়ের বের করল। করাচী পৌঁছে তাকে অনেক জরুরী কাজ করতে হবে। কুঠির জন্য ব্ল্যাকে সীমেণ্ট ও লোহার ব্যবস্থা করতে হবে। মিস্টার এক্সকে জিমখানায় একটা পার্টি দিতে হবে। বল আমি কোথায় যাই! সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল। খারাপ পতনশীল সমাজে মানুষ কতক্ষণ সৎ থাকতে পারে? সে এয়ার হোস্টেসকে আরেকবার কফি দিতে বলল এবং 'ডন' পেপার তুলে পড়তে লাগল।

"পাকিস্থান মন্ত্রীসভার সংকট—প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ—নতুন প্রধান মন্ত্রীর জাহাঙ্গীর পার্কে ভাষণ।"

জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকাল। আকাশে মেঘ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ষা আসছে।

জানালার পর্দা ঠিক করল।

আমিই শব, আমিই আমার কবর খুঁজছি, এবং আমিই আমার জন্য কাঁদব। সে মনে-মনে বলল। সীটের বালিশ মাথার নীচে রেখে চোখ বন্ধ করল।

আটান্ন

কাঁচা পথে ছেলেটি গরুর গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। একটা স্টেশন ওয়াগান ধুলো উড়াতে-উড়াতে চলে গেল। সামনে একটা গরুর গাড়ী এদিকেই আসছে। গাড়োয়ান বলদের ল্যাজে মোড়া দিয়ে

মোটর ড্রাইভারকে বলল—"পথ দেখে মোটর চালাতে পার না! আমার বলদ যদি ভড়কে যেত!" আমেরিকান সাংবাদিক তক্ষুনি ক্যামেরা বের করে একটা ছবি তুলল। পেছনে-পেছনে আর একটা মোটর আসছে। সেই মোটরে শ্রীমতি রাজেবাড়া ও লেডী কমলেশ বর্মা।

শ্রাবস্তী এখনো অনেক দূরে। সূর্য মেঘের আড়ালে। মাথার উপর বর্ষা। মোসিও রাবল অরুণা বাজপেয়ীকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল। তৎক্ষণাৎ তথ্য ও বেতার বিভাগের এক বাণ্ডিল পুস্তিকা তার হাতে রেখে নিটিং নিয়ে বসল। তৃতীয় মোটরে লংকা ও সিলোনের কিছু ভিক্ষু। তাদের সঙ্গেই ফিল্ম ডিভিসনের ক্যামেরা-ম্যান। দু'তিনটি কৃষক মেয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে এই ক্যারাভান দেখছে। গৌতম নীলাম্বর এতক্ষণ মোটর ড্রাইভ করছিল। সে অরুণা বাজপেয়ীকে বলল—"তুমি যদি আমার স্থান নাও তাহলে আমি এখান থেকে হেঁটে নিজের বাড়ী ঘুরে আসতে পারি।

"খুব বোর হয়ে গেছ?" কুমারী অরুণার প্রশ্ন। সে নিজেই ক্লান্ত। ঘুম আসছে।

হ্যাঁ, আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে, সর্টকাট পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। স্নান করে একটু বিশ্রাম করব। কাল সকাল থেকে আবার সেই একই কাহিনী শুরু হবে। মুসিও রাবল আপনি যদি অনুমতি দেন···।" ফরাসী লেখককে সে বলল।

মোটর থামিয়ে সে পথে নামল। একটার পর একটা মোটর ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। টপ্ করে বর্ষার এক ফোঁটা জল তার মাথা স্পর্শ করল। সে হাত মেলে হাওয়া শুঁকল এবং অড়হড়ের একটা ডাঁটা ভেঙ্গে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে গেল।

বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিকে যেন রিমঝিম। সে আমের এক ঝোপে আশ্রয় নিল। একটি গাছের নীচে, বসে অনেকক্ষণ ধরে হাওয়া ও পাতার সঙ্গীত শুনল। আধ ঘণ্টা পরে সে আবার চলতে শুরু করল। যতদূর দৃষ্টি যায়—সবুজ ক্ষেত হাওয়ায় দুলছে। শহর এখনো অনেক দূরে।

গৌতম নীলাম্বর চলতে চলতে পিছু ফিরে দেখল। বর্ষার জন্য পথে ধুলো কম, যদিও তার পায়ে কাদা। ঘাস ও গাছপালা জলে ভিজে সবুজ। কমলালেবুও লাল রঙের ফুল সবুজ ঘাসের মেলায় কুমকুমের মত ঝলমল করছে। হীরের টুকরোর মত জলবিন্দু সবুজ ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ছে। ঘাটে নৌকো বাঁধা। অশোক গাছের নীচে বসে কোনো মাঝি শ্রাবণ গীত গাইছে। আমের ঝোপে একলা এক ময়ূর পাখা মেলে দাঁড়িয়ে। নদীর অন্য ধারে জলজ ঘাস ও নীল ফুলের ডাল জলে নুয়ে পড়েছে। সারস ও ময়ুর উদাসভাবে দাঁড়িয়ে। কাঁধে গামছা নিয়ে চার-পাঁচজন গ্রামবাসী গ্রামের দিকে চলেছে।

বহরাইচের উপনগর শুরু হয়েছে। সিভিল লাইনের ছায়াঘন পথে পৌঁছে সে পিতার হলুদ রঙের দোতালা কুঠিতে ঢুকল।

পিতা স্যার দীপনারায়ণ লনে পায়চারি করছিলেন। "কি খবর পুত্র।" তিনি বললেন—"আমি ভেবেছিলাম তুমি বিদেশী অতিথিদের নিয়ে সোজা শ্রাবস্তী চলে যাবে।"

"না বাবা!" সে বলল। ভেতরে গিয়ে সে মাকে জড়িয়ে ধরল।

"দময়ন্তী পিসি কোথায়?" সে স্নানঘরে স্নান করতে করতে বলল।

"শহরে, তাঁর কাছে যেও।"

"যাব।"

"তুমি ভাল আছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বচ্চনের বিয়ে কবে হচ্ছে?"

"আগামী ফাল্গুন মাসে।" মা বললেন।

"প্রকাশ চাচা বাড়ী তুললেন?"

"না। খান বাহাদুর মোহম্মদ হোসেনকে মনে আছে? রিটায়ার্ড জজ? তিনি পাকিস্থান চলে গেছেন। তাঁর বাড়ী নিলাম হচ্ছিল, প্রকাশ কিনে নিয়েছে। সস্তায় পেয়েছে।"

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে বসতে বসতে এরকমই দু-চারটে কথা হল। লেডী দীপনারায়ণ টুকরো-টুকরো কথা

বলছিলেন। পাকিস্থানের নাম শুনে সে অস্থির হয়ে উঠল। সে পাকিস্থানকে ভুলে থাকতে চায় যদিও শ্রাবস্তীর বিদেশী পর্যটকদের সে কাল কাশ্মীর সমস্যা বোঝাবে।

সে বিরক্ত হল। ঘাবড়েও গেল। নূতন দিল্লীতে কিছুদিন আগে সে যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল।

"আমি নদীর ধারে ঘুরে আসছি।" সে মাকে বলল।

"তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম করা উচিত।" মা চিন্তিতা।

সে বাবার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধার শান্ত। বৃষ্টি থেমেছে। হাওয়া বন্ধ। নদীর ধারে চণ্ডীদেবীর মন্দির। ভাঙ্গা মন্দিরের সিঁড়ির উপর সে বসল। এখানে বসে সে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। এই মুহূর্তে জীবনে প্রথমবার সে অনুভব করল—হায়! যদি নির্বাণ সম্ভব হত! ভয়, দুঃখ, ঘৃণা, পালিয়ে যাবার ইচ্ছে, বিস্তার ও কল্পনা···নির্বাণ, যা জীবন থেকে, মৃত্যু থেকে, নিদ্রা থেকে, প্রেম, দয়া ও অসম্বদ্ধতা পৃথক থেকে—তবু সত্য, বিলীনতা—শূন্য—শূন্য!

এই বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন, ভারতের আত্মার দুঃখ কি? একটা সিগারেট ধরিয়ে সে মন্দিরের মেঝেতে বসল। বর্ষাকাল। সাপ ও পোকা মাকড় নিশ্চয় আছে। তার মনে হল, জঙ্গলের সঙ্গে তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। সে এই গাছ, লতা, পাতা, ফুলের ছায়ায় বড় হয়েছে।

হঠাৎ সে পদধ্বনি ও হাসি শুনতে পেল।

"তুমি কে ভাই?" নীচ থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, "যে অন্ধকারে একলা বসে আছ?"

"আমি! গৌতম শুয়ে শুয়ে উত্তর দিল।

অন্য যুবক লাফিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। "তুমি পাগল না কি? চারিদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম। আম্মা-আব্বা বললেন, তুমি নদীর দিকে বেড়াতে বেড়িয়েছ।

"হ্যাঁ ভাই। দেখছ, কি রকম শান্ত পরিবেশ! পাতাও নড়ছে না। তোমার দিন কেমন কাটল?"

"বোর হয়ে গেলাম, মিয়াঁ।" হরিশংকর সিঁড়ির ওপর বসে বলল—" 'বুদ্ধ জয়ন্তী' এইভাবে চলতে থাকলে আমি গেছি! এই ঝামেলায় লক্ষ্ণৌ যেতে পারিনি। ব্যাঙ্গালোর থেকে জে. এস. এর তার পেয়েই দিল্লী চলে এসেছি। অরুণা বলছিল, যাত্রীরা এখন কপিলবাস্তু ও গয়া যেতে চায়। সারা পথে ডক্টর ক্রীমার আমাকে মহাযান ও হীনযানের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে এমন লম্বা-চওড়া লেকচার দিয়েছেন যে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। তোমার গাড়ীতে তো শুধু মুসিও রাবল ছিল।"

তারপর হঠাৎ সে চুপ করে গেল। নদীর বুকে সূর্যের অরুণিমা। দুজনেই উদাস।

"ভাই গৌতম!"

"হ্যাঁ।"

"কামাল আমাদের ধোকা দিয়ে গেল। "কিছুক্ষণ পর হরিশংকর আস্তে-আস্তে বলল।

"হ্যাঁ।"

"তুমি জান, শালা দিল্লী হয়ে গেছে! আমাকে খবর দিলে আমি নিজে তার সঙ্গে দেখা করতাম।"

"আমি তো তখন দিল্লীতেই ছিলাম তবুও সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।" গৌতম উদাসভাবে বলল।

তারপর তারা দুজনেই চুপ।

"কে জানে এখন সে কোথায়!" হরিশংকর বেদনাভরা কণ্ঠে বলল।

"করাচীতে, আর কোথায়!" গৌতম আস্তে করে বলল। কিছুক্ষণ পর সিঁড়ি বেয়ে তারা নদীর ধারে নেমে এল। চিরন্তন প্রবাহ বয়ে চলেছে। তারা দুজনেই সম্ভবত ভাবছে, অবুল মোনসুর কামালউদ্দীন কিভাবে হিন্দুস্থানে এসেছিল এবং কিভাবে হিন্দুস্থানের বাইরে বেরিয়ে গেল।

নদী বয়ে চলেছে। তারা দুজনে ঝুঁকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে। গৌতম একটা পাথর জলে ফেলল, বৃত্তাকার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর বুকে তাদের দুজনের অসংখ্য টুকরো-টুকরো প্রতিবিম্ব।

ঘাটের কিছু দূরে কমিউনিটি প্রোজেক্ট আলোয় ঝলমল করছে। লোকগীত মণ্ডল বার্ষিক ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালের জন্য প্র্যাকটিস শুরু করেছে। গানের সুর কখনো কখনো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এদিকে আসছে। দূর গ্রামের চৌপাশে মৌটংকী হচ্ছে। আমের ঝোপের বাইরে আল্‌হা-উদল গাওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস কমিটির অফিসে ইলেকসানের আয়োজন চলছে। কিছু দূরে সিভিল লাইনে ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীতে অতিথিরা ডিনার খাচ্ছে।

একটা উল্টো নৌকোর ওপর পা রেখে গৌতম চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর সে চোখ খুলল—নদীর ধারে সে একলা। কোনো কৃষকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হরিশংকর কমিউনিটি প্রোজেক্টের দিকে চলে গেছে। মেঘ যেন নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে।

সে নিজের ক্লান্ত পা দেখল। অন্ধকার দেখল। কিন্তু ভয় কি! সে ধরিত্রীর সঙ্গে একাত্ম, ধরিত্রী তার মা। মা কখনো সন্তানকে দূরে সরাতে পারে না। সে চলতে শুরু করল।

ভেজা ঘাসের আঘ্রাণ। শীতল পাথর ও শক্ত মাটি তার পায়ের নীচে। দুই বাহু প্রসারিত করে সে বায়ু স্পর্শ করল এবং বলল—"হে ধরিত্রী, তোমার পাহাড়, বরফে ঘেরা পর্বত ও জঙ্গল হাসছে! আমি তোমার বুকে দাঁড়িয়ে। আমি পরাজিত হইনি—আহত হইনি—আমি এখনো পরিপূর্ণ—আমাকে কেউ শেষ করতে পারেনি।"

নানা চারা গাছ ও ফুলের ভারে ঝুঁকে পড়া লতাপাতা তার পথে ছড়িয়ে আছে। পাখি তার সাথে-সাথে শিষ দিচ্ছে। শ্রাবণের বারিধারা পদ্মফুলের উপর জল তরঙ্গ বাজাচ্ছে।

সে একটা কুটিরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। সজল চোখে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখল। শস্যের ভারে নুয়ে পড়ছে। আরও···আরও শস্য চাই···হে ধানের শিষ, তোমার ফলন যেন অক্ষুণ্ণ থাকে··· আমাদের ভাণ্ডার যেন পূর্ণ থাকে! জল, ঝড়, বৃষ্টিকে তুচ্ছ করে তুমি ধরিত্রীর বুকে জন্ম নাও! সমুদ্রের মত অতল হও।···যারা তোমার সেবা করে তারাও অমর হোক! তোমার ভাণ্ডার কখনো যেন শেষ না হয়।

সে নদীর ধারে ধারে চলেছে। আকাশে কালো মেঘের গর্জন, তার হৃদয়ে সাগরের তুফান তরঙ্গ। মস্তিষ্কে জলপ্রপাতের সুরনিনাদ। ময়ূর নাচছে। কোয়েল ডাকছে। ভ্রমরের গুঞ্জন। ডাল থেকে অনেক কদম ফুল খসে তার চরণে পড়ল।

গানের সুর এখন স্পষ্ট—

বঞ্জন আজ হরে রে—
খেতন মে নাজ ভরে রে!
জীবন আজ সফল রে!
অচ্ছী ধান অচ্ছী ফসল রে!

শুকনো মাটি আজ সবুজ হল। ক্ষেতে ফসল। জীবন সফল হল—ভাল ধান, ভাল ফসল। গৌতম শুনছে গান। প্রত্যেকটি শব্দ সে শুনল। তার ঠোঁটে হাসি।

পাথর, ঝড়, তুফান, হিমপ্রবাহ—সব পেরিয়ে, সুরের তরঙ্গে বইতে বইতে, গৌরীশংকরের উঁচু শিখরে পৌঁছে সে মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিল। হাঁটু মুড়ে সে গিরিশৃঙ্গে বসল। সে দেখল চারিদিকে মহাশূন্য, এবং সেই মহাশূন্যে সে নিতান্ত একা। পৃথিবীর প্রথম ও শেষ মানুষের মত…ক্লান্ত, পরাজিত, আনন্দিত, আশান্বিত মানুষ! ঈশ্বরের অন্তরে এই মানুষের বাস এবং সে নিজেই ঈশ্বর। সে হাসতে হাসতে নীচে নামল। দৃষ্টি প্রসারিত করল—

"যারা জেগে আছে, তাদের জীবন মঙ্গলময় হোক!
ন্যায় নীতির প্রচার মঙ্গলময় হোক!
সংঘে শান্তি মঙ্গলময় হোক!
তাদের সাধনা মঙ্গলময় হোক!
যারা শান্তি পেয়েছেন!"

শাক্যমুনি বলেছিলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত পদক্ষেপে সে আবার বস্তির দিকে এগিয়ে চলল।

মুদ্রণ : জুপিটার অফসেট প্রেস, শাহদরা, দিল্লি-110032